নিরীক্ষা

এপ্রিল-জুন ২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৩তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২২৩তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১৯

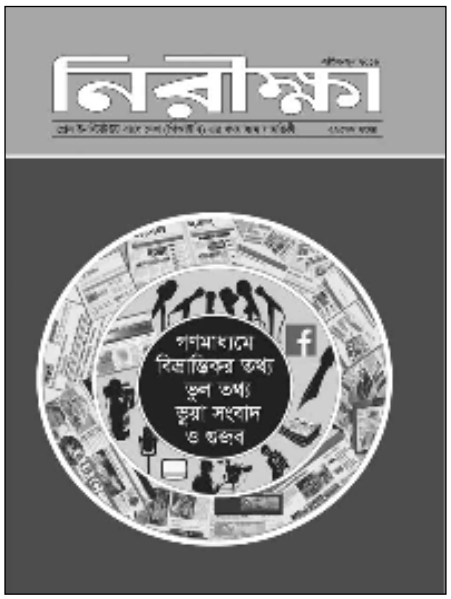

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আকতার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ব্যাপকভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। ভুল তথ্য, গুজব ব্যক্তিমানস ও সমাজকে প্রভাবিত করে এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গুজবের কারণে সহিংসতাসহ প্রাণহানি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। এমনকি দেশে ভীতিকর অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। নিরীক্ষা'র বর্তমান সংখ্যাটিতে গুজব ও ভুয়া সংবাদবিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া প্রয়াত সাংবাদিক নিয়ামত হোসেন, বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের স্মরণে রয়েছে প্রবন্ধ। দৈনিক সংবাদ'র ওপরও রয়েছে একটি প্রবন্ধ। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ও গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা নিয়ে রয়েছে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের কাজে আসবে। পাঠকের উপকারে এলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি।

সূ|চি|প|ত্র

গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ৫
শুভ কর্মকার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'ভুয়া সংবাদ': ধারণায়ন, শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায় ৯
মাহামুদুল হক

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও প্রভাব ১৯
ড. মাহাবুবুর রহমান

দারিদ্র্যবিমোচনে কৌশলগত যোগাযোগের প্রায়োগিক সুবিধা ২২
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টিভির চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৬
মোস্তাকিম স্বাধীন

ঢাকার বাইরে টিভি সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ বিপদ ও বিপত্তি ২৯
আমীন আল রশীদ

প্রযুক্তি ও সাংবাদিকতা বিকাশের সঙ্গে বেড়েছে চ্যালেঞ্জ ৩২
মামুন অর রশিদ

সাংবাদিকতার ছায়াবৃক্ষ, আমাদের নক্ষত্রজন ৩৫
ড. জ্যোৎস্নালিপি

সৃষ্টিকর্তা তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করলেন ... ৩৭
পলাশ আহসান

৩৯ নিভৃতচারী সাংবাদিক নিয়ামত হোসেন
রাশেদ রাব্বী

৪১ উপকূল সাংবাদিকতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়
রফিকুল ইসলাম মন্টু

৪৪ সংবাদের আলোয় আলোকিত
সালাম জুবায়ের

৪৭ বাংলাদেশে জনসংযোগ এখনো বিকাশমান পেশা
নূর ইসলাম হাবিব

৫০ অটিজম সচেতনতায় গণমাধ্যমের ভূমিকা
বিনয় দত্ত

৫৩ তৃতীয় লিঙ্গ: সমাজ, গণমাধ্যম ও লিঙ্গ যোগাযোগ পাঠে কম উচ্চারিত এবং দুর্বোধ্য এক সত্তা
কামরুন নাহার

৫৬ পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ও গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা
ধনঞ্জয় ঘোষাল

৬৯ গণমাধ্যম সংবাদ

৭৩ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২৩তম সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০১৯

সূচিপত্র

সামাজিক যোগাযোগ সাইট তথা ফেসবুক উদ্ভাবন, শিক্ষা ও মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপক সুযোগ উন্মোচন করেছে। ফেসবুকের এই সক্ষমতার সঙ্গে কিছু সমস্যাও জড়িয়ে পড়েছে। বড়ো সমস্যাটি হলো ভুল তথ্য প্রচার অর্থাৎ তথ্য দূষিতকরণ সমস্যা। এরকম ভুল তথ্য, দূষিত তথ্য, ভুল নির্দেশক তথ্য, ব্যক্তিমানুষকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এ ধরনের তথ্যকে সমাজে 'গুজব' বলে প্রচার করা হয়ে থাকে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬

ভুয়া তথ্য ও ভুয়া সংবাদ সমাজে আজ মহামারির মতো দেখা দিয়েছে। সুতরাং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও আইনগত শাস্তি দিয়ে ভুয়া সংবাদ ঠেকানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা, সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ নীতি প্রণয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য 'মনস্তাত্ত্বিক টীকা' প্রদান করা। ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাংবাদিকতার পরিকাঠামো ও বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটি শক্তিশালীকরণ

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৬

নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আগ্রহের পেছনে নিহিত একটি বড়ো কারণ হলো এটি প্রচলিত রাজনৈতিক ধারায় আরও উৎকর্ষ ও নতুনত্ব নিয়ে আসবে। ইন্টারনেট রাজনৈতিক দলগুলোর পরবর্তী কার্যক্রমকে শুধু সুসংহত ও সুসংগঠিতই করবে না, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর উৎকর্ষতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাবে *দেখুন- পৃষ্ঠা ২১*

শান্তিপ্রিয় বাংলার প্রজাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মানসিকতা নেই। যতদূর সম্ভব প্রজারা শান্তি বজায় রাখতেই আগ্রহী। এমন তীক্ষ্ণ ও তীব্র প্রতিক্রিয়া জমিদারদের পক্ষে যায়নি। গ্রামবার্তার ওপর জমিদারদের তাই সুনজর ছিল না। বরং বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে পত্রিকাকে। আর সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার সেই আপসহীন মানসিকতা বজায় রেখেই গ্রামবার্তাকে প্রজার নিরপেক্ষ ও নির্ভীক মুখপত্র করে তুলেছিলেন *দেখুন- পৃষ্ঠা ৬৮*

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরীক্ষা'র
আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

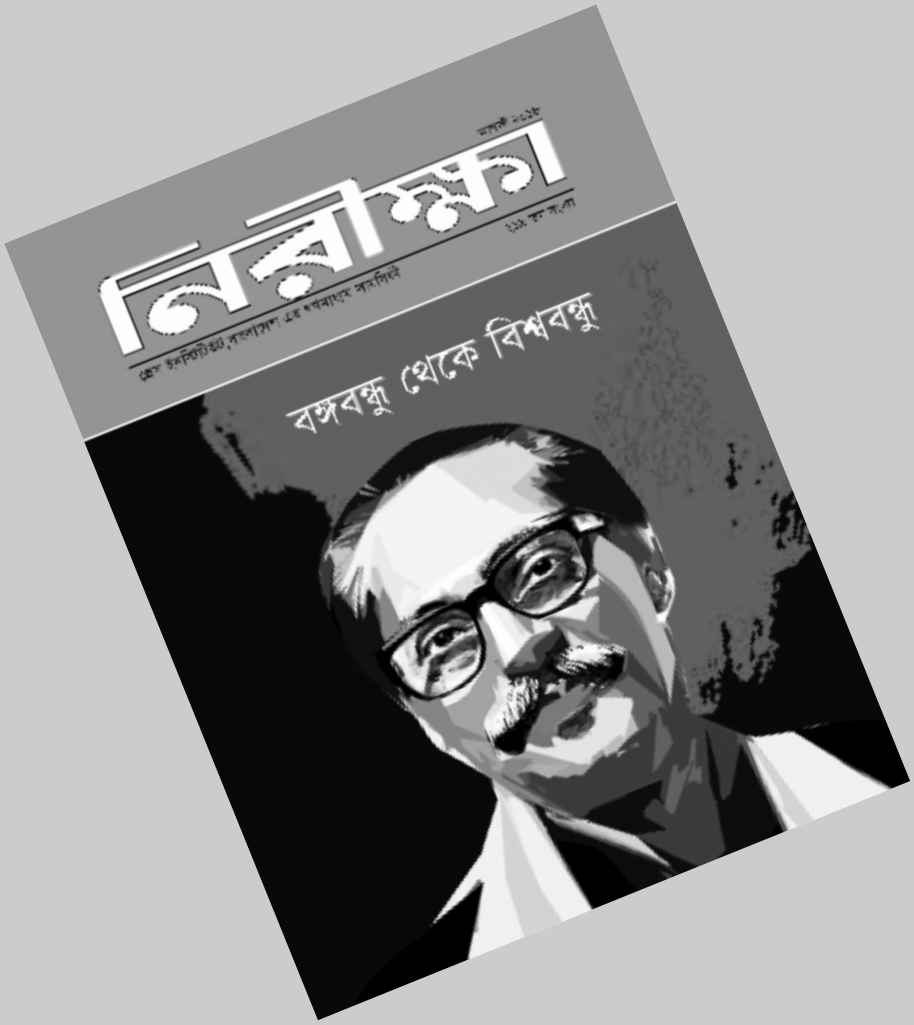

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব

শুভ কর্মকার

'বিভ্রান্তিকর তথ্য', 'ভুল তথ্য', 'ভুয়া সংবাদ' ও 'গুজব' সমকালীন ডিসকোর্স। এগুলো নতুন কিছু নয়। এ ধরনের 'বিভ্রান্তিকর তথ্য', 'ভুল তথ্য', 'ভুয়া সংবাদ' ও 'গুজব' সংবাদের মতোই। মূলত ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। আর্থিক ও আদর্শিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের তথ্য সমাজে বিচ্ছুরিত করা হয়। ডিজিটাল মাধ্যমের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যাপক প্রসারিত হয়। অনলাইন মাধ্যম দেশের সব নাগরিককে গণমাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে মানুষ গণমাধ্যমে পরিণত হয়। মার্শাল ম্যাকলুহানের সেই বিখ্যাত উক্তি– 'Medium is the message'-এর পরিবর্তে 'Man is the mass-media' ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্যক্তিমানুষ এখন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেটের বদৌলতে ব্যক্তি নিজেই সংবাদ উৎপাদন থেকে সম্প্রচার করছে। ফলে প্রথাগত গণমাধ্যমের চেয়ে ডিজিটাল মাধ্যম

মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেটের বদৌলতে ব্যক্তি নিজেই সংবাদ উৎপাদন থেকে সম্প্রচার করছে। ফলে প্রথাগত গণমাধ্যমের চেয়ে ডিজিটাল মাধ্যম সংবাদমাধ্যমকে অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। ব্যক্তি গণমাধ্যমের প্রভাবিত করার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়িয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে

সংবাদমাধ্যমকে অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। ব্যক্তি গণমাধ্যমের প্রভাবিত করার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, ভুয়া সংবাদ ও গুজব ছড়িয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের তথ্যানুযায়ী, পৃথিবীতে সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুকের প্রায় ১.২৩ বিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারী রয়েছে। বাংলাদেশে বিটিআরসির তথ্যানুযায়ী, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৩.৭০২ মিলিয়ন মানুষ। এর মধ্যে ৮৭.৯১ মিলিয়ন মানুষই মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অধিকাংশই ফেসবুকনির্ভর। মোবাইল ফোনে ফেসবুক

ব্যবহারকারীর বেশির ভাগ অংশই প্রযুক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে অনেকেই ফেসবুকে প্রচারিত সব ঘটনাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। তারা এ ধরনের প্রশ্নও করে না যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর স্বার্থে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছে কি না? তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে 'গুজব' প্রচার করা যায় সহজেই। বর্তমান প্রবন্ধে 'বিভ্রান্তিকর তথ্য', 'ভুল তথ্য', 'ভুয়া সংবাদ' ও 'গুজব' সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে।

'বিভ্রান্তিকর তথ্য', 'ভুল তথ্য', 'ভুয়া সংবাদ' ও 'গুজব'

'বিভ্রান্তিকর তথ্য' (Disinformation) শব্দটি অভিধানে আশির দশকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ভুল তথ্য' (Misinformation) হলো, যে তথ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আপনি লিখতে চেয়েছিলেন 'রহিম অসুস্থ করিমকে দেখতে গিয়েছিলেন'; কিন্তু ভুলবশত 'দেখতে' শব্দের 'দ' অক্ষরটি টাইপ করা হয়নি। তাহলে বাক্যটি দাঁড়াবে 'রহিম অসুস্থ করিমকে খেতে গিয়েছিলেন'। এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুলকে 'ভুল তথ্য' (Misinformation) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। বিভ্রান্তিকর তথ্যের সংজ্ঞা প্রদান করতে গেলে অবশ্যই ভুল তথ্য বুঝতে হবে। বিভ্রান্তিকর তথ্যের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে, 'Misinformation can be used to define disinformation— when known misinformation is purposefully and intentionally disseminated.' অর্থাৎ বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ভুল তথ্যের মধ্যে পার্থক্য হলো, একটি ইচ্ছাকৃত (বিভ্রান্তিকর তথ্য) এবং অপরটি অনিচ্ছাকৃত (ভুল তথ্য) ভুল। বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ভুল তথ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Claire Wardle বলেন, ভুল তথ্য হলো– 'The inadvertent sharing of false information' আর বিভ্রান্তিকর তথ্য হলো– 'The deliberate creation and sharing of information known to be false'. (Wardle, 2017)

Fake News-এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা অনেকটা কঠিন। বর্তমান প্রবন্ধে Fake News-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'ভুয়া সংবাদ'। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে Fake News-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে– 'not genuine; imitation or counterfeit'. বাংলা অর্থ হলো- আসল না, নকল অথবা দূষিত। Allcott and Gentzkow ভুয়া সংবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'To be news articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers.' (Allcott and Gentzkow, 2017, 213)

সামাজিক যোগাযোগ সাইট তথা ফেসবুক উদ্ভাবন, শিক্ষা ও মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপক সুযোগ উন্মোচন করেছে। ফেসবুকের এই সক্ষমতার সঙ্গে কিছু সমস্যাও জড়িয়ে পড়েছে। বড়ো সমস্যাটি হলো ভুল তথ্য প্রচার অর্থাৎ তথ্য দূষিতকরণ সমস্যা। এরকম ভুল তথ্য, দূষিত তথ্য, ভুল নির্দেশক তথ্য, ব্যক্তিমানুষকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এ ধরনের তথ্যকে সমাজে 'গুজব' বলে প্রচার করা হয়ে থাকে।

ভুয়া সংবাদ তৈরি হয় যেভাবে

ভুয়া সংবাদ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিদ্রুপ, প্যারোডি, জালিয়াতি, ছবি ম্যানুপুলেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এডসন ও প্রমুখ ভুয়া সংবাদের ধরন তুলে ধরেন তাদের Defining 'Fake News' প্রবন্ধে (Edson et al, 2018)। তাদের এই ধরনগুলো পর্যালোচনা করে ভুয়া সংবাদের নিম্নোক্ত উপদানগুলো পাওয়া যায়।

ক. বিদ্রুপাত্মক সংবাদ

ভুয়া সংবাদ তৈরি করার অন্যতম উপাদান বিদ্রুপ। সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করে এ ধরনের বিদ্রুপ তৈরি করা হয়। সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদকে বিদ্রুপ আকারে প্রকাশ করার মাধ্যমে ভুয়া সংবাদ বা গুজব তৈরি করা হয়।

খ. সংবাদ প্যারোডি (মিথ্যা অভিনয়)

প্যারোডি ভুয়া সংবাদ প্রকাশের দ্বিতীয় উপায়। প্যারোডিতে বিদ্রুপ ও হাস্যরস দুই ধরনের উপাদানই থাকে। সাধারণত সংবাদ প্যারোডিতে মূলধারার গণমাধ্যমের খবরকে নকল করে তৈরি করা হয়ে থাকে। মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রকৃত সংবাদের রসযুক্ত উপস্থাপনই সংবাদ প্যারোডি।

গ. সংবাদ জালিয়াতি

সংবাদ জালিয়াতি হলো যে সংবাদ-ঘটনার প্রকৃত কোনো ভিত্তি নেই; কিন্তু সংবাদগল্পের আকারে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। প্যারোডি কিংবা বিদ্রুপাত্মক সংবাদের মতো এখানে বোঝার উপায় নেই যে এই সংবাদটি ভুয়া কি না। সংবাদের উপাদান, কাঠামো, সংবাদমূল্য– সবেরই মিশ্রণ রয়েছে সংবাদ জালিয়াতির মধ্যে। সংবাদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহজেই পাঠককে ধোঁকা দেওয়া যায়। সংবাদ জালিয়াতি ভুয়া সংবাদের অন্যতম উপাদান।

ঘ. ছবি ম্যানুপুলেশন

প্রকৃত ছবি বা ভিডিওচিত্র ম্যানুপুলেশন করে ভুয়া সংবাদ তৈরি করা হয়ে থাকে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ছবি ও ভিডিওচিত্র সম্পাদনা করে ভুয়া ছবি ও ভিডিওচিত্র তৈরি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন ছবি, অডিও ও ভিডিওচিত্র সম্পাদনার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। ছবি ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শককে খুব সহজেই ভুয়া সংবাদ সম্পর্কে বিশ্বাস করানো যায়।

ঙ. বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ

প্রকৃত ঘটনার মধ্যে বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগের উপাদান মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ভুয়া সংবাদ তৈরি হয়ে থাকে। ব্যবসার জন্য কিংবা অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হলে সেটি ভুয়া সংবাদ। যেমন– কোনো ক্রিম মাখলে গায়ের রং ফরসা হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এটি সম্ভব নয়। এটি একধরনের ভুয়া সংবাদ। এ ধরনের ভুয়া সংবাদ তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগের কারণে। তাই ভুয়া সংবাদ তৈরির অন্যতম উপাদান বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ।

চ. প্রচারণা

রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অনেকেই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে তথ্য তৈরি করে থাকেন। প্রচারণা হলো পক্ষপাতমূলক, ভ্রান্ত তথ্য। জনগণের আচরণের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বারবার মিথ্যা তথ্যের ব্যবহার করা হয়। এরকম প্রচারণা ভুয়া সংবাদের অন্যতম উপাদান।

ভুয়া সংবাদ ছড়ানোর কারণ ও উপায়

ভুয়া সংবাদ নিয়ে ২০১৮ সালে এডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটার নামে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপটি বিশ্বের ২৮টি দেশের ওপর পরিচালিত হয়। জরিপে দেখা যায়, সংবাদ হিসেবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যা দেখা যায়, সেসবের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান থাকেন ৫৯ শতাংশ মানুষ। ভুয়া সংবাদ ছড়ানোর বিষয়ে উদ্বিগ্ন প্রতি ১০ জনের সাতজন। তবে ৬৩ শতাংশ মানুষ জানেই না যে, মিথ্যা খবর থেকে সৎ সাংবাদিকতাকে কীভাবে আলাদা করতে হয়। বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের কাছে সাংবাদিকতার নৈতিকতা বিষয়টি অস্পষ্ট (অধিকারী, ২০১৮)।

বিবিসির এক জরিপ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে ভুয়া সংবাদ ছড়ায় (BBC, 2018)–

ক. মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর জনগণের অনাস্থার কারণে তারা বিকল্প মাধ্যম থেকে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
খ. তথ্য ছড়ানোর সময় সাধারণ মানুষ তথ্য যাচাই-বাছাই করার কথা চিন্তাও করছে না।
গ. খবর যত বেশি ছড়ানো হবে, ততই প্রকৃত খবর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে।
ঘ. ভুয়া খবর ছড়ানো মানুষগুলো খুব আত্মবিশ্বাসী যে তারা আসল খবর ও ভুয়া খবর চিহ্নিত করতে পারে।

আবার বিবিসি বাংলা আয়োজিত 'বাংলাদেশের নির্বাচনে ভুয়া খবর প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনার থেকে ভুয়া খবর ছড়ানোর বেশ কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। কারণগুলো হলো:

ক. বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কোণঠাসা করা
খ. ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া
গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল

ভুয়া সংবাদ ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ফেসবুক, ইউটিউব, ভুয়া ওয়েবসাইট, গণমাধ্যম। একদল স্বার্থবাদী মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ব্যবসায়িক বা আর্থিক, মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক কারণে ভুয়া সংবাদ তৈরি

করে। মূলধারার গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে বিকল্প মাধ্যমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কয়েক বছর আগেও ভুয়া সংবাদ তৈরি করা ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে। খুব সহজেই খবর তৈরি ও ছড়ানো সম্ভব হচ্ছে। খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানোর পর মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর আস্থাহীন মানুষ, ভুয়া সংবাদের ধারণাহীন মানুষ (তারা জানেও না ভুয়া সংবাদ বলে কিছু আছে), মতাদর্শ সমর্থনকারী মানুষ, 'সস্তা জনপ্রিয়তা' পেতে চায়– এমন মানুষ নির্দ্বিধায় আত্মবিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইবের আশায় ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃত সংবাদের আড়ালে ভুয়া সংবাদ 'সত্য সংবাদ' হয়ে উঠছে। কথায় আছে– একটি মিথ্যা বারবার বললে মিথ্যা 'সত্য' হয়ে উঠে। মূলধারার গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এসব তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই খবর প্রকাশ করে। ফলে মিথ্যা সবার কাছে সত্য হয়ে উঠে। এভাবে সমাজে ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ভুয়া সংবাদ শনাক্ত করার উপায়

বিবিসি বাংলা আয়োজিত 'বাংলাদেশের নির্বাচনে ভুয়া খবর প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে ভুয়া সংবাদ শনাক্ত করার কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে (বিবিসি, ২০১৮):

ক. কমনসেন্স ব্যবহার করুন
খ. খবরের কন্টেন্ট বা তথ্য নিয়ে সন্দেহ হলে প্রতিটি যাচাই করুন
গ. অনলাইনে সার্চ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারেন
ঘ. খবরের তথ্যসূত্র বা ছবি/ভিডিওর উৎস বের করুন
ঙ. খবরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন

আরও যেভাবে ভুয়া সংবাদ শনাক্ত করতে পারেন:

ক. থ্রিলারধর্মী সংবাদগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখুন।
খ. যেসব সংবাদে চমকপ্রদ, উত্তেজিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর উৎস যাচাই করুন।
গ. অনলাইন সংবাদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ করুন ওয়েব ঠিকানায় http-এর পরে s আছে কি না। যে ওয়েবসাইটগুলোর s নেই, সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ।
ঘ. ওয়েবসাইট ঠিকানা যাচাই করুন। কারণ অনেকেই স্বনামধন্য ওয়েবসাইট ঠিকানার নাম হেরফের করে নতুন ওয়েবসাইট খোলে ভুয়া সংবাদ প্রচারের জন্য। এটি আপনি সহজেই যাচাই করতে পারেন। ওয়েবসাইট যাচাইয়ের জন্য https://whois.icann.org/en ঠিকানায় গিয়ে ওয়েবসাইটের নাম লিখে জেনে নিন ওয়েবসাইটটি কবে তৈরি হয়েছে, যোগাযোগের তথ্য, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যোগাযোগ, অ্যাডমিন যোগাযোগ, প্রযুক্তি যোগাযোগ, ওয়েবসাইট তৈরির তারিখ, ওয়েবসাইট আপডেটের তারিখ, ওয়েবসাইট রেজিস্ট্রেশন বাতিলের তারিখ ইত্যাদি।
ঙ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা গুজব বা ভুয়া সংবাদ চেনা কঠিন হলেও কয়েকটি উপায়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ভুয়া সংবাদ যাচাইয়ের বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে, সেখান থেকে জেনে নিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো তথ্যগুলো গুজব বা ভুয়া কি না। বাংলাদেশে প্রচলিত এরকম দুটি ওয়েবসাইট হলো: বিডিফ্যাক্টচেক (https://bdfactcheck.com/) ও যচাই.কম (https://www.jaachai.com/)। এই ওয়েবসাইটগুলোয় ভুয়া ও অসত্য সংবাদ তুলে ধরা হয়ে থাকে। বিডিফ্যাক্টচেক ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ফেসবুক গ্রুপও রেখেছে। তাদের গ্রুপের ঠিকানা https://www.facebook.com/bdfactcheck। এই গ্রুপ থেকেও আপনি ফেসবুকে বিচ্ছুরিত গুজব বা ভুয়া সংবাদগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। টুইটারের ভুয়া সংবাদ বা গুজব যাচাইয়ের জন্য রয়েছে https://twitter.com/StopFakingNews।
চ. ছবি সম্পাদনা করে গুজব বা ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হয়ে থাকে। ছবি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ করুন ছবিটি ক্রপ করা হয়েছে কি না, ছবির রেজুলেশন কেমন আছে, ছবির কোনো অংশ মুছে দিয়ে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, ছবির ক্যাপশন পরিবর্তন করা হয়েছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করুন এবং উত্তর খুঁজুন। গুগলের https://images.google.com/ ইমেজ সার্চে গিয়ে আপনার সন্দেহযুক্ত ছবিটি আপলোড করুন এবং ফলাফল দেখুন। ছবিটি স্ক্রিনশট থেকে নেয়া হলে সেটাও থাকবে, ছবির সাইজ কত আছে, সেটাও উল্লেখ করবে গুগল। গুগলের ইমেজ সার্চে ছবির লিঙ্ক দেওয়া যেতে পারে অথবা ছবি আপলোড করেও যাচাই করতে পারেন। ছবির মিরর ইফেক্ট যাচাইয়ের জন্য https://www.tineye.com ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।
ছ. ছবির মতো ভিডিওচিত্রও সম্পাদিত ও নকল হয়ে থাকে। ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে গুজব ও ভুয়া সংবাদ প্রচার করা হয়। এ ধরনের ভিডিওচিত্র ছবি বা খবরের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নকল বা ভুয়া ভিডিও বের করতে বা অসামঞ্জস্যতা বের করতে গুগল ক্রোম ব্রাউজারের InVid টুলস ব্যবহার করতে পারেন। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টুইটারের ভিডিওগুলো এখান থেকে যাচাই করতে পারেন। আবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউটিউব ডাটা ভিউয়ার (https://citizenevidence. amnestyusa.xn— org%29-n9m/) থেকেও ভুয়া ভিডিও যাচাই করা যায়।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনের সৌজন্যে বিডি ফ্যাক্ট চেক ভুয়া খবর চিহ্নিত করার আটটি উপায় তুলে ধরে:

ক. উৎস যাচাই করুন
খ. গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন
গ. লেখকের পরিচয় যাচাই করুন
ঘ. সমর্থনকারী উৎসগুলো
ঙ. তারিখ পরীক্ষা করুন
চ. এটা কি রসিকতা?
ছ. নিরপেক্ষতা
জ. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

'বিভ্রান্তিকর তথ্য', 'ভুল তথ্য', 'ভুয়া সংবাদ' ও 'গুজব' যেভাবে জন-ডিসকোর্সকে প্রভাবিত করে

'গুজব' প্রচারের বিষয়টি নতুন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি নেতা এডলফ হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গোয়েবলস বিশ্বাস করতেন, একটা তথ্য বারবার প্রচার করলে তা সত্য হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে এরকম চিন্তার ওপর নির্ভর করে অনেক 'গুজব' ছড়িয়েছিলেন তিনি। এ কারণে বিশ্বে মিথ্যা কিছু প্রচার হলেই সেটা 'গোয়েবলস স্টোরি' নামে পরিচিতি পায়। বাংলাদেশে এরকম গুজবের পরিমাণ কম নয়। তবে 'গুজব' অনলাইন সংবাদমাধ্যম, ইউটিউব উৎপত্তি করছে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে। বাংলাদেশে 'গুজব' প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হলো ফেসবুক। এ ধরনের প্রচারের কারণে বাংলাদেশে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এরকম কিছু 'গুজব' সমস্যার উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ঘটনা-১

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার অঞ্চলের রামুর বৌদ্ধপল্লি ঝলসে দিয়েছিল উগ্রপন্থিরা। সেদিন রাত ৯টার দিকে উত্তম বড়ুয়া নামে এক বৌদ্ধ যুবকের ফেসবুকে কোরআন অবমাননার ছবি ট্যাগ করাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদে ১২টি বৌদ্ধবিহার, ২৬টি বসতবাড়ি, শতাধিক বসতঘরে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর চালানো হয়। পরদিন ৩০ সেপ্টেম্বর বিকালে এ উগ্রবাদ উখিয়া ও টেকনাফ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উখিয়া ও টেকনাফে আরও চারটি বৌদ্ধবিহারে হামলা চালানো হয়। পুড়ে যায় হাজার বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (দৈনিক যুগান্তর, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

ঘটনা-২

২০১৩ সালের ২ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে চাঁদে সাঈদীকে দেখা গেছে– এমন ছবি ব্যাপক প্রচার পায়। মূলত ফেসবুক পেজ বাঁশের কেল্লা ২০১৩ সালের ২ মার্চের দুই দিন আগে প্রচার করা শুরু করে। ২ মার্চে এটি দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার পায়। প্রকৃতপক্ষে ফটোশপের মাধ্যমে সম্পাদনা করে চাঁদের বুকে সাঈদীর মুখ সেঁটে দেওয়া হয়েছিল ছবিটিতে। এ রকম একটা 'গুজব' প্রচারের পর দেশব্যাপী ভয়াবহ সহিংসতার সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছিল বগুড়ায়। বগুড়ায় পাঁচটি থানা ও ছয়টি পুলিশ

ফাঁড়িতে একযোগে হামলা করা হয়। কয়েকটি ফাঁড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ নিয়ে পালান পুলিশ সদস্যরা। নন্দিগ্রাম উপজেলার উপজেলা পরিষদ ভবনের ১৬টি অফিস, থানা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। ২ মার্চ সারা দেশে নিহত হন ২২ জন। চার দিনে নিহত হন ৬৭ জন। (আহমেদ, ২০১৪)।

ঘটনা-৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের রসরাজ দাস নামের জেলে পরিবারের এক যুবকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার ছবি পোস্টের অভিযোগ তুলে ২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর তাকে পিটিয়ে পুলিশে দেয় এক দল যুবক। পরদিন মাইকিং করে উপজেলা সদরে পৃথক দুটি প্রতিবাদ সমাবেশ আহ্বান করা হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা নাসিরনগর সদরে হিন্দুদের মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা চালায়। (সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০১৭)।

ভুয়া সংবাদ বা গুজব ছড়ানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, বিচারপতিসহ রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সেলিব্রেটির নামে। এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর মতো সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানের নামও জড়ানো হচ্ছে গুজবে। ভুয়া সংবাদে বাদ যায়নি গণমাধ্যমও। ২০১৭ সালের ১৪ অক্টোবর সমকাল, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার দেশের প্রায় সব প্রথম সারির গণমাধ্যমের মাস্টারহেডের স্ক্রিনশট নিয়ে অনলাইনে প্রধান বিচারপতি ও সরকারকে জড়িয়ে সংবাদের মনগড়া শিরোনাম দিয়ে ছড়ানো হয় বিভ্রান্তি। এ ছাড়াও কোটাবিরোধী আন্দোলন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক সহিংসতার সৃষ্টি হয়। এর নেপথ্যে কাজ করেছে গুজব। গুজবের অধিকাংশই ছড়িয়েছে ফেসবুকের মাধ্যমে। অবস্থা সহিংসতায় প্রাণহানিসহ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এমনকি দেশে ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি তৈরি হয়। তাই ফেসবুকে 'গুজব' তথ্য প্রচার বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড়ো সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের সচেতনতামূলক প্রচারসহ সাধারণ জনগণকে সচেতন হতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. অধিকারী, বাঁধন (২০১৮), *'ফেক নিউজ' বলি কাকে?* Retrieved from: http://www.banglatribune.com/foreign/news/323747/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87, on 16 June 2019

২. আহমেদ, রাজিব (২০১৪, মার্চ ৩), সাঈদীর চাঁদে আরোহণের বর্ষপূর্তি আজ! *কালের কণ্ঠ*, Retrieved from: http://www.kalerkantho.com/print- edition/last-page/2014/03/03/57936

৩. বিবিসি (২০১৮), 'ফেক নিউজ' চেনা যাবে যেভাবে, Retrieved from: https://www.jagonews24.com/mass-media/news/463539, on 16 June 2019

৪. Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. 2017. "Social Media and Fake News in The 2016 Election." Journal of Economic Perspectives 31 (2): 211–236.

৫. BBC (2018). Retrieved from: https://www.bbc.com/bengali/news-46182960, on 16 June 2019

৬. Edson, C. Tandoc Jr., Lim, Zheng Wei, Ling, Richard (2018). Defining "Fake News'. *Digital Journalism*. Volume-6, 2018, Issue-2. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/21670811.2017. 1360143, on 16 June 2019

৭. Golbeck, Jennifer, ed. (2008). *Computing with Social Trust*. New York: Springer.

৮. Wardle, Claire (2017). "Fake News." It's Complicated. https://medium.com/1st-draft/fake-newsits-

৯. complicated-d0f773766c79

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'ভুয়া সংবাদ':

ধারণায়ন, শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায় অন্বেষণ

মাহামুদুল হক

সাম্প্রতিককালে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ভুয়া সংবাদ (Fake News), মিথ্যা তথ্য (False Information), অপতথ্য (Disinformation) ও গুজব (Rumor) ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রতিবেশে গুজব বা ভুয়া সংবাদ এখন মানুষের নিত্যক্ষণের সঙ্গী। প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গুজব ছড়াচ্ছে। যে কোনো সংকটকালীন ভুয়া সংবাদের দৌরাত্ম্য আরও বাড়তে থাকে। এজন্য ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে গবেষণা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। কীভাবে সত্যানুসন্ধান করা যায়– এ নিয়ে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। একাডেমিক পঠনপাঠনেও আগ্রহের অন্যতম বিষয় ভুয়া সংবাদ। কেননা এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্নতা ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে জনমত ও ঘটনার ওপর ভুয়া সংবাদের ব্যাপক প্রভাব পড়ায় কীভাবে তা ঠেকানো যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার বড়ো আর্থিক বিনিয়োগও করছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে জার্মানি সরকারের মুখপাত্র জানান, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া সংবাদ নিয়ে কাজ করছেন, যা আগে কখনো এর মুখোমুখি

অনলাইন গুজবের প্রতিক্রিয়া-প্রভাব দ্রুত ও অনেক বেশি। ভুল তথ্য, মিথ্যামিশ্রিত তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য, কাল্পনিক তথ্য আর ডাহা গুজব আমরা প্রতিদিনই পাই ভার্চুয়াল জগতে। যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল না, তখন মানুষের মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়ত। তবে এর প্রভাব পড়তে সময় নিত। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের গতিতে। ... আর রাজনৈতিক গুজব নিজের মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সেটা সত্য বানানোর যন্ত্রে ফেলার চেষ্টা করা হয়

হননি।[১] ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুয়া সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে উঠিয়ে নিতে বাধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে জার্মানি নেটওয়ার্ক এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট পাস করেছে। কীভাবে ভুয়া সংবাদ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট অনুসন্ধান করছে।[২] ভুয়া সংবাদ প্রচারের শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১ মিলিয়ন ডলার জরিমানার বিধান রেখে সিঙ্গাপুরের সংসদ এ বছরের ৮ মে 'অনলাইনে মিথ্যাচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যক্রম প্রতিরোধ প্রস্তাব' পাস করেছে। ভুয়া সংবাদ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ করা সব দেশের জন্য চ্যালেঞ্জও বটে। ভুয়া সংবাদ

এ যুগের এক জটিল সমস্যা। বিশ্বের মিডিয়া সংস্কৃতিতে মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া সংবাদ এখন একটি সংকটে পরিণত হয়েছে।[৩] বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই এখন এ বিষয়টি মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। কারণ গবেষণায় প্রমাণিত যে আসল সংবাদ ভুয়া সংবাদের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়ায়।[৪]

উদ্দেশ্য

ক. ভুয়া সংবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট পদবাচ্যগুলোর ধারণায়ন;
খ. ব্যক্তিগত ও সামাজিক মনোজগতে ভুয়া সংবাদের প্রভাব বিশ্লেষণসহ এর তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা;
গ. বাংলাদেশে প্রধান কয়েকটি ভুয়া সংবাদ বিশ্লেষণ এবং ভুয়া সংবাদ বিচ্ছুরণের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান;
ঘ. ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও প্রতিরোধের উপায় অন্বেষণ।

পদ্ধতি

প্রধানত মাধ্যমিক উৎস যেমন– বই, গবেষণা রিপোর্ট, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গণমাধ্যম রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক থেকে ভুয়া সংবাদ ও ভুয়া সংবাদের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভুয়া সংবাদের সংজ্ঞায়ন

ভুয়া সংবাদে সম্পূর্ণ মনগড়া মিথ্যা তথ্য থাকে। ভুয়া সংবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: 'News articles that are intentionally and verifiably false.'[৫] অথবা 'Information presented as a news story that is factually incorrect and designed to deceive the consumer into believing it is true.'[৬] প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ভুল তথ্য বা মিথ্যা তথ্যের বুননে সংবাদের আদলে প্রকাশিত নিবন্ধই হচ্ছে ভুয়া সংবাদ।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষক কারিশমা শর্মা এবং তাঁর সহযোগীরা ভুয়া সংবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: 'A news article or message published and propagated through false information regardless the means and motives behind it.' প্রচারণার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত মিথ্যা তথ্যমিশ্রিত প্রকাশিত সংবাদ, ফিচার বা নিবন্ধই ভুয়া সংবাদ। ভুয়া সংবাদের সহজ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পল মিহেলিডিস ও সামন্ত ভাওটটি বলেন, ভুয়া সংবাদ হচ্ছে ধোঁকাবাজির গল্প, যা শোনা কথা, গুজব ও ভুল তথ্যকে ছড়ায়।[৭] ফ্রিডম হাউস ভুয়া সংবাদকে আসল সংবাদের অনুকরণে তৈরিকৃত এবং সর্বোচ্চ আগ্রহ উদ্দীপক ইচ্ছাকৃতভবে পরিবেশিত মিথ্যা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। ডিএমজে লাজের এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, ভুয়া সংবাদ হচ্ছে সংবাদমাধ্যমের আধেয়ের আঙ্গিকে বানানো তথ্য; কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় তথ্যের সঠিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদনার নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় না।[৮]

ব্যাপকভাবে বলা যায়, ভুয়া সংবাদ হচ্ছে প্রচারণা চালানো বা ধোঁকাবাজি বা বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে অপতথ্য, ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্যের বুননে সংবাদের আদলে প্রকাশিত গল্প। ভুয়া সংবাদের ধরন ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

ভুয়া সংবাদের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

ধরন	বৈশিষ্ট্য
মনগড়া তথ্য সংমিশ্রিত ভুয়া সংবাদ	মনগড়া তথ্য সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তথ্য
বিভ্রান্তিকর তথ্য সংমিশ্রিত ভুয়া সংবাদ	বিভ্রান্তিকর তথ্য কোনো ইস্যু তৈরি করতে পরিবেশিত হয়
ছদ্মবেশী তথ্য সংমিশ্রিত ভুয়া সংবাদ	ছদ্মবেশী আধেয় প্রকৃত উৎস ও ভুয়া উৎস দ্বারা পরিবেশিত হয়
মিথ্যা সংযোগকৃত ভুয়া সংবাদ	মিথ্যা সংযোগকৃত ভুয়া সংবাদে শিরোনাম, চিত্র বা ক্যাপশনের এমন ব্যবহার যা মূল আধেয়ের সঙ্গে মিলে না
কৌশলে পরিবর্তনকৃত তথ্য সংমিশ্রিত ভুয়া সংবাদ	প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রকৃত তথ্য কৌশলে পরিবর্তন করে কাল্পনিক তথ্য পরিবেশন
মিথ্যা পরিস্থিতি বর্ণিত ভুয়া সংবাদ	প্রকৃত আধেয় ভুয়া পরিস্থিতির সঙ্গে শেয়ার করে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা

ভুয়া সংবাদ ও আসল সংবাদের মধ্যে পার্থক্য

ভুয়া সংবাদ	আসল সংবাদ
ভুয়া সংবাদের প্রশ্নবোধক ওয়েব ডোমেইন বা ইউআরএল থাকে এবং এর শেষে .com.co-এর মতো কিছু থাকতে পারে।	আসল সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংবাদের লিঙ্ক থাকে।
একটা উৎসকে উদ্ধৃত করে।	আসল সংবাদে সাধারণত একাধিক উৎস থাকে।
ভাষার ব্যবহার সঠিকভাবে থাকে না। ভাষা বিদ্রুপাত্মক ও চাঞ্চল্যকর হয়।	সাংবাদিকতার নিজস্ব স্টাইলসমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা হয়। সরাসরি তথ্যের বুনন থকে।
অনুমাননির্ভর গল্প-কাহিনি।	গল্প পরিসংখ্যান বা ঘটনানির্ভর।
এক পাক্ষিক মতামতনির্ভর। সবদিক ইচ্ছাকৃতভবে অবজ্ঞা করা হয়।	সংবাদে সবদিক বা সব ধরনের মত উল্লেখ থাকে।
ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হাজির করা হয়।	ঘটনা অনুযায়ী বিবরণ থাকে।
চমক দেখানো শিরোনাম থাকে যেখানে মূল বর্ণনার সঙ্গে মিল থাকে না।	শিরোনাম ঘটনার মূল বিবরণ অনুযায়ী থাকে।
খুবই দল বা মত প্রাধান্যশীল।	দল বা মত প্রাধান্যশীল বিষয় নয়। ঘটনার সরল বর্ণনা থাকে।
অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়নি। তবে একই ধরনের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন বা শেয়ার হতে পারে।	এক্সক্লুসিভ বা স্কুপ রিপোর্ট ছাড়া সহযোগী অন্য গণমাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারিত হয়।
ঘটনার সময়, ভুয়া সংবাদ প্রকাশের সময়, তারিখ বা স্থান উল্লেখ থাকে না। কখনো আগের সময় উল্লেখ থাকে।	ঘটনার সময়, সংবাদ প্রকাশের সময়, তারিখ বা স্থান উল্লেখ থাকে এবং তা সাম্প্রতিক সময়।
মিথ্যা তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য, অপতথ্যের বুননে তৈরি হয় ভুয়া সংবাদ।	ঘটনানির্ভর আসল তথ্য, যা যাচাইযোগ্য ও যাচাইকৃত তথ্যের বুননে পরিবেশিত।

ভুয়া সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য

স্বার্থসিদ্ধি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভুয়া সংবাদ পরিবেশিত হয়। যেমন–

ক. বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়: কাউকে আহত বা সুনামহানির উদ্দেশ্যে;
খ. আর্থিক লাভ: আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে দর্শক বৃদ্ধি বা ক্লিক বাড়ানো;
গ. প্রভাব: জনমত পক্ষে নেওয়ার উদ্দেশ্যে;
ঘ. বিভ্রান্তি সৃষ্টি: বিভ্রান্তি সৃষ্টি বা কোনো কিছু স্তব্ধ করতে বীজ বপন;
ঙ. মতাদর্শিক: মতাদর্শিক পক্ষপাত প্রচারের উদ্দেশ্যে।

ভুয়া সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রকারভেদ

ভুল তথ্য (Misinformation): ভুয়া সংবাদে ভুল তথ্য থাকে। ভুলভাবে কোনোকিছু বলা বা সংবাদ দেওয়াই হচ্ছে ভুল তথ্য। ভুল তথ্য হচ্ছে– 'The unintentional sharing of false or inaccurate information.'[৯]

ভুল তথ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশিত মিথ্যা তথ্য, যা ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল বোঝার ফলস্বরূপ তৈরি হয়। জ্ঞানগত পক্ষপাতিত্ব বা বোঝাপড়ার অভাবেও ঘটে থাকে।

অপতথ্য (Disinformation): অপতথ্য হচ্ছে– 'Deliberate creation and sharing of information known to be false.'[১০]
অপতথ্য হচ্ছে প্রতারণার বা অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশিত মিথ্যা তথ্য।

বিদ্রুপাত্মক তথ্য: ভুয়া সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেক ধরনের তথ্য হচ্ছে বিদ্রুপাত্মক তথ্য। তথ্যগতভাবে ভুল হতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য প্রতারণা করা

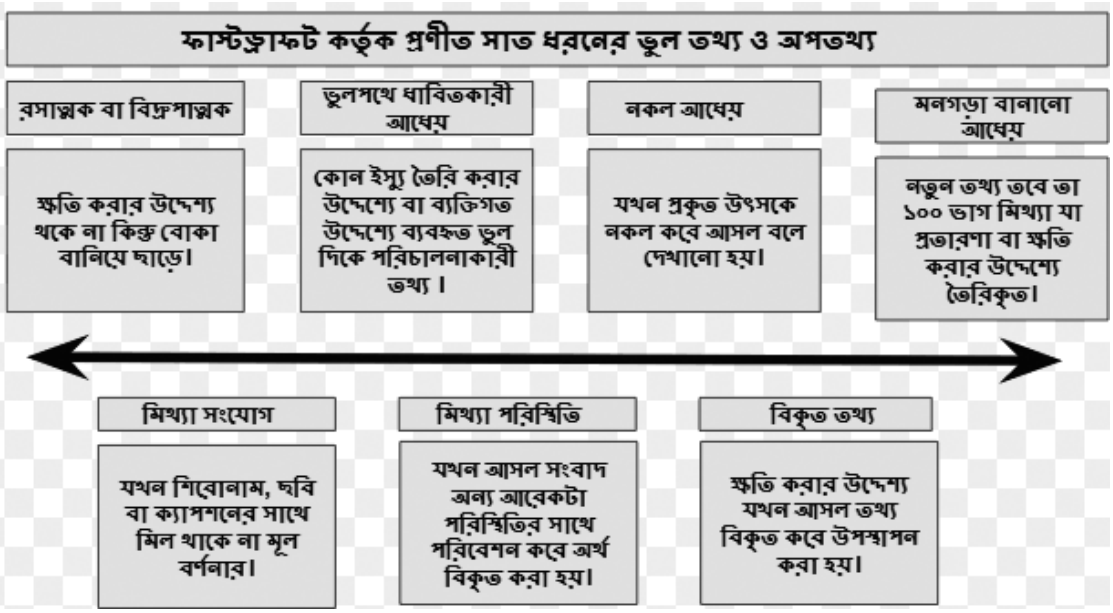

নয় বরং উপহাস করা বা এমনভাবে তথ্য পরিবেশন করা যাতে কারও কাজকে লজ্জাজনক, দুর্নীতিগ্রস্ত বা খারাপ মনে হয়। বিদ্রুপাত্মক তথ্য সরাসরি কাউকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকলেও এটি ভুয়া সংবাদের অংশ। কেননা এটি জনগণকে ধোঁকা দেয় বা বোকা বানায়।[১১]

ধোঁকাবাজির (Hoax) তথ্য[১২]: কৌতুকের ছলে কাউকে নিয়ে চালাকি করা, ধোঁকা দেওয়া, চাতুরীপনা, ভেলকিবাজি, তামাশা, বা ছলনা করে তথ্য ব্যবহার করাও ভুয়া সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'A hoax is considered to be a false story used to masquerade the truth and by the traditional definition, false news can be seen as a form of hoax usually spread through news outlets.'[১৩]

গুজব (Rumor): গুজব ভুয়া সংবাদের মতোই। গুজব হচ্ছে– 'বানানো অথচ গুরুত্বপূর্ণ গল্প-কাহিনি', যার কোনো প্রমাণ থাকে না। গুজব ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয় আবার মানুষের অজান্তেও অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবেও গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কোনো একটা স্বার্থ হাসিল করার জন্য প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে গুজব ছড়ানো হয়। গুজব সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা না-ও হতে পারে। কখনো কখনো সত্যও হতে পারে। তবে তথ্যের পক্ষে তথ্য বা রেফারেন্স থাকে না। গুজব অজ্ঞাত উৎস থেকে সত্য বা মিথ্যা তথ্য উদ্ভূত হতে পারে। বিষয়টি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বা অমীমাংসিতও থাকে অর্থাৎ সত্য না মিথ্যা কোনো সিদ্ধান্তেই আসা যায় না।

যুগে যুগে ভুয়া সংবাদ

গুজব ও অপপ্রচারের[১৪] ঘনঘটা সব যুগেই ছিল। আর মিথ্যা ও চমকপ্রদ তথ্য সংবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয় বহুকাল ধরেই। উনিশ শতকে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার ও ইন্টারনেটের আবির্ভাবে ভুয়া সংবাদের আঙ্গিক ও আগ্রাসন বেড়েছে। গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর মুদ্রণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্র বিকাশিত হতে থাকলে ভুয়া সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। কখনো সংবাদপত্রের কাটতি বাড়াতে ইচ্ছাকৃতভবে ভুয়া সংবাদ প্রকাশ করা হতো আবার কখনো উৎস সংবাদপত্রকে প্রতারিত করত ভুয়া সংবাদ ছাপাতে। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটার বার্তায় ভুয়া সংবাদ বিষয়টি আলোচনায় আসে সবচেয়ে বেশি। প্রথাগত গণমাধ্যমের বিশ্লেষণী প্রতিবেদনকে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত একাই তাঁর টুইটারে ৭৩ বার টুইট করেন এবং বড়ো হরফে বলেন 'FAKE NEWS'।[১৫] তিনি আসলে বিশেষ কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদনকে নয় বরং সরাসরি প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম যেমন– সিএনএন, এমএসএনবিএস বা নিউইয়র্ক টাইমসকে দোষারোপ করেন।[১৬]

সম্রাট কনস্টানটাইন (২৮৫-৩৩৭ খ্রি.) The Donation of Constantine টাইটেলে ক্যাথলিক চার্চকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বিশাল জমি প্রদানের যে গল্প লিখেছিলেন, তা ছিল ভুয়া। ১১৫০ সালে ইউরোপিয়ান শাসককে সহযোগিতা করতে প্রেস্টার জনের লেখা চিঠি ছিল উড়ো ও ভুয়া। পরে প্রেস্টার জন নামে কাউকে পাওয়া যায়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী টেলোন্ডোর ১১৮৪ সালে লেখা ভুয়া চিঠিতে বলা হয়েছিল, বিশ্ব ধ্বংস হচ্ছে ১১৮৬ সালে। ক্রাউলান্ডের সন্ন্যাসীরা ১৪১৩ সালে 'হিস্টরি অব ক্রাউলান্ড' আইনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিরোধপূর্ণ জমির মামলায় জয়ী হয়। এ ভলিয়ম ছিল ভুয়া। ১৫৯৩ সালের দিকে বালকের স্বর্ণের দাঁত আবিষ্কার করে ১৪৫ পৃষ্ঠার ভুয়া গল্প লেখেন জ্যাকব হোর্স্ট। ১৬৩৭ সালে প্যারিসে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয়, এক নারী স্বামী ছাড়া বা কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সন্তান জন্ম দিয়েছে। আদালতও বিষয়টি গ্রহণ করে। কিন্তু পরে তদন্তে ওই পুস্তিকার খবর ভুয়া প্রমাণিত হয়।

১৮৩৫ সালে দ্য নিউইয়র্ক সান বিখ্যাত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে উদ্ধৃত করে চাঁদে মানুষ ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে ভুয়া সিরিজ রিপোর্ট করে। সিরিজের প্রথম রিপোর্টের খণ্ডাংশ নিচে দেওয়া হলো। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ১৯৩৩ সালে হিটলার মিনিস্টার ফর প্রোপাগান্ডা হিসেবে জোসেফ গোয়েবলসকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। প্রোপাগান্ডা হচ্ছে কৌশলে মিথ্যার সংমিশ্রণ। গুজব হচ্ছে প্রোপাগান্ডার অন্যতম অস্ত্র।

THE [N]EW YORK SUN.
FRIDAY MO[R]NING, AUGUST 21, 1835.
☞ Office of Sun removed to the corner of Nassau and Spru[ce] streets, opposite the City Hall.
Celestial Dis[cove]ries.—The Edinburgh Courant says—"We have [ju]st learnt from an eminent publisher in this city t[ha]t Sir John Herschel, at the Cape of Good Hope, ha[s] made some astronomical discoveries of the most w[on]derful description, by means of an immense telesc[op]e of an entirely new principle."

নিউইয়র্ক সানের সিরিজের প্রথম রিপোর্টের খণ্ডাংশ

সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী Lee Kuan Yew-এর মৃত্যুর ভুয়া সংবাদও ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।[১৭] এমনকি, মূলধারার কিছু গণমাধ্যমও এ ভুয়া সংবাদ প্রচার করতে থাকে। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভুয়া মৃত্যু সংবাদের সম্মুখীন হয়েছেন।[১৮]

তথ্যচাহিদা বাড়লে ভুয়া সংবাদ বা গুজব ছড়ায় বেশি। যুদ্ধ এবং অন্যান্য সংকট যেমন– প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তথ্য ঘাটতি প্রায়ই থাকে। ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে ভুয়া সংবাদ বা গুজবের দৌরাত্ম্যও বেড়েছে।

ভুয়া সংবাদের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

ভুয়া খবর ও গুজব নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি কম হয়নি। সমাজবিজ্ঞানী তামতসু শিবাটিনি গুজবকে 'দুর্বল খবর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে ভুয়া সংবাদকে তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। গণমাধ্যম গবেষকরা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখিয়েছেন। সর্বজনীন জালিয়াতি তত্ত্বও রয়েছে।

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব: ষড়যন্ত্র তত্ত্ব (Conspiracy theory) মূলত কোনো ঘটনার এমন ব্যাখ্যাকে বোঝায়, যা সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে থাকে, যার পেছনে সরকার (রাষ্ট্র) বা ক্ষমতাশীল কোনো সংগঠনকে দায়ী করা হয়। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এরা অসৎ ও ক্ষতিকর পন্থায় নিজেদের ফায়দা লুটে।[১৯] বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল বার্কুনের মতে, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত– ১. কোনো কিছু দৈবভাবে ঘটে না। ২. যা আপাত প্রতীয়মান, তা সত্য নয়। ৩. সবকিছুই আন্তসম্পর্কযুক্ত। বার্কুনের মতে, ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এ তত্ত্বগুলো সময়ের প্রয়োজনে এদের বিপরীতে আসতে থাকা প্রমাণগুলোর সঙ্গে নিজেদের কিছুটা পরিমার্জন করে খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে একে যাচাই অযোগ্য করে তোলে। তাই বার্কুনের মতে, এ ব্যাপারটি 'প্রমাণ অপেক্ষা বিশ্বাস সাপেক্ষ।'[২০]

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কেবল ব্যক্তিগত কারণগুলো বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সামাজিক ও প্রযুক্তিগত কারণগুলোও তাদের বিস্তারকে প্রভাবিত করতে পারে। ভুয়া সংবাদের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশ্বাস করে যে তারা যে তথ্য প্রচার করছে, তা সঠিক এবং তারা যা বিশ্বাস করে, তা তাদের দাবিগুলো যাচাই করার জন্য পরীক্ষামূলক প্রমাণ।[২১]

কিছু ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দাবি করে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর তারিখ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে জার্মান ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদ হেরিবার্ট ইলিগের অনুমানও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯১ সালে তিনি অভিযোগ করেন, Pope Sylvester II (৯৯৯-১০০৩)-এর মতো সংখ্যা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্যালেন্ডারে ২৭৭ বছর যোগ করা হয়েছে।

আরেকটি তত্ত্ব যা নিউ ক্রনিকলজি নামে পরিচিত এবং রাশিয়ার তাত্ত্বিক আনাতোলি ফোমেনকোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ফোমেনকো মনে করেন, যা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়, তার চেয়ে ইতিহাস অনেক শতাব্দী ছোটো। ঐতিহাসিক অনেক নথি মনগড়া বা বানানো, যেখানে আসল বা বৈধ নথি ধ্বংস করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেট ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত।[২২] "...conspiracy theorists tend to produce their own amateur-made conspiracy 'documentaries' and upload them onto websites like YouTube and forums. This allows other users to dissect these videos and form conspiracy theories that align with their worldviews."[২৩]

সর্বজনীন জালিয়াতি তত্ত্ব: ১৬৯৩ সালে প্যারিসের গ্রন্থাগারিক ও পণ্ডিত জিন হার্ডোইন (Jean Hardouin: ১৯৪৬-১৭২৯) সর্বজনীন জালিয়াতি তত্ত্ব (Theory of Universal Forgery) হাজির করেন। এ তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সেভেরাস আকন্টিয়ার্স নামে রহস্যময় ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল সন্ন্যাসী ত্রয়োদশ শতকের প্রায় সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, শিল্পকর্ম, মুদ্রা এবং শিলালিপি জাল করেছিল। এ দলের লক্ষ্য ছিল পুরুষদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের সব ঘটনাকে নাস্তিকতাবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সমালোচকরা তার তত্ত্বকে 'হার্ডোনিমাস' নামে আখ্যা দেন। কেউ এ তত্ত্বকে বলেন 'অস্বাভাবিক তত্ত্ব' আবার কেউ বলেন 'অদ্ভুত তত্ত্ব'। হর্ডোইন বিশ্বাস করেন, শাস্ত্রীয় কর্মগুলোর মধ্যে তিনি জলিয়াতি শনাক্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ত্রয়োদশ শতকে জালিয়াতি চক্র শুধু শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থগুলো নকল করেননি বরং পরবর্তী রেফারেন্সও তৈরি করেছে। ফলে পরস্পরিক যোগসাজশে শক্তিশালীভাবে প্রতারণার বিশাল ক্ষেত্র তৈরি করে। ব্যাপকভাবে দেখা যায় হার্ডোইন এ তত্ত্বের মধ্যমে তার মতের বিরুদ্ধ মত বা তার মতের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ কাজগুলো বাতিল করেছেন। তিনি মনে করেন, গ্রিক ও লাতিন বেশির ভাগ সন্ন্যাসী লেখক মধ্যযুগের জালিয়াতির জন্য দায়ী।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আবির্ভাবে ভুয়া সংবাদের আধিক্য ঘটতে থাকে। শর্মা ও তার সহযোগীরা দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় স্তরেই ভুয়া সংবাদের বিস্তৃতি ঘটে।

ক. ব্যক্তিগত স্তর: ব্যক্তি ভুয়া সংবাদ চিহ্নিত করতে না পারায় মিথ্যা তথ্য বিশ্বাস করে এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করতে থাকে। এক জরিপে দেখা যায় ১৬৮৪ জন ব্রিটিশ প্রাপ্তবয়স্ককে ছয়টি সংবাদ-কাহিনি পড়তে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটি ছিল ভুয়া বা মিথ্যা সংবাদ-কাহিনি এবং তিনটি ছিল প্রকৃত ঘটনার সংবাদ-কাহিনি। মাত্র ৪ শতাংশ উত্তরদাতা এ সংবাদ-কাহিনি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব সংবাদ শনাক্ত করতে অক্ষমতার কারণ ছিল তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা ও মতাদর্শিক পক্ষপাতিত্ব।[২৪]

সত্য তথ্য থেকে মিথ্যা তথ্য শনাক্তকরণ এবং ব্যক্তির বিশ্লেষণী চিন্তার ক্ষমতার মধ্যে আন্তসম্পর্ক রয়েছে।[২৫] যেসব জনগণ বেশির ভাগ সময় গণমাধ্যম ব্যবহার করে, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাপ্তবয়স্ক, তারা প্রকৃত তথ্য শনাক্ত করতে পারে বেশি।[২৬] জ্ঞানগত সক্ষমতা ও মতাদর্শগত ধারণা তথ্য গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার যদি ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে সে তথ্য সহজেই বিশ্বাস করে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে Naive Realism বলে। আবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এমন তথ্য বিশ্বাস করে। আরেক গবেষণায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ১৭.২ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং ১৪.৭ শতাংশ রিপাবলিকান মতাদর্শগতভাবে মিলেছে এমন নিবন্ধ বিশ্বাস করেছে।[২৭]

সামাজিক স্তর: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য এবং অনলাইনে যৌথ তথ্য আদান-প্রদান ভুয়া সংবাদের ক্ষেত্রে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। এ বিষয়টিকে প্রযুক্তির ভাষায় Echo Chamber প্রভাব বলে।[২৮] ইকো চেম্বার প্রভাব হচ্ছে– তথ্যের এমন একটি জিজিটাল প্রতিবেশ, যেখানে তথ্যের ডিজিটাল মহাসমুদ্রে ব্যবহারকারী এমন তথ্য পায়, যা তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায় এবং তা যাচাই-বাছাই না করেই ব্যবহারকারী গ্রহণ করে। নিজের মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোনো তথ্য বা ভুয়া সংবাদ যখন মিলে যায়, তখন ওই ব্যক্তি তার মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গে তা শেয়ার করতে চায়। নিজে শেয়ার করে এবং একই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যকেও শেয়ার করতে বলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা ও মতামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিজস্ব মতাদর্শিক বিভিন্ন গ্রুপে এবং ব্যক্তির কাছে শেয়ার করতে থাকে ভুয়া সংবাদ।

ভুয়া সংবাদের প্রভাব

অনলাইন গুজবের প্রতিক্রিয়া-প্রভাব দ্রুত ও অনেক বেশি। ভুল তথ্য, মিথ্যামিশ্রিত তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য, কাল্পনিক তথ্য আর ডাহা গুজব আমরা প্রতিদিনই পাই ভার্চুয়াল জগতে। যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, তখন মানুষের মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়ত। তবে এর প্রভাব পড়তে সময় নিত। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের গতিতে। অনেকে গুজবে কান দেয় বেশি– মনে করে, 'কিছু রটে তো কিছু বটে।' আর রাজনৈতিক গুজব নিজের মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সেটা সত্য বানানোর যন্ত্রে ফেলার চেষ্টা করা হয়। আরও রং মাখিয়ে শেয়ার করা হয়। অন্যকে শেয়ার করার অনুরোধও করা হয়। এটা নিছক এক দল আরেক দলকে ঘায়েল করার জন্য করে। গুজব এক অস্ত্র। তাই অনলাইন যোগাযোগের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে জনগণ একদিকে যেমন উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি ভুয়া সংবাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন– ২০০৪ সালে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স দেউলিয়া হয়েছে এমন একটি ভুয়া সংবাদের কারণে কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্টকমূল্য প্রায় ৭৬ শতাংশ কমে যায়। ২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তিন মাস আগে থেকে ভুয়া সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ১১৫টি ভুয়া সংবাদ, যা ৩০ মিলিয়নবার এবং বিল ক্লিনটনের পক্ষে ৪১টি ভুয়া সংবাদ, যা ৭.৬ মিলিয়নবার ফেসবুকে শেয়ার

করা হয়। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– জাপানে ২০০১ সালের ভূমিকম্প ও ২০১২ সালের হারিকেনের সময়ও ভুয়া সংবাদ পরিবেশিত হয়, যা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশে প্রধান কয়েকটি ভুয়া সংবাদ/গুজব বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজবের কারণে বেশ কয়েকটি বড়ো ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার উৎস ফেসবুকে কোনো মন্তব্য অথবা ছবি। ছবি বা মন্তব্যের কারণে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাও ঘটেছে। বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে একই রকমভাবে।

ক. কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা

কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা হয়েছিল ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। কক্সবাজারের রামুতে হঠাৎ 'গুজব' রটল, সেখানকার একটি কম্পিউটারের দোকান থেকে উত্তম বড়ুয়া নামে কোনো এক বৌদ্ধ তরুণের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ইসলামধর্ম, কোরআন অথবা নবিকে অবমাননা করা হয়েছে। এ তথ্য বেশ দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন রামু উপজেলার চৌমুহনী মোড়ে একটি মিছিল ও সমাবেশ হয়েছিল স্থানীয় রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে। এরপর সাম্প্রদায়িক হামলা হয়। ১৯টি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এসব হামলায়। বৌদ্ধদের অনেক বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। উত্তম বড়ুয়ার নামের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঘিরে ওই হামলা ঘটনার সূত্রপাত; কিন্তু তার খোঁজ এতদিন পরও পাওয়া যায়নি।[২৯]

খ. নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা

২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর হরিপুর গ্রামের হিন্দু যুবক রসরাজ নামের ফেসবুকে কথিত একটি ইসলামবিদ্বেষী ছবি পোস্ট করার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দুদের অন্তত ৫টি মন্দির ও বহু বাড়িঘর ভাংচুর করা হয়েছিল। হামলার দুদিন আগে অভিযোগ ছিল– কাবা ঘরের সঙ্গে হিন্দুদের দেবতা শিবের একটি ছবি জুড়ে দিয়েছিলেন রসরাজ। স্থানীয় লোকজন সেদিনই রসরাজ দাসকে পিটিয়ে পুলিশে দিয়েছিল। মামলাও হয় তার বিরুদ্ধে। একাধিক ইসলামপন্থি সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ করে। হঠাৎ করেই সংঘবদ্ধ জনতা নাসিরনগরের হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা করে। প্রথমদিনই আটটি হিন্দুপাড়ায় কমপক্ষে ৩০০টি বাড়িঘর, মন্দির, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুর হয় রসরাজের বাড়িও। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই বছরের ৪ নভেম্বর আরেক দফা হামলা হয় নাসিরনগরের হিন্দুদের ওপর। ঘটনার আড়াই মাস পর জামিনে বের হন পেশায় জেলে রসরাজ। এরপর তিনি জানান, তিনি ফেসবুক ব্যবহার করতে জানেন না। পাসওয়ার্ড সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। যে ফেসবুক পোস্টটিকে ঘিরে এত ঘটনা, সেটিও পরে আর পাওয়া যায়নি (বিবিসি, ২০১৮)।[৩০] নাসিরনগরে ওই হামলার ঘটনায় মোট আটটি মামলা হয়।

গ. রংপুরের গঙ্গাচড়ার ঘটনা

২০১৭ সালের ১০ নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়ার ঘটনাটিও ঘটে ফেসবুকে একটি পোস্ট ঘিরে। এক্ষেত্রেও এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক পোস্ট থেকে রাসুলকে অবমাননার অভিযোগে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে। টিটু রায় নামের ওই যুবকের বাড়ি গঙ্গাচড়ায় হলেও তিনি নারায়ণগঞ্জে বাস করেন। গঙ্গাচড়ায় সেসময় কয়েকদিন গ্রামে মাইকিং হয়েছে। ঘটনার দিন একটি মানববন্ধন শেষে আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত মানুষ মিছিল নিয়ে হিন্দুপাড়ায় হামলা করে। পুলিশের গুলিতে সেদিন একজন নিহত হন। টিটুর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলায় চার্জশিট দেওয়ার পর গ্রেফতার হয় সে। ফেসবুক আইডিটি ছিল Md. Titu নামে অথচ সে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যদিও আইডি খোলার সময় তার মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয়েছে। টিটুর মা জানায়, তার ছেলে পোশাককর্মী। ঘটনার সাত মাস আগে গ্রামে আসে। তিনি জানান, ফেসবুকে এ ধরনের পোস্ট অসম্ভব, কারণ তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এবং সে কম্পিউটার চালাতে জানে না। ফেসবুক পোস্টটি ২৮ সেপ্টেম্বর আপলোড করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয় ডিজিটাল প্লাটফর্মে।[৩১]

ঘ. শাপলা চত্বরে নিহতের সংখ্যা নিয়ে ভুয়া সংবাদ

২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে জড়ো হয় কওমি মাদরাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার সমর্থক। ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে বেশ কজন ব্লগারের বিরুদ্ধে কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেদিন তাদের ঢাকা অবরোধ ছিল। শাপলা চত্বর, পল্টন মোড় থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের চারপাশের রাস্তার আশপাশে নানা ভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর হয়। রাতে হাজার হাজার র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবির মিলিত অভিযানে খালি করে ফেলা হয় শাপলা চত্বর। শত শত রাউন্ড ফাঁকা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ, কাঁদানে গ্যাস দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় অবরোধকারীদের। কিন্তু ৫ মে রাতে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে চালানো পুলিশি অভিযানে মৃতের সংখ্যা নিয়ে নানা ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আড়াই হাজারের মতো নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ফেসবুকে গণহত্যার কথা বলে নানারকম ছবি ছড়ানো হচ্ছিল। এমনকি হেফাজত ইসলাম ৩ হাজার জন মৃত অথবা নিখোঁজ হওয়ার দাবি করে। ইংরেজি সংবাদপত্র ডেইলি স্টার তাদের দাবির স্বপক্ষে তথ্য চাইলে তারা তা দিতে ব্যর্থ হয়।[৩২] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫ ও ৬ মে দুই দিনে সারা দেশে ২৮ জনের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করে।

ঙ. নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও গুজব

২০১৮ সালের জুলাইয়ের শেষে ঢাকার এয়ারপোর্ট রোডে বাসের চাপায় দুই কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনার পর স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এক সপ্তাহের বেশি সময় হাজার হাজার শিক্ষার্থী সকাল-সন্ধ্যা সড়কে অবস্থান নিয়েছিল। একপর্যায়ে আন্দোলনকারী কিশোর-কিশোরীরা হামলার শিকার হয় বলে অভিযোগ আসে। এরপর ফেসবুকে এই আন্দোলনকে ঘিরে নানা খবর ও ভিডিও ভাইরাল হয়ে ওঠে।

মডেল ও অভিনেত্রী নওশাবা ফেসবুক লাইভে আন্দোলনরত ছাত্রদের মৃত্যু এবং এক ছাত্রের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। এ গুজব ছড়ানোর অভিযোগে পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ওই বছর ৪ জুলাই রাজধানীর ঝিগাতলায় ছাত্র হত্যা ও ছাত্রী ধর্ষণের মতো গুরুতর গুজবে কান দিয়ে দু-একজন লাইভ ভিডিওতে তাদের উদ্ধারের আহ্বান জানায়। আর তা ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার ও প্রথাগত গণমাধ্যম তথ্যানুসন্ধান করে। সরকার গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানায়। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের খবর ঠিকমতো কাভারেজ দেওয়া হচ্ছে না বলে প্রথাগত গণমাধ্যমের প্রতি অভিযোগও আনা হয়। আবার এক গোষ্ঠী সাংবাদিকদের মারধর করে। সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভাঙচুর করে। প্রথাগত গণমাধ্যম শুধু আক্রমণের খবর-ছবি প্রকাশ ও প্রচার করে আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা দিয়ে। একটা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য গুজবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

চ. আপৎকালীন ভুয়া সংবাদ

২০১৯ সালের মে মাসে ভারত ও বাংলাদেশে হারিকেন ফণী[৩৩] আঘাত হানার সময়ও একাত্তর টেলিভিশনের স্ক্রিনশট নিয়ে তা ফটোশপ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে জড়িয়ে ভুয়া সংবাদ ফেসবুকে শেয়ার করা হয়। ওই টিভি চ্যানেলের নামে ভুয়া স্ক্রলে বলা হয়, 'ছাত্রলীগ প্রস্তুত থাকায় কমছে ঝড়ের গতি।' আরেক স্ক্রলে বলা হয়, 'খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বেড়েই চলেছে ঝড়ের গতি।'

একাত্তর টিভির স্ক্রিন ফটোশপ করে ভুয়া স্ক্রল ব্যবহার

বাংলাদেশে ভুয়া অনলাইন সংবাদমাধ্যম

বাংলাদেশে বিবিসি বাংলা বা প্রথম আলোর মতো প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। যেমন– বিবিসি নিউজ বাংলার ওয়েবসাইট bbcbangla.com বা https://www.bbc.com/bengali হলেও যে ভুয়া ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছিল, তার ঠিকানায় রয়েছে bbc-bangla.com। একটা হাইফেন যোগ করা হয়েছে। প্রথম আলোর ওয়েবসাইট prothomalo.com হলেও ভুয়া ওয়েবসাইটের ঠিকানায় একটি অতিরিক্ত a যোগ করা হয়েছে, যেমন– prothomaalo.com। বিবিসি বাংলা ও প্রথম আলোকে নকল করে যে ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে, তার স্ক্রিনশট পাশাপাশি নিচে দেওয়া হলো।[৩৪]

বিবিসি বাংলা (বাঁয়ে) এবং প্রথম আলোর (ডানে) ভুয়া ওয়েবসাইটের হোমপেজ

ভুয়া ই-পেপার

বাংলাদেশে প্রধান প্রধান দৈনিকের ই-পেপারের আসল সংবাদ তুলে দিয়ে ভুয়া সংবাদ বসিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৪ অক্টোবর ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, সমকাল ও ইত্তেফাকের ভুয়া ই-পেপারে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহাকে নিয়ে ভুয়া সংবাদ ফেসবুকে আপলোড করা হয়। 'Begum Khaleda Zia', 'ShomoyerShakkhi.com' এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরখাস্তকৃত এক শিক্ষকের ফেসবুক ও টুইটার অ্যাকাউন্টে দেখা যায় এসব ভুয়া ই-পেপার।

ওইদিন ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার নেমপ্লেটকে হুবহু রেখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহাকে ঘিরে একটি ভুয়া সংবাদ এবং ওই পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনামের নামে ভুয়া একটি মন্তব্য প্রতিবেদন ফটোশপ করে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। কারণ, তখন প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ ও বিদেশে যাওয়া নিয়ে বেশ গুঞ্জন ও গুজব চলছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ওই শিক্ষকের ফেসবুক পেজে এই ভুয়া ই-পেপার আপলোড করা হয়, যার ফলোয়ার হচ্ছে ৬৭,২১৮ জন।[৩৫]

ডেইলি স্টারের আসল ই-পেপার ও নকল ই-পেপার (বাঁয়ে) এবং এক শিক্ষকের ফেসবুক পেজে ওই ভুয়া ই-পেপার। স্ক্রিনশটগুলো ডেইলি স্টার ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বাংলাদেশে ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

মিথ্যা তথ্য, অপতথ্য এবং ভুয়া সংবাদের ব্যাপক বিচ্ছুরণের প্রতিরোধে বিভিন্ন তথ্য যাচাইকারী সংস্থার জন্ম হয়েছে। ২০১৮ সালে ডিউক রিপোর্টারস ল্যাব ৫৩টি দেশে ১৪৯টি তথ্য যাচাইকারী প্রকল্পের নাম উল্লেখ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৭ শতাংশই প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।[৩৬] বাংলাদেশে তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব খুব বেশি দিনের হয়নি। বিডি ফ্যাক্ট চেক, 'যাচাই' এবং ফ্যাক্ট ওয়াচ নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।[৩৭] ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস ফ্যাক্ট ওয়াচ নামে একটি ল্যাব পরিচালনা করে। তবে এর কার্যক্রম একাডেমিক পঠনপাঠনে সীমাবদ্ধ। বিডি ফ্যাক্ট চেক এবং 'যাচাই'-এর ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ রয়েছে। 'যাচাই' অনলাইনে চলমান বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্যের সত্যতা তুলে ধরে এবং এর মাধ্যমে সবাইকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য প্রচরে উদ্বুদ্ধ করে। ২০১২ সালে 'সতর্ক থাকুন, দায়িত্বের সঙ্গে শেয়ার করুন' নামে একটি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে 'যাচাই' যাত্রা শুরু করে। পরে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সত্যতা যাচাইয়ে নিবেদিত ওয়েবসাইট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৮] বিডি ফ্যাক্ট চেক বাংলাদেশের আরেকটি তথ্য অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান। এটি একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যা, সন্দেহ, প্রতারণা ও ভুলের মাত্রা কমিয়ে আনা। বিডি ফ্যাক্ট চেক প্রধানত চারটি বিষয়ে তথ্য যাচাই করে থাকে: পাবলিক ফিগার, রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।[৩৯]

এসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাপ্ত ভুয়া সংবাদ যাচাই-বাছাই করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। সফটওয়্যার বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রযুক্তি, অর্থায়ন বা নিবন্ধন নেই এসব প্রতিষ্ঠানের।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় অসত্য তথ্য প্রচার ঠেকাতে র‍্যাব ফেসবুকে একটি পেজের মাধ্যমে 'র‍্যাব সাইবার নিউজ ভেরিফিকেশন সেন্টার' নামে একটি কেন্দ্র চালু করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো খবর নিয়ে কারও সন্দেহ থাকলে, তা তাদের কাছে পাঠালে তারা খবরের সত্যতা যাচাই করে ফিডব্যাক দেয়। নির্বাচনের সময় সত্যতা যাচাইয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে এই সেন্টার। র‍্যাব সদর দপ্তরসহ প্রতিটি ব্যাটালিয়ন সামাজিক যোগাযোগে দক্ষ কর্মকর্তা দিয়ে মনিটরিং করেছে। পুলিশ প্রতিটি জেলায় মনিটরিং সেল গঠন করেছে। পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগ নির্বাচনের আগে দুই মাসে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে প্রায় ২০০ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ৩৪টি ভুয়া নিউজ পোর্টাল এবং ১৫টি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে। গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ৩৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৪০]

সরকার ফেসবুকে গুজব প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ২০১৫ সালের প্রথমদিকে দুই সপ্তাহের জন্য ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করা হয়। এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে চাঙা করতে ফেসবুকের মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ ছিল।[৪১] দেশের বেশির ভাগ জনগণ স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ ফোরজি থেকে থ্রিজিতে নামানো হয়। সম্প্রতি সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস করেছে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে কোনো সংঘর্ষ বা আন্দোলনকে দমন বা উসকে দেওয়ার জন্য গুজব বা ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হয় বেশি। বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন, কোটাবিরোধী অন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং অন্যান্য সংকটের সময়কালে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন ভুয়া খবর, গুজব ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়ে। রামুর বৌদ্ধমঠে ভাঙচুর, শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে হতাহতের সংখ্যা এবং নাসিরনগরের মন্দিরে হামলা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় দুই শিক্ষার্থীর 'মৃত্যু' এবং চারজনের 'ধর্ষিত' হওয়ার গুজব ছড়ানো হচ্ছিল লাইভে আর অনেকে জানার চেষ্টা করছিল আসলে তা সত্য কি না? কিন্তু যারা চায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তাদের সুবিধা হবে, তারা দ্রুত শেয়ার করতে থাকে যাচাই-বাছাই ছাড়া। বাংলাদেশে নিম্নোক্তভাবে ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ে।

ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক ও ইউটিউব;
খ. ভুয়া ওয়েবসাইট ও নকল ই-পেপার;
ঘ. অনলাইন সংবাদ মাধ্যম।

কিছু মূলধারার গণমাধ্যমও এসব সামাজিক মাধ্যমের তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই খবর প্রকাশ করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভুয়া খবরগুলো ব্যবহারকারীদের লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের কারণে ভাইরাল হয়ে যায়। আর কিছু ফেসবুক পেজ ও অনলাইন মাধ্যম তাদের ক্লিক বাড়ানোর জন্য রমরমা হেডলাইন দেওয়া শুরু করে। এ অনৈতিক চর্চাকে সাংবাদিকতার ভাষায় 'ক্লিকবেইট জার্নালিজম'[৪২] বলে।

বাংলাদেশে প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠী গুজব বা ভুয়া সংবাদ ছড়ায়। সরকারকে জনবিরোধী প্রমাণ করা বা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতেও গুজব ছড়ানো হয়েছে। দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যও গুজব ছড়ানো হয়েছে। তবে এর পেছনেও রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ

যে কোনো খবর, অখবর বা গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ভার্চুয়াল জগতে। কিন্তু প্রথাগত বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া তা ছড়াতে পারে না। কারণ প্রথাগত মিডিয়ার পদ্ধতিগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাচাই-বাছাই ও সত্যতা নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো কিছু প্রকাশ বা প্রচার করতে পারে না। দায়িত্বশীলতারও একটি বিষয় থাকে। যেমন– কোনো একটা ধর্মীয় উপাসনালয়ে ভাংচুর হলো। সে খবর হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে যাবে; কিন্তু প্রথাগত গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কেননা এ খবর প্রকাশিত বা প্রচারিত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এধরনের খবর প্রকাশ বা প্রচার না করার পক্ষেই গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা। এসব কারণে প্রথাগত গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। অনেক হিসাব-নিকাশ করে এবং সম্পাদনার প্রক্রিয়া শেষ হলে সুপাঠ্য বা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়ে ওঠে খবর।

দেশের জনগণের বেশির ভাগই কোনো একটা মতাদর্শ, দল, শ্রেণি বা গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত থাকে। তবে জনগণ সত্য জানতে চায়; কিন্তু ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেন না। যাচাই করা খুব সহজও নয়। নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিও নেই। শর্মা ও তাঁর সহযোগীরা ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪৩]

ক. তথ্যের উৎস বা তথ্য বিচ্ছুরণকারী;
খ. তথ্য/আধেয় এবং
গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারকারীর সাড়া।

ক. উৎস বা তথ্য বিচ্ছুরণকারী: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া সংবাদের আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট পুরো নকল করে ওয়েবসাইট তৈরি করে ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হচ্ছে। মেলিসা জিমদার ভুয়া সংবাদের ওয়েবসাইটগুলো চিহ্নিত করেছেন।[৪৪] এর মধ্যে কিছু ওয়েবসাইট যেগুলো বিখ্যাত বা বিশ্বস্ত ওয়েবসাইটের ডোমেইনের নাম কাছাকাছি রাখে। যেমন– abcnews.com.co এবং washingtonsblog.com. তবে এ ধরনের ওয়েবসাইটের সব সংবাদ বা নিবন্ধ ভুয়া থাকে না। অনলাইনের ব্যাপ্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বোটস[৪৫] (bots) তৈরি করা এবং নতুন অ্যাকাউন্ট বা ডোমেইন খোলা যাচ্ছে খুব সহজেই। কখনো তা বিনামূল্যে। এক গবেষণায় ১০ হাজার টুইটার ব্যবহারকারীর ওপর জরিপ চালানো হয়। এ গবেষণায় দেখা যায়, ২২ শতাংশ ব্যবহারকারী ভুয়া সংবাদের সঙ্গে যুক্ত, যারা বোটস অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে। মাত্র ৯ শতাংশ বোট ব্যবহারকারী প্রকৃত ঘটনার সংবাদ প্রচারে যুক্ত।[৪৬] আরেক গবেষণায় দেখা যায়, ভুয়া তথ্য বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে বেশি পাওয়া যায় (১৪ শতাংশ) যখন আসল তথ্য পাওয়া যায় ১১ শতাংশ প্লাটফর্মে।[৪৭]

খ. তথ্য/আধেয়: তথ্য বা আধেয় বিশ্লেষণ করেও কোন তথ্য মিথ্যা বা ভুয়া, তা চিহ্নিত করা যায়। হর্নি ও আদিলি ভুয়া ওয়েবসাইট ও বিশ্বস্ত মিডিয়া ওয়েবসাইট থেকে সংবাদ/নিবন্ধ নিয়ে টেক্সটচুয়াল বিশ্লেষণ করে ভুয়া তথ্য ও আসল তথ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছেন।[৪৮] গবেষণায় দেখা যায়, ভুয়া সংবাদের শিরোনাম বেশি বড়ো হরফে ও কম বিরতির শব্দ থাকে। সংবাদের মূল অংশ হয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও পুনরাবৃত্তিমূলক। কম বিশেষ্য থাকে; কিন্তু বিশ্লেষণী ও কৌশলী শব্দ থাকে। ভুয়া সংবাদ-নিবন্ধে বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহৃত শব্দ ও অধিক ক্রিয়া থাকে। বস্তুনিষ্ঠতা ও তথ্যভিত্তিক বুননের চেয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে। নিজস্ব তৈরিকৃত রেফারেন্স, ছাঁটাইকৃত বিবৃতি অভিযোগ থাকে এবং সাধারণীকরণ করা হয় কোনো বিষয়ে।[৪৯] ষোলো শত সংবাদ/নিবন্ধ বিশ্লেষণ করে আরেক গবেষণায় দেখা যায়, ১৩ শতাংশ সংবাদের আধেয় ও শিরোনামের মধ্যে অসংগতি রয়েছে এবং আধেয় ও শিরোনাম ঘোষণামূলক।[৫০]

গ. ব্যবহারকারীর সাড়া

ভুয়া সংবাদ চিহ্নিতকরণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সাড়া, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণও কাজে আসে। কখনো কখনো ব্যবহারকারীর সাড়া বা প্রতিক্রিয়া তথ্যের আধেয়ের চেয়েও শক্তিশালী সংকেত বহন করে। কেননা ব্যবহারকারীর সাড়া তথ্যের বিকৃতি ঘটানো কঠিন এবং প্রায়ই প্রকৃতটাই প্রকাশিত হয়। ব্যবহারকারীকে সংযুক্তকারী মাধ্যমিক তথ্য যেমন– লাইক, শেয়ার, মন্তব্য প্রভৃতিতে অপপ্রচারের কাঠামোবদ্ধ তথ্য প্রকাশিত হয়, যা তথ্যপ্রবাহের চিত্রকে প্রতিফলিত করে। মন্তব্যে ব্যবহারকারীর অবস্থান জানা যায়। জুবাইগা এবং তাঁর সহযোগীরা চারটি শ্রেণিতে ব্যবহারকারীর সাড়াকে ভাগ করেছেন।[৫১] যথা– ক. সমর্থন, খ. অস্বীকার, গ. প্রশ্নবিদ্ধ, ঘ. মন্তব্য (নিরপেক্ষ হতে পারে বা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে)। এক গবেষণায় দেখা যায়, ভুয়া সংবাদে প্রকৃত সংবাদের চেয়ে বেশি নেতিবাচক ও প্রশ্নবোধক সাড়া পাওয়া যায়।[৫২]

ভুয়া সংবাদ বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া

ভুয়া সংবাদ উৎপাদন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতরণ, বিনিময় ও তথ্য গ্রহণ একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া। নিচে এ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা হলো।

তথ্য উৎপাদন: প্রথাগত সাংবাদিকতায় তথ্য উৎপাদন হয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য উৎপাদন হয় বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে।

তথ্য বিতরণ: আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বিশেষ করে ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তথ্য বিতরণ প্রক্রিয়া প্রথাগত সাংবাদিকতা থেকে অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমনির্ভর হয়ে উঠেছে। তিন হাজার সাংবাদিকের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ২০ শতাংশ সাংবাদিক বলেছেন তারা মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাংবাদিকতার মৃত্যু ঘটিয়েছে।[৫৩] কম্পিউটার ও মোবাইল ডিভাইসের সহজ ব্যবহারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। একে অন্যের সঙ্গে সহজে দ্রুত শেয়ার করার সুযোগ থাকার কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া সংবাদ অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

গ্রহণ (Consumption): বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। ২০১৮ সালে ২০০২ জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর ওপর জরিপে দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ আমেরিকান ফেসবুক, ৭৩ শতাংশ ইউটিউব এবং ২০-৪০ শতাংশ অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। Statcounter GlobalStats-এর তথ্যানুযায়ী (নভেম্বর ২০১৮) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯২.৫৫ শতাংশই ফেসবুক ব্যবহার করে।

ফ্যাক্ট-চেকার: ভুয়া তথ্য ও সংবাদ প্রতিরোধ করতে Snopes এবং Politifact-এর মতো তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে fact-checking journalism-এর জন্য নিয়োজিত থাকে। তবে প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান যেমন– 'Factmata' প্রযুক্তিভিত্তিক ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ সেবা দিয়ে থাকে তার সেবাগ্রহীতাকে। মূলত তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ভুয়া তথ্য শনাক্ত করে।

অনলাইন তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো হাতিয়ার নেই। তবে কতগুলো বিষয় অবশ্যই যাচাই করা যেতে পারে। যে ওয়েব থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করা হচ্ছে তার যথাযথ কর্তৃপক্ষ, তথ্যদাতার পরিচিতি, ওয়েবে যোগাযোগ নম্বর ও ঠিকানা, কপিরাইট চিহ্ন, ওয়েবসাইট আপডেট করা হয় কি না প্রভৃতি বিষয় অবশ্যই যাচাই করতে হবে।[৫৪] পয়েন্টার ইনস্টিটিউটের পদ্ধতি অনুসরণ করে মার্টিন হুকারবাই ওয়েবসাইটের সত্যতা যাচাইকরণে নিম্নোক্ত চেকলিস্ট তৈরি করেছেন।

১. কর্তৃত্ব	:	এটা পরিচিত, স্বীকৃত বা সুনাম আছে এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থা কি না?
২. অন্তর্ভুক্তি	:	সাইটটির সঙ্গে খ্যাতিমান ব্যক্তি বা সংস্থা জড়িত কি না?
৩. নির্ভুলতা	:	পাঠের সময় ভুল পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি ভুল থাকে তবে সন্দেহ পোষণ শুরু করতে হবে।

৪. চেহারা : সাইটটি কি সবকিছুকে সুন্দরভাবে সাজাতে পেরেছে? তবে বিশ্বাসযোগ্য সাইটও সেকেলে মনে হতে পারে।
৫. বোধগম্যতা : এটি কোনো অর্থ বহন করে কি না?
৬. সময়োপযোগিতা : এটি আপডেট করা হয় কি না?
৭. লিঙ্ক : একই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাইটের সঙ্গে লিঙ্ক দেওয়া আছে কি না?
৮. পেজ র‍্যাংক : সাইটের র‍্যাংকিং কোন অবস্থানে?
৯. বস্তুনিষ্ঠতা : পক্ষপাতিত্বের কোনো নিদর্শন রয়েছে কি না?
১০. বিশ্বাসযোগ্যতা : সাইটটি নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে কি না? সাধারণজ্ঞানে এটিকে সঠিক মনে হচ্ছে কি না?

মাহামুদুল হক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

* তথ্যের উৎপত্তিস্থল বা উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্যটি দিয়েছে তার প্রোফাইল যাচাই করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উৎস জড়িত প্রভৃতি বিষয় চিহ্নিত করতে হবে।
* মূল তথ্য প্রদানকারী চিহ্নিত করতে হবে এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে হবে।
* ঘটনা ঘটার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
* ঘটনার স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে গুগল ম্যাপ, গুগল আর্থ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

'খবর' পওয়া মাত্রই তা শেয়ার, ক্লিক বা লাইক দেওয়া যাবে কি না বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে রাজনৈতিক গুজব যাচাই করার জন্য ওই ব্যক্তির মতাদর্শ ও দল বিবেচনায় অবশ্যই নিতে হবে। আসল কথা হলো, তথ্যদাতার পরিচিতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধেয়ের বিচারক হিসেবে নিজেকে স্থাপন করতে হবে। কী শেয়ার করা যায়, কী লাইক বা ক্লিক করা যাবে, সে বিচারবোধ বা বিবেক সবার থাকতে হবে। বিবেকবোধ না থাকলে এসব নিয়ম বা টিপস দিয়ে কাউকে আবদ্ধ করা যায় না। অনলাইন গুজব বড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনেক প্রাণহানিও ঘটতে পারে গুজবের কারণে। দেশ যেতে পারে রসাতলে।

কোনোকিছু প্রকাশিত হলেই তা বিশ্বাস করতে হবে, এমনটি নয়। নিজস্ব সন্দেহপ্রবণতা ও সাধারণজ্ঞান কাজে লাগাতে হবে। সন্দেহ হলে অবশ্যই তা যাচাই করতে হবে। গুগল বা অন্য সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তথ্য যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে। এখানে ছবি বা ভিডিওর উৎস বের করা যায়।

একই নামে কখনো দুটি ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব না। আসল ওয়েবসাইটের সঙ্গে নকল ওয়েবসাইটের কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। চেহারা এক হলেও, আসল ওয়েবসাইটের নামে সাধারণত https:// ইত্যাদি লেখা থাকলেও ভুয়া ওয়েবসাইটগুলোয় তা থাকে না। সামাজিক মাধ্যমে কোনো খবর দেখে সন্দেহ হলে ওই প্রতিষ্ঠানের ধরনের সঙ্গে সেটি না মিললে ডোমেইন পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে সুপারিশমালা

সমাজে ভুয়া সংবাদের আধিক্য এখন জটিল সমস্যা। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গতি ও গভীরতা ভুয়া সংবাদের দাপট বৃদ্ধি করেছে। কোনো একক ব্যবস্থায় ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে নিকটবর্তী বা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন।[৫৬]

১. ভুয়া সংবাদ ভাইরাল হলে তাৎক্ষণিক তা যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন হয়। ফ্যাক্ট-চেকার এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। ১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের রাজনীতিবিষয়ক লেখক ডেভিড ব্রোডার প্রথম তথ্য যাচাই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।[৫৭] তাৎক্ষণিকভাবে এটা কার্যকর পদ্ধতি। সরকার তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভুয়া সংবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারে। সিঙ্গাপুরের যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রাণালয় factually (https://www.gov.sg/factually) নামে একটি ওয়েব পেজ এবং মালয়েশিয়া সরকার ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ Sebenarnya (https://sebenarnya.my/) নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করে।
২. যেসব ভুয়া সংবাদ দুই বা ততোধিক ফ্যাক্ট-চেকার দিয়ে যাচাই করা হয়েছে এবং ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে সেসব তথ্যকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'Disputed' বা 'Fake' বা হ্যাশট্যাগ দেওয়া যেতে পারে।
৩. গুগল অধিক বিশ্বস্ত তথ্য বা ওয়েবসাইটকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথমদিকে রাখতে পারে এবং দুর্বল বা গুজবনির্ভর সাইটগুলোর প্রাধান্য কমিয়ে দিতে পারে।
৪. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং সুশীলসমাজ ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারে।
৫. টীকা তত্ত্বকে (Inoculation Theory) কাজে লাগোনো যেতে পারে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে 'মনস্তাত্ত্বিক টীকা' প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে এ তত্ত্বে। গবেষণায় দেখা যায়, 'মনস্তাত্ত্বিক টীকা' ভুয়া সংবাদের আধিক্য প্রতিরোধে কাজ করে। ভুয়া সংবাদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।[৫৮] ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে জনগণের যৌক্তিক ভিত্তি শক্ত করে।
৬. টুইটার ও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বোটভিত্তিক ভুয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।
৭. গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিকতা, সময়োপযোগিতা ও স্বচ্ছতা প্রধান তিনটি উপাদান তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ে কার্যকর। সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার প্রতি আস্থা বাড়াতে কাজ করতে পারে। *Snopes*-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক Brooke Binkowski এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'Ensuring quality journalism (and thus quality content) is crucial because that will make it easier for people to find *'vetted, nuanced, contextual and in-depth information.'*[৫৯]
৮. গবেষণায় দেখা যায়, জনগণের মধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতা বা সংবাদ সাক্ষরতার অভাব রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে জনগণের সংবাদ সাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংবাদ সাক্ষরতার ওপর কোর্স বাধ্যতামূলক করতে হবে। সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে হবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে।[৬০] ভুয়া সংবাদ, মিথ্যা তথ্য বা বিকৃত তথ্য ও সংবাদ যাচাই-বাছাইয়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতা অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আজ পরিগণিত।
৯. বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে জার্মানি, সিঙ্গাপুর ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে আইন পাস করেছে। বাংলাদেশে রয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা সবার মধ্যে থাকলে গুজবকেন্দ্রিক উদ্ভূত পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। এ ধরনের আইন পাস করা প্রয়োজনও হয়তো হতো না। বিশেষজ্ঞরা ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে নতুন আইন প্রণয়নকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ নতুন আইন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।[৬১] এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণবিহীন সমাধান যেমন জনগণ দ্বারা পরিচালিত সংবাদ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং বিদ্যমান আত্মনিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামোকে শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়া কার্যকরী হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ভুয়া তথ্য ও ভুয়া সংবাদ সমাজে আজ মহামারির মতো দেখা দিয়েছে। সুতরাং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও আইনগত শাস্তি দিয়ে ভুয়া সংবাদ ঠেকানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা, সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ নীতি প্রণয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য 'মনস্তাত্ত্বিক টীকা' প্রদান করা। ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাংবাদিকতার পরিকাঠামো ও বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটি শক্তিশালীকরণ।

পাদটীকা:

১. গার্ডিয়ান, ৯ জুন ২০১৭।
২. Harriss & Raymer (2017).
৩. হক (২০১৮)।
৪. Vosoughi & Aral (2018).
৫. Allcott & Gentzkow (2017).
৬. Golbeck et. al. (2018).
৭. Mihailidis & Viotty (2017).
৮. Lazer et. al., (2018).

৯. Mele et. al. (2017).
১০. Mele et al., (2017).
১১. Sharma et al., (2019).
১২. শর্মা ও তাঁর সহযোগীদের মতে ধোঁকাবাজি ও গুজব ভুয়া সংবাদের উপাদান (Sharma et al., 2019).
১৩. Zubiaga (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR) 51, 2 (2018), 32.
১৪. প্রচারণা (propaganda) অর্থে অপপ্রচার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
১৫. Rosen (2017).
১৬. Rosen (2017).
১৭. Lee Kuan Yew মারা যান ২৩ মার্চ ২০১৫।
১৮. Chua et. al. (2016).
১৯. উইকিপিডিয়া।
২০. উইকিপিডিয়া।
২১. Korta (2018).
২২. Prooijen (2018).
২৩. Wan Ting & Ze Song (2017).
২৪. You Gov (2017).
২৫. Pennycook & Rand (2018).
২৬. Allcott & Gentzkow (2017).
২৭. Allcott & Gentzkow (2017).
২৮. Shu et. al. (2017).
২৯. বিবিসি বাংলা (২০১৮).
৩০. বিবিসি বাংলা (২০১৮).
৩১. The Daily Star (2017).
৩২. The Daily Star (2013)
৩৩. ফণী সর্বোচ্চ গতিশীল অবস্থায় ছিল ২০১৯ সালের ২ মে।
৩৪. বিবিসি বাংলা (২০১৮ক)। ভুয়া বিবিসি বাংলার ইমেজটি আসল বিবিসির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে।
৩৫. The Daily Star (2017).
৩৬. Funke (2018).
৩৭. Haque et. al. (2019).
৩৮. যাচাই ওয়েব দেখুন www.jaachai.com/about
৩৯. বিডি ফ্যাক্ট-চেক এর ওয়েবসাইট দেখুন https://bdfactcheck.com/
৪০. ইত্তেফাক (২০১৮)।
৪১. হক (২০১৮)।
৪২. হক (২০১৬)।
৪৩. Sharma et. al., (2018).
৪৪. Zimdars (2016).
৪৫. বোটস্ হচ্ছে মনুষ্য বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম দ্বারা পরিচালিত ভুয়া অ্যাকাউন্ট, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। বোট অ্যাকাউন্ট দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে টুইট, পুনঃটুইট, লাইক, অনুসরণ বা অনুসরণছেদ বা অন্য অ্যাকাউন্টে সরাসরি বার্তা পাঠানো যায়।
৪৬. Shu et. al. (2018).
৪৭. Zannettou (2018).
৪৮. (2017).
৪৯. Pérez-Rosas et. al. (2017).
৫০. Silverman, (2015).
৫১. Zubiaga (2018).
৫২. Sharma et. al., (2018).
৫৩. Paine (2015).
৫৪. হক (২০১৬)।
৫৫. হক (২০১৬)।
৫৬. Wan Ting (2017).
৫৭. Broder (1989).
৫৮. Wan Ting (2017).
৫৯. Meyer (2017).
৬০. সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা ও এ সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনার জন্য দেখুন: হক (২০১৮)।
৬১. Wan Ting (2017).

তথ্যসূত্র

১. Allcott, Hunt & Gentzkow, Matthew (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives* 31, 2 (2017), 211–36.

২. ইত্তেফাক (২০১৮). নির্বাচনের মাঠে গুজব নিয়ে উদ্বেগ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮।

৩. Broder, D. S. (1989). Should news media police the accuracy of ads?. *The Washington Post*. [Online], Available at https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/01/19/should-news-media-police-the-accuracy-of-ads/42ef57f9-eb13-4fa0-8aa0f809b0aae672/?utm_term=.8f0b2ac8c67a. [Retrieved on 12 March 2019].

৪. Chua, Alton Y. K.; Cheah, Sin-Mei; Goh, Dion Hoe-Lian; & Ee-peng Lim. (2016). Collective rumor correction on the death hoax of a political figure in social media. Proceedings on the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems: PACIS 2016, Chiayi, Taiwan, 2016 June 27- July 1. Research Collection School of Information Systems, [Online], Available at https://ink.library.smu.edu.sg/sis_research/3609 [Retrieved on 12 March 2019].

৫. Funke, Daniel (2018). *There are 149 fact-checking projects in 53 countries. That's a new high.* Poyenter, [Online], Available at https://www:poynter:org/news/reportthere-are-149-fact-checking-projects-53-countries-thats-new-high, [Retrived on 6 June 2019].

৬. Golbeck, Jennifer; Mauriello, Matthew; Auxier, Brooke; Bhanushali, Keval H; Bonk, Christopher; Bouzaghrane, Mohamed Amine; Buntain, Cody; Chanduka, Riya; Cheakalos, Paul; & B Everett, Jennine (2018). Fake News vs Satire: A Dataset and Analysis. In Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science. ACM, 17–21.

৭. Haque, Md. Mahfuzul and others (2019). Fact-checking Initiatives in Bangladesh, India, and Nepal: A Study of User Engagement and Challenges. In *Proceedings of Computation+Journalism Symposium, Miami, USA, February 2019.*

৮. Harriss, L & Raymer, K (2017). Online information and fake news, POSTNOTE, House of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, No 569, July 2017.

৯. Horne, Benjamin D & Adali, Sibel (2017). This Just In: Fake News Packs a Lot in Title, Uses Simpler, Repetitive Content in Text Body, More Similar to Satire than Real News, Cornel University [Online], Available at https://arxiv.org/abs/1703.09398 [Retrived on 23 March 2019].

১০. Korta, Samantha M. (2018). Fake News, Conspiracy Theories, And Lies: An Information Laundering Model for Homeland Security, a thesis report, Naval Postgraduate School, California.

১১. Lazer, D. M. J. et al. (2018). "The Science of Fake News," *Science*, vol. 359, no. 6380, pp. 1094–1096.

১২. Mele, N; Lazer, D; Baum, M; Grinberg, N; Friedland, L; Joseph, K & Mattsson, C. (2017). Combating fake news: An agenda for research and action. [Online]. Availavle at https://shorensteincenter.org/combating-fake-news-agendafor-research/ [Retrieved on 12 May 2019].

১৩. Meyer, R. (2017, February 3). The rise of progressive 'fake news'. The Atlantic, [Online], Available at https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/02/viva-la-resistance-content/515532/ [Retrieved on 12 May 2019].

১৪. Mihailidis, Paul & Viotty, Samantha (2017). "Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake News, and the Role of Media Literacies in 'Post-fact' Society," American Behavioral Scientist 61, no. 4 (2017): 441–454, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002764217701217.

১৫. হক, মাহামুদুল (২০১৬), সাংবাদিকতা: অফলাইন অনলাইন, এপিপিএল, ঢাকা।
১৬. হক, মাহামুদুল (২০১৮), সবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সাক্ষরতা: ধারণায়ন ও কর্মপরিকল্পনা অন্বেষণ, নিরীক্ষা, ২২১তম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮।
১৭. Paine, Emory (2015). The Next Step: Social Media and the Evolution of Journalism.
১৮. Pennycook, Gordon & G Rand, David. (2018). Who falls for fake news? The roles of bullshit receptivity, over-claiming, familiarity, and analytic thinking.
১৯. Pérez-Rosas, Verónica; Kleinberg, Bennett; Lefevre, Alexandra & Mihalcea, Rada (2017). Automatic Detection of Fake News. arXiv preprint arXiv:1708.07104 (2017).
২০. Prooijen, Jan?Willem van; & Douglas, Karen M. (2018). Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain, European Journal of Social Psychology, published by John Wiley & Sons, Ltd, 2018 Dec; 48(7): 897–908.
২১. Rosen, Christopher. (2017). All the times Donald Trump has called the media 'fake news' on Twitter. [Online], Available at http://ew.com/tv/2017/06/27/donald-trump-fake-newstwitter/ [Retrived at 30 August 2017].
২২. harma, Karishma; Qian, Feng; Jiang, He; Ruchansky, Natali; Zhang, Ming; & Yan Liu (2017). Combating Fake News: A Survey on Identification and Mitigation Techniques, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), *37, 4, Article 111 (August 2018). [Online], Available at https://tist.acm.org/ [Retrived on 13 June 2019]*.
২৩. Shu, Kai; Mahudeswaran, Deepak; Wang, Suhang; Lee, Dongwon & Huan Liu (2018). FakeNewsNet: A Data Repository with News Content, Social Context and Dynamic Information for Studying Fake News on Social Media. arXiv preprintarXiv:1809.01286 (2018).
২৪. Shu, Kai; Sliva, Amy; Wang, Suhang ; Tang, Jiliang & Liu, Huan (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter* 19, 1 (2017), 22–36.
২৫. Silverman, Craig (2015). Lies, damn lies and viral content, a report, Columbia Jurnalism School.
২৬. The Daily Star (2013). Shapla Chattar Crackdown: Death, missing claim unfounded; Hefajat fails to produce a single name, *published on 22 May* 2013 *[Online] Available at* https://www.thedailystar.net/news/death-missing-claim-unfounded [Retrived on 22 April 2019].
২৭. The Daily Star (2017). It's fake, published on 15 October 2017.
২৮. The Daily Star, (2017). Rangpur Mayhem: Hatred stirred up for days, published on 12 November 2017, [Online], Available at https://www.thedailystar.net/frontpage/rangpur-mayhem-they-whipped-hatred-days-attack-1489861 [Retrived on 22 April 2019].
২৯. Vosoughi & Aral (2018). "The Spread of True and False News Online," cited in Korta (2018).
৩০. Wan Ting, Carol Soon & Ze Song, Shawn Goh (2017). What Lies Beneath the Truth: A Literature Review on Fake News, False Information and More, Institute of Policy Studies.
৩১. বিবিসি বাংলা (২০১৮)। ভুয়া খবর ঘিরে বাংলাদেশে পাঁচটি বড়ো ঘটনা, প্রকাশ ১৪ নভেম্বর ২০১৮ [অনলাইন], দেখুন www.bbc.com/bengali/news-46126648, (ডাউনলোড ১৩ মার্চ ২০১৯).
৩২. বিবিসি বাংলা (২০১৮ ক), ফেক ওয়েবসাইট কীভাবে চিনবেন, ১৮ নভেম্বর ২০১৮ [অনলাইন], দেখুন https://www.bbc.com/bengali/news-46251925, (ডাউনলোড ১৩ মার্চ ২০১৯).
৩৩. YouGov. (2017). C4 study reveals only 4% surveyed can identifz true or fake news. [Online], Available at http://www.channel4.com/info/press/news/c4-study-reveals-only-4- surveyed-can-identifz-true-or-fake-news [Retrived on 15 June 2019].
৩৪. Zannettou, Savvas; Sirivianos, Michael; Blackburn, & Kourtellis, Nicolas (2018). The Web of False Information: Rumors, Fake News, Hoaxes, Clickbait, and Various Other Shenanigans. arXiv preprint arXiv:1804.03461 (2018).
৩৫. Zimdars, Melissa (2016). False,Misleading,Clickbaity,and/orSatirical"News"Sources [Online], Available at https://21stcenturywire.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-DR-ZIMDARS-False-Misleading-Clickbait-y-and-Satirical-%E2%80%9CNews%E2%80%9D-Sources-Google-Docs.pdf. [Retrived on 22 April 2019].
৩৬. Zubiaga, Arkaitz; Aker, Ahmet; Bontcheva, Kalina; Liakata, Maria & Procter, Rob (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)* 51, 2 (2018), 32.

লেখক: প্রভাষক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও প্রভাব

ড. মাহাবুবুর রহমান

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইন্টারনেটের আগমনের পর থেকেই অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, কখনো কখনো উঠেছে নানা বিতর্ক। একদল গবেষক ট্র্যাডিশনাল গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে ইন্টারনেটের পার্থক্য সুস্পষ্ট করতে চেয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। গবেষকরা ট্র্যাডিশনাল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে ইন্টারনেটের কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যেমন– ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিমিষেই লাখ লাখ বার্তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়। প্রয়োজনীয় তথ্যটি বের করেও ব্যবহার করা যায়; কিন্তু বিদ্যমান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোয় বার্তার গুরুত্ব একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমান নিবন্ধে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে ইন্টারনেটের সম্ভাবনা ও প্রভাব নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে।

কেউ কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকাকে দেখছেন ইতিবাচকভাবে। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক স্বার্থের জন্য ইন্টারনেট হবে ইতিবাচক। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ভোটগ্রহণ, মতামত জানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটা আবশ্যকীয় ভূমিকা রাখে। আবার অনেকে মনে করেন, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক সংগঠন আধিপত্য করলে তাদের ক্ষমতা, একচেটিয়া শাসন, ক্ষমতার নির্মমতা আরও বেড়ে যাবে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সম্ভাবনা

রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ইন্টারনেট তিনটি ক্ষেত্রে অবারিত সুযোগের পথ প্রশস্ত করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যেমন–

ক. তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিমেষেই যে কোনো বিষয়ে লাখ লাখ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা যায়, তথ্য আদানপ্রদান করা যায় এবং দেখামাত্রই চোখের নিমেষে তা গ্রাহকের সামনে হাজির করতে পারে।

খ. বার্তা সম্প্রসারণের সুযোগ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন বিশ্বের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তাদের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ত্বরিত গতিতে এবং সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রাখতে পারে।

গ. আন্তক্রিয়া

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন তাৎক্ষণিক তাদের নীতিনির্ধারক, পদস্থ কর্মকর্তা ও নেতাদের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে লাখ লাখ সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তক্রিয়া করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে উল্লিখিত সুবিধাগুলোকে তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারে। যথা–

i. রাজনৈতিক দলগুলো তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক শাখার সঙ্গে ইন্টানেটের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করতে পারে।
ii. রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির তথ্য ও সিদ্ধান্ত ইন্টারনেটে সঞ্চিত রাখতে পারে এবং পরে সময়মতো তা ব্যবহার করতে পারে।
iii. রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক তথ্য, পরিচিতি প্রভৃতি পদক্ষেপ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে।

রাজনীতির ওপর ইন্টারনেটের নানামুখী প্রভাব

বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে লক্ষ করলে আমরা দেখব, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিধিত্বশীল এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। কেউ কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকাকে দেখছেন ইতিবাচকভাবে। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক স্বার্থের জন্য ইন্টারনেট হবে ইতিবাচক। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ভোটগ্রহণ, মতামত জানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটা আবশ্যকীয় ভূমিকা রাখে। আবার অনেকে মনে করেন, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক সংগঠন আধিপত্য করলে তাদের ক্ষমতা, একচেটিয়া শাসন, ক্ষমতার নির্মমতা আরও বেড়ে যাবে। নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে সমাজের বৃহত্তর প্রযুক্তি সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে আরও অধিকতর কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহার করবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে সাইবার স্পেসকেন্দ্রিক যে প্রবল বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছে, এর ফলে ইন্টারনেট রাজনীতির জন্য কোনো মঙ্গল সৃষ্টি করবে কি না, সেটা নিয়ে একধরনের বড়ো আশঙ্কা রয়েছে। কারও কারও মতে, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক এলিট, সরকার এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেটকে জনস্বার্থের বিপরীতে তাদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করবে। উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক দল ও ইন্টারনেটের আন্তসম্পর্কের সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তসম্পর্ক বিবেচনা করে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম, বার্তার ধরন, বিচ্ছুরণ, জনসংযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। ... এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানে বেশকিছু রাজনৈতিক সংগঠন ইন্টারনেটকে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করছে এবং এর কার্যকর ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে এখনো সচেতন নয়

ক. প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণ

বর্তমান প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় ট্র্যাডিশনাল একক আধিপত্যশীল রাজনৈতিক দলগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। এর মধ্যেই প্রাধান্য পরম্পরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কার্যক্রমে জনগণের সারাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান আধিপত্যশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিকতার ধরন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট কার্যকর ও যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হলে রাজনৈতিক দলগুলোয় কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আধিপত্য থাকবে না। পারস্পরিক আন্তক্রিয়ায় দায়িত্ববান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে রাজনৈতিক দলগুলো অধিক মাত্রায় গণতান্ত্রিক রূপ লাভ করবে এবং স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাভোগী মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঘেঁষার সুযোগ পাবে না। কারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য থাকবে উন্মুক্ত। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম আরও সুষম ও ত্বরান্বিত হবে। নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মিথস্ক্রিয়া আরও সুষম হবে। জনগণ ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উঠবে।

খ. পরিবর্তনের নামে পূর্বের আধিপত্যশীল ধারা জোরদার

কেউ কেউ অভিযোগ করেন, ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শ্রেণি আরও শক্তিশালীভাবে তাদের অধিপত্য কায়েম করতে পারবে। রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন পর্যালোচনা করে এর কিছু প্রায়োগিক দিক আমরা খুঁজে পাই। যেমন–

গ. তথ্য সংরক্ষণ ও বিচ্ছুরণে কার্যকরী মাধ্যম

রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ওয়েবসাইটে বা ইন্টারনেটের আর্কাইভে তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দলীয় সদস্য, নেতাকর্মী এবং সাধারণ জনগণকে সার্বক্ষণিক তথ্য জানাতে পারে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য বিচ্ছুরণ করার ফলে এটা রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আগের চেয়ে আরও গতিশীল করেছে। এছাড়া দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, আঞ্চলিক শাখার মধ্যেও দ্রুত তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারে। তাত্ত্বিকদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক নানা দিক, নীতি-নৈতিকতা, নির্বাচনি ম্যানিফেস্টো জনগণকে জানানোর জন্য ইন্টারনেটের একটি ওয়েবসাইট হতে পারে আগের প্রচার-প্রচারণা, লিফলেট, পোস্টার, বক্তৃতা, বিবৃতির চেয়ে অনেক কার্যকর।

ঘ. রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণার হাতিয়ার

বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণার জন্য নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ট্র্যাডিশনাল গণমাধ্যমগুলোর চেয়ে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও বিলবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালায়, যা আগের চেয়ে অধিক কার্যকর। রাজনৈতিক দলগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটারকে তাদের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট দিকগুলো সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। সংগঠনের সদস্য, সমর্থক ও অনুরাগীরা ই-মেইলের মাধ্যমে সংগঠন সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে পারে।

ঙ. অংশীদারিত্বমূলক ও গতিশীল হাতিয়ার

একটি গতিশীল ও অংশীদারিত্বমূলক হাতিয়ার হিসেবে ইন্টারনেটকে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ, সংগঠিতকরণ, সংগঠনের প্রতি অধিকতর আগ্রহী ও আনুগত্যশীল করে তোলার জন্য ব্যবহার করে থাকে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন সাধারণ সভা, মিটিং বর্তমানে ইলেকট্রনিক কনফারেন্সের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রচুর সময় ও অর্থ বেঁচে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যদিও পারস্পরিক দ্বিমুখী যোগাযোগ সংগঠিত হয়; কিন্তু অনেকে মনে করেন, অভ্যন্তরীণ আধিপত্যের কারণে সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরাই মূল আলোচক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে উপনীত হন। ইন্টারনেট প্রযুক্তি যদিও এক্ষেত্রে সরাসরি আন্তক্রিয়ার সুযোগ ও গতিশীলতা আনয়ন করে; তারপরও এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। এ ছাড়াও বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর পরিচালিত আরও কিছু গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো সংগঠনে গতিশীলতা আনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহার ভালো ফল আনতে পারে।

বিদ্যমান আধিপত্যশীল রাজনৈতিক দলগুলো আগের মতোই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও শক্তিশালীভাবে জনগণের ওপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর ক্ষমতা থেকে দূরে সরে থাকার কারণে ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দলগুলো, যাদের আইসিটি ব্যবহারের সামর্থ্য নেই বা যারা এটি ব্যবহার করতে পারে না, তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে। কারণ আগের ক্ষমতাবান রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো অর্থ ও লোকবলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট খুলে জনগণকে তাদের কাছে টানতে সক্ষম হবে। বিদ্যমান বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষেই সম্ভব হবে পেশাদার ওয়েব ডিজাইনার এবং সার্বক্ষণিক আইসিটি বিষয়ে দক্ষ কর্মী রেখে নিয়মিত ওয়েবসাইটের তত্ত্বাবধান করার মাধ্যমে জনগণের কাছে সংগঠনের নীতি-নৈতিকতা, নির্বাচনে প্রার্থীদের ভালো দিকগুলো তুলে ধরে ভোট পাওয়ার কাজ করতে। যেসব রাজনৈতিক নেতা নিজে প্রযুক্তি দক্ষ নন কিংবা সময়ের অভাবে জনসংযোগ করতে পারেননি, তিনি অর্থের বিনিময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমেই তা সম্পাদন করতে পরবেন। অপরদিকে যাদের খরচ নির্বাহ করার সুযোগ নেই, তারা জনগণ ও ক্ষমতা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে চলে যাবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাজে যে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছিল, বাস্তব প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে পুরোটাই উল্টো বা অন্যরকম।

এক্ষেত্রে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেট রাতারাতি সমাজে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে না। এটি নির্ভর করবে ইন্টারনেটের দীর্ঘমেয়াদি ও পরিকল্পিত ব্যবহারের ওপর। লক্ষণীয় দিক হলো, সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু অগ্রগামী রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক সংগঠন তাদের সুনাম, সংসদে অবস্থান এবং স্বীয় দলের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করেছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বর্তমানে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও অধিক সংগঠিত হয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম আগের চেয়ে আরও গতিশীল হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ইন্টারনেটের ভূমিকা ইতিবাচক।

সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করা যায় কিংবা আস্থা রাখা চলে যে, সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোয় প্রাতিষ্ঠানিকতা, গণতন্ত্র, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষ

নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আগ্রহের পেছনে নিহিত একটি বড়ো কারণ হলো এটি প্রচলিত রাজনৈতিক ধারায় আরও উৎকর্ষ ও নতুনত্ব নিয়ে আসবে। ইন্টারনেট রাজনৈতিক দলগুলোর পরবর্তী কার্যক্রমকে শুধু সুসংহত ও সুসংগঠিতই করবে না, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর উৎকর্ষতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাবে। আর তাই দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, রীতিনীতি জনগণের কাছে আরও কার্যকররূপে উপস্থাপনের জন্যই ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হচ্ছে। দেখা যায়, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটকে ব্যবহার না করলেও হালের ফ্যাশন হিসেবে ইন্টারনেটকে নিজেদের কর্মব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তসম্পর্ক বিবেচনা করে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম, বার্তার ধরন, বিচ্ছুরণ, জনসংযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। রাজনৈতিক যোগাযোগকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং নির্বাচনি প্রচার চালানোর জন্য পশ্চিমা বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলো ওয়েব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। কখনো কখনো রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি, একের ওপর অন্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানে বেশকিছু রাজনৈতিক সংগঠন ইন্টারনেটকে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করছে এবং এর কার্যকর ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে এখনো সচেতন নয়।

প্রথাগত রাজনীতি থেকে বিরত থেকে মূল রাজনীতির সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে রাজনীতিবিদরা নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের ওপর প্রভাব ফেলে। যদিও রাজনৈতিক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের আধিক্য বর্তমানে নানা সমস্যা বা ত্রুটি সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে দেখা গেছে, দেশের নাগরিক সঠিক পরিস্থিতিতে সতর্কতার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, নাগরিকরা শুধু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে নীতিনির্ধারণেই নয়, রাজনীতির অনেক জটিল বিষয়েও মতপ্রকাশ করতে পারে এবং জটিল বিনিময় প্রথাও তৈরি করতে পারে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

দারিদ্র্যবিমোচনে কৌশলগত যোগাযোগের প্রায়োগিক সুবিধা

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

সামাজিক জীবনে মানুষ নিত্যনৈমিত্তিক তথ্যাদি সাধারণত যেভাবে পেয়ে থাকে, পরিকল্পিত যোগাযোগ পদ্ধতিতে সেই তথ্যাদি প্রাপ্তিতে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম রয়েছে। কারণ কৌশলগত যোগাযোগ হয়ে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। এখানে জনসাধারণকে উদ্যোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হয়। যার মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের কার্যক্রম ও উদ্যোগের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কৌশলগত যোগাযোগ কার্যক্রমে সবসময় দ্বিমুখী তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে চিন্তাগত বৈষম্য কমে আসে এবং উভয় পক্ষই দক্ষতার সঙ্গে ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। এভাবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্যের মতো ভয়াবহ অভিশাপকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা সম্ভব।

দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৭২ সালে এদেশে ৮২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। ক্রমান্বয়ে

কৌশলগত যোগাযোগ কার্যক্রমে সবসময় দ্বিমুখী তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে চিন্তাগত বৈষম্য কমে আসে এবং উভয় পক্ষই দক্ষতার সঙ্গে ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। এভাবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্যের মতো ভয়াবহ অভিশাপকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা সম্ভব

দারিদ্র্যবিমোচন সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে যা কমে এসে ২০১০ সালে ১৮.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে তা ১৩.৮ এবং ২০১৮ সালে দেখা যায় দেশে হতদরিদ্রের হার ৯ শতাংশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে হতদরিদ্র কোনো মানুষ দেশে থাকবে না বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক দশকের বেশি সময় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমাগতভাবে ৭ শতাংশের ওপরে রয়েছে এবং এ প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে পৌঁছার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা। আর তা অর্জন করা সম্ভব হলে মানুষের বর্তমান মাথাপিছু আয় ১৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরকম

একটি পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যহীন জনসমাজ গঠন করা আমাদের যেমন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, তেমনি তা অর্জন করাও বেশ শক্ত একটি চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে শুধু সম্পদের বিষয়াদি মাথায় রেখে সামনে এগোলেই হবে না, আমাদের উদ্যোগী হতে হবে আরও অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় মাথায় রেখে। কারণ হলো–

১. হতদরিদ্র মানুষ শুধু তাদের সম্পদের অভাবের কারণে গরিব থাকে না। এর পেছনে দারিদ্র্যের বহুমুখী ও জটিলতর কারণ রয়েছে। তথ্যের প্রবেশগম্যতা, তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধা না থাকা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তথ্যজ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতিজনিত কারণে সমাজে দারিদ্র্যাবস্থা বিরাজ করতে দেখা যায়। তথ্যে প্রবেশগম্যতা মানুষের এই অভাব দূর করতে কাজে লাগে এবং জীবন-জীবিকার উন্নয়ন হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে মানুষ তার সুবিধাদি ভোগ করা, আয়-রোজগারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা কি না তার জীবনের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ মাত্র।

২. হতদরিদ্রের জীবনব্যবস্থার সঙ্গে তথ্য, শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে নারীশিক্ষা। হতদরিদ্র নারীশিশুর জীবনে দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো প্রয়োজনীয় তথ্যজ্ঞানের অভাব। কারণ তাদের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার বেশি, শিশুমৃত্যুর হার অনেক, পরিবারে সদস্যসংখ্যা বেশি, তারা রোগাক্রান্ত হয়ে থাকেন তুলনামূলকভাবে বেশি। দুর্গম, সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটিতে তাদের বসবাস করতে হয়। তারা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগবঞ্চিত, মাতৃকালীন সেবা, শিশু জন্মদান এবং ঘন ঘন সন্তান প্রসব করায় মা ও শিশু উভয়ই জীবনের ঝুঁকিতে থাকেন। তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা ও দক্ষতার উন্নয়নের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, কৃষি সুপারভাইজারদের ভূমিকা রয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারী কমিউনিটিতে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য কখন কোথায় কোন সেবা পাওয়া যায়, তা অবহিত করলে মায়েরা তা গ্রহণ করতে পারেন, যা কি না মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করতে অবদান রাখে। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছেলেমেয়েদের সঠিক সময়ে স্কুলে দেওয়ার বিষয়ে এবং কৃষি সুপারভাইজররা ফসল বীজ, সার, কীটনাশকবিষয়ক তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করতে পারেন, যা সরাসরি এই হতদরিদ্র মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে অবদান রাখতে পারে।

৩. আমরা জানি, সামাজিক পর্যায়ে দরিদ্রতার রূপ বেশ জটিল ও বহুমাত্রিক। সমাজে নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে, যার সব সমানভাবে একই প্রক্রিয়ায় সমান তালে ঘটে না। সমাজে যিনি ধনী, বেশি সম্পদের মালিক, তিনি প্রতিনিয়ত আরও বেশি পাহাড়সম সম্পদের মালিকে পরিণত হচ্ছেন আর হতদরিদ্র তার গরিবি হাল কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আমাদের যেসব সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও একই রকম সামাজিক বৈষম্য বিরাজ করে। ফলে দরিদ্র মানুষ সরকারের সেবা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সেবাগুলোও গ্রহণ করতে পারছে না, যা কিছুটা হলেও তাদের উপকারে লাগতে পারত। আমাদের সমাজে স্বচ্ছতার বড়ো অভার রয়েছে। হতদরিদ্রকে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পেতে ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হতে হয়, যা দুর্নীতিবাজ অফিসারদের দৌরাত্ম্যের কারণে বন্ধ হচ্ছে না। সমাজ থেকে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য তথ্য ও কৌশলগত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য যত উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে, তার পুরোটাই কোনো না কোনোভাবে একশ্রেণির দুর্নীতিবাজের নেটওয়ার্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় প্রকৃত সুফল প্রাপ্তি থেকে জনমানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। তা না হলে আমাদের সমাজ থেকে আরও দ্রুতগতিতে, কম সময়ে দারিদ্র্য হ্রাস পেতে পারত। কাজেই কৌশলগত তথ্য যোগাযোগ সেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের সমাজে দারিদ্র্যের যে চেহারা বিরাজমান, তা গতানুগতিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সমাজের দরিদ্র মানুষ তাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি, যোগাযোগের সুযোগ, মেধাশ্রম দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবারের দারিদ্র্যাবস্থা দূর করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাদের বর্তমান দারিদ্র্যের হাত থেকে বের হয়ে আসতে নতুন নতুন চাহিদার জন্ম হয়েছে, যা পূরণ করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। সে জন্য দরকার দক্ষতা, যোগ্যতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ও কৌশলগত ব্যবহার।

৫. সমাজ থেকে দারিদ্র্যদূরীকরণে তথ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যজ্ঞান ও যোগাযোগ দক্ষতা মানবদেহের রক্ত সঞ্চালনের মতো কাজ করে থাকে। আমাদের দেশ তথ্যপ্রবাহ ও তথ্য যোগাযোগ বিষয়ে বেশ উন্নতি সাধন করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের প্রান্তিক হতদরিদ্র মানুষের জন্য তা নানা কারণে উপকারে আসতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে বিদ্যমান সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না গরিব মানুষ। নানা বাধাবিপত্তির কারণে গরিব মানুষ প্রয়োজনীয় সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের বঞ্চনাময় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে পারছেন না। যেমন– একজন সেবিকা, তিনি সামান্য যাতায়াত খরচের বিনিময়ে অনেক সময় দূর থেকে এসে সেবা দেন। তিনি তার পেশার যোগ্য সম্মানি পান না বা যে পরিমাণ সম্মানি পওয়ার কথা ছিল, তা থেকে বঞ্চিত থেকেই তাকে সেবা দিয়ে যেতে হচ্ছে। কারণ তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাযোগের অভাবে তার জন্য উপযুক্ত কাজটি জোগাড় করতে সমর্থ হননি। একজন কৃষক শ্রম দিয়ে তাঁর ফসল উৎপাদন করেন। মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে স্থানীয় বাজারে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে অনেক কম টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ বাজারের তথ্য, ফসলের প্রকৃত মূল্য এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কৃষকের হাতে নেই। তাঁকে ঠকাচ্ছে অন্য একটি শ্রেণি। কৃষক বছরের পর বছর আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেই জীবনযাপন করছেন। একজন মায়ের সামনে নিজ শিশু সামান্য ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে আর তিনি তা দেখছেন। অথচ এতটুকু তথ্য থাকলে ঘরে বসেই তিনি তার শিশুটির জীবন রক্ষা করতে পারতেন। সম্পদের অভাবে মানুষ এখন গরিব নেই, গরিব আছে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি আর যোগাযোগ দক্ষতাজনিত কারণে। কাজেই বর্তমান দারিদ্র্যের চেহারা থেকে বের হতে হলে আমাদের কৌশলগত তথ্য ও তথ্য যোগাযোগ কার্যক্রমের প্রায়োগিক দিক নিয়ে ভাবতে হবে এবং সঠিক যোগাযোগ কৌশল সঠিক সময়ে উপযুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৬. হতদরিদ্র মানুষ তাদের প্রয়োজনগুলো সঠিক সময়ে যথাযথভাবে গুরুত্বের সঙ্গে নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে না। সরকারের দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রক্রিয়ায় কৌশল গ্রহণে হতদরিদ্র লোকজনের জীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করা হয় না। গরিব লোকজনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে অনেক সময় অবজ্ঞা ও অসম্মানের চোখে দেখা হয়। ফলে গরিবের জীবনের পরিবর্তন আসতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা সঠিক পদক্ষেপ কী হতে পারে, তা প্রশাসনের কাঠামো ভেদ করে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উঠে আসতে সক্ষম হয় না। বছরের পর বছর জনসমাজের মানুষ ভোগান্তির মধ্যে থাকে, তাদের মুক্তির আলো দেখার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। মোবাইল ফোন, ফেসবুক নেটওয়ার্কের মতো সুবিধা বা কৌশলগত তথ্য যোগাযোগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে হতদরিদ্র মানুষের জীবনের সঠিক চিত্র সবার সামনে তুলে আনতে ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত পেতে আর ভোগান্তিতে ভুগতে হয় না এবং সেখানে একধরনের পরিবর্তন আসে, যার ফল হিসেবে দরিদ্র মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে।

৭. প্রায়োগিক যোগাযোগ কার্যক্রম সমাজের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। কারণ মানুষ সরকারি, বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানা সেবা গ্রহণ করে। বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নানা সেবা পাওয়ার মাধ্যমে যথাযথ উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধিত হয়। যে সমাজে তথ্যের প্রবাহ যত দ্রুততার সঙ্গে সবার জন্য উন্মুক্ত হয়, সে সমাজে তত তাড়াতাড়ি সামাজিক সব প্রতিবন্ধকতা, অরাজকতা, দুর্নীতি দূর করে মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে সহায়ক হয়। ফলে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আর দারিদ্র্যাবস্থা থেকে তারা মুক্তিলাভ করতে শুরু করে।

৮. তথ্যপ্রবাহ বাড়ানো, তথ্য যোগাযোগ ও তথ্যসেবা শক্তিশালী হলে দারিদ্র্য দূর হবেই। এমন কোনো গ্যারান্টি ততক্ষণ কাজ করবে না, যতক্ষণ সমাজে তথ্যযোগাযোগ সেবা ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র্যময়তা বিরাজ না করছে। সবার জন্য সমানভাবে তথ্যসেবার সুযোগ বা যে তথ্য

দরকার তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার চাহিদা পূরণ হবে। যার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হতে শুরু করবে।

৯. যোগাযোগ ও তথ্যসেবা ব্যবস্থাপনার ধরন এমন হবে যাতে সব দরকারি তথ্য মানুষ নাগালের মধ্যে পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং যার প্রভাবে সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে সব ধরনের দারিদ্র্যাবস্থা দূর হতে বাধ্য হবে।

১০. আমাদের জনসমাজে এখন পর্যন্ত রেডিওর ব্যবহার, টেলিভিশন, নিউজপেপার তথ্যপ্রবাহের মাধ্যম হিসেবে অবদান রেখে আসছে। ইদানীং মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইন্টারনেট সুবিধাসহ নানা রকম মোবাইল অ্যাপের সুবিধার কারণে মানুষ সর্বশেষ তথ্যাদি পেয়ে আসছে। কম্পিউটার সুবিধার মাধ্যমে মানুষের যোগাযোগ পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতি ঘটেছে। ফলে মানুষ সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকার পরও দারিদ্র্যের মতো ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতি জীবনের গণ্ডির বাইরে আসতে সক্ষম হয়।

দারিদ্র্যবিমোচনে সরকারের নীতিগত অবস্থান হলো– ২০২১ সালের মধ্যে দেশ থেকে হতদরিদ্রের পরিমাণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা। এই সময়ের পর দেশে কোনো হতদরিদ্র মানুষ থাকবে না। এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমাগতভাবে ৭ শতাংশের ওপরে রয়েছে এবং এই প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে পৌঁছার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এবং সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা ও রাজনৈতিক কমিটমেন্টের আলোকে দেশ থেকে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য কোন ধরনের কৌশলগত যোগাযোগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং কীভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে, তার প্রায়োগিক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে–

১. কৌশলগত যোগাযোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা সরকারের গৃহীত নীতিমালাগুলোর উন্মুক্ত ও অর্থপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনার পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করবে। কৌশলগত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সচল থাকলে দেশ ও সমাজের অধিকসংখ্যক নাগরিকের অবহিত হওয়ার সুযোগ থাকে, অংশগ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায় এবং সরকারের নীতির প্রতি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। ফলে সফলভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে সরকার ঘোষিত কমিটমেন্ট অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া সহজতর হয়ে যায়।

২. মানুষের প্রত্যাশা আর অর্জনের স্বপ্ন অপ্রত্যাশিত ধরনের। প্রত্যাশা বাড়তেই থাকে, তা কখনোই কমে না। একটি অর্জন যেমন হাজার অর্জনের দ্বারকে খুলে দেয়, তেমনই হাজার দ্বারের প্রত্যেকটি অর্জন হাতের মুঠোয় সহজে পেতে প্রত্যাশার জন্ম হতেই থাকে। কিন্তু কৌশলগত যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় মানুষ বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা লালনপালন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। মানুষের মন থেকে অলীক ও অবাস্তব প্রত্যাশা দূর করতে সহায়তা করে। সরকার ও নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকেও মানুষকে প্রত্যাশিত স্বপ্ন দেখানোর প্রবণতা সীমার মধ্যেই থাকে। যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং অর্জন করা দুরূহ, কৌশলগত যোগাযোগ প্রয়োগের মাধ্যমে সেই কাজগুলোই ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। সরকারের পক্ষে জনগণের জন্য কতটুকু করা সম্ভব আর কোনগুলো করা সম্ভব নয়, জনগণ ও সরকার সম্মিলিতভাবে কী অর্জন করতে পারে, তা শক্তিশালী যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

৩. কৌশলগত প্রায়োগিক যোগাযোগ দ্বারা সর্বদা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলোর দ্বারা মানুষ চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে, সরকারের ঘোষণা এবং এর ব্যত্যয় ধরতে সক্ষম হয়। সরকারকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে কার্যকর উদ্যোগের সমালোচনা করে সহায়তা করতে পারে। নাগরিকের দায়িত্ব কী, কোথায়, কতটুকু, তা তারা কার্যকরভাবে রাখতে পারে। সেই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্যবিমোচন করতে পারে।

৪. প্রায়োগিক ও কৌশলগত যোগাযোগ একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরিতে সহায়তা করে। কারণ কৌশলগত যোগাযোগের মাধ্যমে সব শ্রেণিপেশার মানুষকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা হয় এবং সব সেক্টরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন একটি সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরি হয় যে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাহীনভাবে সাবলীল গতিতে এগোতে থাকে। জাতীয় উন্নয়নের গতি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছলে তাকে আর কোনোভাবে থামানো যায় না। ফলে সমাজ ও দেশ থেকে অভাব, অভিযোগ দূর হয়ে যায়। সেখানে আর দারিদ্র্যের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫. কৌশলগত যোগাযোগ কার্যক্রম নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সমন্বিত সংলাপের সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা পালন করে থাকে। সংলাপের সংস্কৃতি সমাজের দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। দেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অসীম উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে কৌশলগত তথ্য ও যোগাযোগের ওপর নির্ভর করার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর সব অভাবনীয় উন্নয়নের উদাহরণ যেখানে রয়েছে, সেখানেই কৌশলগত তথ্য যোগাযোগ কার্যক্রমের ভূমিকা পৃথিবীব্যাপী উন্নয়ন এজেন্ডায় জায়গা করে নিয়েছে।

দুর্গম ও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এলাকাসহ সব এলাকার জন্য নেটওয়ার্ক ও তথ্য যোগাযোগ কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সবার জন্য সমান ও পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।... তাতে কী পরিমাণ বীজ-সার প্রয়োজন, কোন ফসল কোথায় বিক্রি করলে দাম বেশি পাওয়া যাবে– এসব তথ্য যেমন কৃষকের উপকারে আসছে, তেমনি অন্য শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য উপযোগী অ্যাপ থাকলে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না

৬. হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান-চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে হেল্প লাইন বা পল্লি তথ্যকেন্দ্র সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রিমোট এলাকা থেকে যে কেউ তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য মোবাইল ফোনের সাহায্যে কল সেন্টারে জানতে চাইলে সেখান থেকে একজন স্পেশালিস্ট যথাযথ সমাধান ও তথ্য সহায়তা দিয়ে ওই গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে হতদরিদ্র মানুষ তথ্যে প্রবেশ করছে এবং তা কাজে লাগিয়ে জীবনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। এই হেল্প লাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতপক্ষে গ্রামীণ হতদরিদ্র নারীই বেশি উপকৃত হচ্ছে।

৭. কম্পিউটার লিটারেচার শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে একধরনের যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তথ্য যোগাযোগ বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশের ৩০ বছরের কম বয়সি লোকের পরিমাণ প্রায় ৪৫ শতাংশ, যারা প্রকৃতপক্ষে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে মূল

চালিকাশক্তি এবং আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর তথ্যজ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা আর যোগ্যতার ওপর নির্ভর করছে দারিদ্রমুক্ত জনসমাজ গঠন করা কতটুকু সম্ভব হবে। এই যুবসমাজই পারবে জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে।

৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভম হবে। এই মানবসম্পদ শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর, সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে সমানভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে নজর দিতে হবে। আর এর প্রধান উপকারভোগী হবে গ্রামীণ হতদরিদ্র, বঞ্চিত নারী-পুরুষ, ছাত্র, যুবক-যুবতীসহ সব মানুষ। যাদের সামষ্টিক অগ্রগতিই হবে বাংলাদেশের দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং তা ২০৩০ সালের মধ্যে অবশ্যই গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

৯. যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গবেষণা কার্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই। যোগাযোগবিচ্ছিন্ন, তথ্যহীন গ্রামীণ জনসমাজে যেসব হতদরিদ্র মানুষ বসবাস করছে, তাদের জন্য যথাযথ প্রায়োগিক তথ্যকেন্দ্র, প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তি এবং সবার জন্য সমানভাবে ব্যবহারের পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার যাতে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

দুর্গম ও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এলাকাসহ সব এলাকার জন্য নেটওয়ার্ক ও তথ্য যোগাযোগ কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সবার জন্য সমান ও পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। হতদরিদ্রদের জন্য কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট তৈরি করা, স্থানীয় কনটেন্ট, প্রয়োজনীয় একাধিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ মাধ্যম, গ্রামীণ মানুষ যাতে তথ্য বুঝতে পারে সেজন্য ইন্টারপ্রেটের ব্যবস্থা, তথ্যে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং নানা শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাপের ব্যবস্থা থাকা, যেমন– কৃষকের জন্য ফসলি অ্যাপের মাধ্যমে কোন জমিতে, কোন সময় কী ফসল করতে হবে, তাতে কী পরিমাণ বীজ-সার প্রয়োজন, কোন ফসল কোথায় বিক্রি করলে দাম বেশি পাওয়া যাবে– এসব তথ্য যেমন কৃষকের উপকারে আসছে, তেমনি অন্য শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য উপযোগী অ্যাপ থাকলে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। দ্রুত প্রয়োজনীয় সময়ের কাজটি সময়ে সম্পন্ন করতে পারবে। এভাবে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পেতে থাকবে। গ্রামীণ পরিবেশে জনমানুষের জন্য তথ্যে সহজতর গমনের জন্য কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট তৈরি করতে দরকার হবে কম্পিউটার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট কানেকশন, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল ফটো-প্রিন্টার। এই কমন অ্যাকসেসের ব্যবস্থা সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে বা বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পাবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটির সংগঠনগুলো সরকারি-বেসরকারি বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এ কাজ করতে পারে। সবার জন্য কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং সুফল পাবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসে তা অবদান রাখবে। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে তথ্যজ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে মানুষ দরিদ্রতাকে জয় করতে পারছে না। এ থেকে উত্তরণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এসব কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে। স্থানীয় ও বিদ্যমান সম্পদের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাত্রা বর্তমানে খুব কম। তথ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের যে সম্পদ রয়েছে তার বহুমাত্রিক ব্যবহার বেড়ে যাবে এবং তাদের বাড়তি উন্নয়ন ঘটানোয় অবদান রাখবে। কারণ তাদের আয় বেড়ে যাবে এবং দারিদ্র্য থেকে মানুষ মুক্তি পাবে।

সবার জন্য কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং সুফল পাবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসে তা অবদান রাখবে। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে তথ্যজ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে মানুষ দরিদ্রতাকে জয় করতে পারছে না। এ থেকে উত্তরণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এসব কমন অ্যাকসেস পয়েন্ট তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে

তথ্যসূত্র

১. DFID, Department of International Development: The Significance of information and communication technologies for reducing poverty.

২. World Economic Forum: Three steps of poverty reduction In Bangladesh.

৩. Role of information and communication technologies in Rural poverty alleviation: Mohammad Atiur Rahman, BRAC Development Institute, BRAC University.

৪. দারিদ্র্যবিমোচনে গণমাধ্যমের সংশ্লিষ্টতা: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১১৯তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পিআইবি, ঢাকা।

৫. মানতা সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র ও আমাদের গণমাধ্যম: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১৩৯তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫।

৬. Communication Strategy for Development Programs, A guideline for Programme Managers and communication officers, UNICEF Bangladesh, 2008.

৭. Community Disaster Risk Management and the media, Partnership for disaster reduction Southeast Asia phase-3, Bangkok, Thailand, 2006.

৮. Reducing Vulnerability to climate change: the project implementation plan, CARE Bangladesh, Asia Brach 2002.

৯. Using strategic communication to fight poverty through PRSPs, by Masud Mozammel & Sina Odugbemi, Information and communication for development, DFID,- 2005.

১০. কৃষিতথ্য সম্প্রসারণে লোকজ মাধ্যমের ভূমিকা, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১১৫তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৩, পিআইবি।

১১. তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও ইন্টারনেটের প্রভাব, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১১২তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩, পিআইবি।

১২. আধুনিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা /মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নিরীক্ষা ১৩৩তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পিআইবি।

১৩. উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা, সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ১০/১১/২০০৩, ঢাকা।

১৪. দারিদ্র্যবিমোচনে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার: অধিকার বার্তা, চতুর্থ সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর ২০০৪, খুলনা।

১৫. দুর্যোগ প্রশমনে গাণমাধ্যম: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সবার কথা, জুন ২০১৩, এমএমসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

লেখক: উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষক

বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টিভির চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোস্তাকিম স্বাধীন

বাংলাদেশে দুই দশক ধরে গণমাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ও সংবাদকর্মীদের মধ্যে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের প্রভাব যতটা বদলে দেওয়ার কথা ছিল, তা পুরোপুরি বদলায়নি। গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন সম্প্রচার মাধ্যমগুলোয় তৈরি হয়েছে অস্থিরতা; সমস্যার অন্তরালে সমাধানের অনেক দিকও উঠে এসেছে। দর্শক, সম্প্রচারকর্মী, সাংবাদিক সংশ্লিষ্টদের মনে জেগেছে বিস্তর প্রশ্ন।

স্যাটেলাইট চ্যানেল বৃদ্ধি

বাংলাদেশে দুই দশক আগে এবং বর্তমানে চলমান স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বেড়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, দেশে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংখ্যা ৪৪টি। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৩-৪টি চ্যানেল। এসব চ্যানেলের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে, অধিকাংশ চ্যানেলই সংবাদ ও বিনোদনধর্মী। সব চ্যানেলের একই ধারাবাহিকতায় দর্শক যে যার পছন্দমতো অনুষ্ঠান দেখতে পারছেন। কিন্তু সম্প্রচারের বিষয়ভিত্তিক গভীরতা কতটা দর্শককে টানছে? শুধুই বিনোদন চাই, দেশের মানুষ কি

বাংলাদেশ এখন স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার সুবিধাও ভোগ করতে শুরু করেছে। উন্নয়নমুখী জীবনযাত্রায় বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব, সবখানে যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া। এত কিছুর পরও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে অস্থিরতা কমেনি। ... এসব গণমাধ্যমকর্মীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ছাঁটাই হলে তাঁদের অনিশ্চিত জীবন বা তাঁদের পরিবারের অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে, তা ভাবনার বিষয়। তাঁরা কী কী সীমাবদ্ধতায় আছেন, তারও একটা সমাধান করা উচিত

শুধুই তথ্য চায়? গণমাধ্যমগুলো সেই আলোকে দর্শকের দিক বিবেচনা করে এগিয়ে যাচ্ছেন কি না, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রশ্ন আসতে পারে– দর্শকের চাহিদা পূরণ করতে গণমাধ্যম বিশেষ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর দায়বদ্ধতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি সম্প্রচার মানের উন্নয়ন হচ্ছে কি না? এত সম্প্রচারমাধ্যম, তবুও সংশ্লিষ্টদের ভেতরে অস্থিরতা কেন? পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গণমাধ্যমের দিকে দর্শক ঝুঁকছে। দেশি চ্যানেলের মালিক, ক্যাবল অপারেটর কর্তৃপক্ষ– সবাই এখন খোঁজার চেষ্টা করছে কী কারণে চ্যানেলগুলো ব্যবসাসফল হয়ে উঠছে না। তবে এ মাধ্যমটি এখন শিল্পের মর্যাদা পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'একসময় সাংবাদিকতার দীক্ষায় যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, তারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মালিক, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজেদের পেশাগত অবস্থান পুরো ধরে রাখতে পারছেন না। মালিক বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থ বিবেচনা করতে গিয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।' অন্যদিকে টেলিভিশন চ্যানেলের মান নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। দেখতে দেখতে দুই দশক অতিক্রান্ত। স্যাটেলাইট চ্যানেলের পরিধি বেড়েছে। কিন্তু এসব চ্যানেলে কারা কাজ করছেন, কারা পরিচালনা করছেন, কী ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে? অনুষ্ঠানের গভীরতা কতটুকু এবং দর্শক, দেশ ও অর্থনীতির কতটুকু উপকারে আসছে? পেশাদারিত্ব কি পুরোপুরি বজায় থাকছে? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তরে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখনো বাংলাদেশ কেবল কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনে পা দেওয়া সম্প্রচার সময় অতিক্রম করছে। একেকটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের এ পরিপূর্ণতা আনতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন, সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করছেন, বাজার সফল করতে মালিক, কর্তৃপক্ষ একত্রিত হচ্ছেন। বাস্তবে কী ঘটছে? দেখা গেছে– এই প্রক্রিয়াধীন পরিস্থিতিতে টেলিভিশন বা বেতার যারা বেসরকারিভাবে সম্প্রচারে আছে, সেখানে পেশাগত জীবনের নিরাপত্তা পুরোপুরি তৈরি হয়নি।

বিশেষায়িত চ্যানেল

ইতোমধ্যে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত হিসেবে ধরা হচ্ছে শিশুতোষ অনুষ্ঠাননির্ভর 'দুরন্ত' এবং সংগীতবিষয়ক 'গান বাংলা' চ্যানেল দুটিকে। পৃথিবীর বহুদেশে শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী ভারতেই এমন শতাধিক চ্যানেলের উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। তাই চ্যানেল কর্তৃপক্ষের উচিত যারা সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান, তথ্য প্রচার করতে চান, তাদের শুধু বিষয়ভিত্তিক প্রচার করা। এতে দর্শক চাহিদা বাড়বে, মালিক-কর্তৃপক্ষ বা ক্যাবল অপারেটররা ব্যবসায়িকভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবেন। বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিশেষায়িত চ্যানেল হিসেবে হতে পারে খেলাধুলা, পর্যটন, সংগীত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুতোষ অনুষ্ঠান, কৃষিবিষয়ক, পরিবেশ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনবিষয়ক, আইনবিষয়ক জনদুর্ভোগ, ঐতিহ্য, ধর্মীয় আবার কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইতিহাসনির্ভর অনুষ্ঠান। বিনোদনধর্মী বহু ধরনের বিষয় নিয়ে চ্যানেলগুলো ভাবতে পারে। হয়তো ভাবছে; কিন্তু বিশেষায়িত মেজাজ তৈরি হয়নি।

উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে টিভি চ্যানেল: দক্ষ জনবল, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ এখন স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার সুবিধাও ভোগ করতে শুরু করেছে। উন্নয়নমুখী জীবনযাত্রায় বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব, সবখানে যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া। এত কিছুর পরও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে অস্থিরতা কমেনি। কথায় কথায় ছাঁটাই হচ্ছেন শত শত দক্ষ কর্মী। এসব গণমাধ্যমকর্মীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ছাঁটাই হলে তাঁদের অনিশ্চিত জীবন বা তাঁদের পরিবারের অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে, তা ভাবনার বিষয়। তাঁরা কী কী সীমাবদ্ধতায় আছেন, তারও একটা সমাধান করা উচিত। এমন অভিমত শীর্ষ কয়েকটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। আর ছাঁটাই হওয়া গণমাধ্যমকর্মীদেরও একই প্রশ্ন।

সম্প্রচারমান নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিদিন কোটি কোটি দর্শক টেলিভিশনের সংবাদ দেখেন। যারা সংবাদ উপস্থাপন করছেন, তাঁদের তথ্য পরিবেশনের ভাষা, উচ্চারণ বিশেষ করে সরাসরি সম্প্রচারকালে যে ধরনের তথ্য পরিবেশনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, তার মান নিয়ে কে প্রশ্ন করবে? একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু কতটুকু দর্শকপ্রিয় এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করছে, তা কে দেখবে? যেসব সংবাদভিত্তিক অধিকার আদায়কারী সংগঠন রয়েছে, তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। চ্যানেলগুলো নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী তাদের কর্মী নিয়োগ, বেতনভাতা সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করে থাকে। কথা প্রসঙ্গে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের দায়িত্বশীল একজন সংবাদ ব্যক্তিত্ব বলেন, একসময় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বেতার ও সংবাদপত্র সেবার মনোভাব নিয়ে সেবা ও বিনোদন এবং মানুষকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদসেবা দিত। এখন মালিক-কর্তৃপক্ষের বহু দরকষাকষিতে সৃজনশীলতা কমে গেছে। এমন বহু টেলিভিশনে এখন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল পদে অপরিণত মানুষ যারা হয়তোবা রাজনৈতিক প্রভাবে অথবা মালিকদের স্বার্থ বজায় রাখতে কাজ করছে। ফলে পেশাগত দক্ষ ও অভিজ্ঞদের স্থান এখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্ব মানুষকে সঠিক তথ্য বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ হিসেবে তুলে ধরা। বাংলাদেশে গণমাধ্যমকর্মীর পেশাগত অধিকার আদায়ে বেশকিছু সংগঠন রয়েছে। এগুলো একেকটি পেশার স্বার্থ নিয়েই তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকারিভাবেও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের একাধিক সংস্থা রয়েছে; কিন্তু সবশেষ প্রতিফলন বা অর্জনের জায়গাটি কি বিস্তৃত হয়েছে?

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, একটি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার করার আগে এর অবকাঠামোগত দিক নিজস্ব কি না, কোথায় করবেন, কতজন পরিশীলিত ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বা সক্ষমতা আছে কি না– সবদিক বিবেচনা করে তবেই সম্প্রচারে আসা উচিত। তা না হলে একেকজন ২০ থেকে ২৫ বছর কাজ করার পর হঠাৎ তাদের বাদ দিলে এই দক্ষ মানুষের অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। এ নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে অনেক চিন্তাভাবনাও তৈরি হচ্ছে। এজন্য সরকারের এ বিষয়গুলো দেখার জন্য একটি কমিশন তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে টেলিভিশন মালিকদের আরেকটু আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

স্যাটেলাইট চ্যানেল থাকলেও ফেসবুকের উদ্ভাবন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিজগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আরও রয়েছে টুইটার, ইউটিউব, স্কাইপে, ভাইবার, গুগল প্লাস, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, হোয়াটসঅ্যাপের মতো জনপ্রিয় মাধ্যম। যাদের বলা হচ্ছে নিউ মিডিয়া। ... সংবাদ প্রকাশ ও জানার জন্য তারা এখন বেছে নিচ্ছে নিউ মিডিয়া। অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমসহ নিউ মিডিয়াগুলো তাই ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে

চ্যালেঞ্জ স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল: ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া বনাম নিউ মিডিয়া

স্যাটেলাইট চ্যানেল থাকলেও ফেসবুকের উদ্ভাবন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিজগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আরও রয়েছে টুইটার, ইউটিউব, স্কাইপে, ভাইবার, গুগল প্লাস, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, হোয়াটসঅ্যাপের মতো জনপ্রিয় মাধ্যম। যাদের বলা হচ্ছে নিউ মিডিয়া। নিউ মিডিয়ার আবির্ভাব এবং সময়ের বিবর্তনে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার ওপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে। সংবাদ প্রকাশ ও জানার জন্য তারা এখন বেছে নিচ্ছে নিউ মিডিয়া। অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমসহ নিউ মিডিয়াগুলো তাই ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। নিউ মিডিয়ার আবির্ভাবে অনেকে ফেসবুক এবং টুইটার থেকেই সংবাদ গ্রহণ করছে? কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে– এসব সংবাদ-ছবি তাৎক্ষণিক যাচাই-বাছাই ছাড়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য কিংবা নির্ভরযোগ্য? সংবাদ পড়া বা দেখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফেসবুক। বিশ্বে অন্তত ৬০ শতাংশ সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পড়া বা দেখা হয়। বাংলাদেশে ৬ কোটি ৩০ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ২ কোটিরও বেশি মানুষ ফেসবুকের সঙ্গে যুক্ত। ডিজিটাল নিউজ রিপোর্ট ২০১৫ সালে এ তথ্য দেয়। অন্যদিকে অনলাইন সাংবাদিকতার সম্প্রসারণ এবং নাগরিক ও মোবাইল

জার্নালিজমের বিকাশ তথ্যপ্রযুক্তি গণমাধ্যমকে গণতান্ত্রিক করে তুলেছে। নাগরিক সাংবাদিকতার নামে এখন তথ্য বা কনটেন্ট টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিওচিত্র, ইনফোগ্রাফ আদানপ্রদানে এসেছে মুঠোফোন সাংবাদিকতা। স্মার্টফোন বা ট্যাবলয়েড পিসির মতো ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রচার করা হচ্ছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোয়। তাই দ্রুত ট্র্যাডিশনাল মিডিয়ার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ঠিকই; কিন্তু এ অনলাইন সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ও পেশাগতভাবে পরিচালনা করা এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে রয়েছে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ। ফলে উন্নত বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলো ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট (ইউজিসি) সাইট খুলেছে। যেখানে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, সংবাদ অডিও-ভিডিও এসে জমা হয়। এসব সোশ্যাল মিডিয়া এডিটরের নেতৃত্বে রয়েছে ডেডিকেটেড উইং। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে (বিবিসি) সোশ্যাল মিডিয়া এডিটরের নেতৃত্বে ২৩ জনের আলাদা উইং এবং সিএনএন'র আই রিপোর্ট উইং রয়েছে।

কী ধরনের অনুষ্ঠান স্যাটেলাইট চ্যানেল সম্প্রচার করছে?

দর্শকদের প্রথম চাহিদায় থাকে সংবাদ। সংবাদের আদ্যোপান্ত, তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য। সংবাদের পাশাপাশি অধিকাংশ টেলিভিশনের একটি অংশজুড়ে থাকে আলোচনা বা টকশোভিত্তিক অনুষ্ঠান। এরপর থাকছে বিনোদনধর্মী নাটক, গান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, রান্না অনুষ্ঠান, ধর্মীয় কেরাত প্রতিযোগিতা, নৃত্যানুষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আইন ও খেলাধুলার তথ্য। এসব তথ্য ও বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন অনুষঙ্গ সংশ্লিষ্ট। সম্প্রচার করছে শিক্ষা, শিশুতোষ অনুষ্ঠান, বিতর্ক, প্রামাণ্য, বিদেশি ভাষার বাংলায় ডাবিংকৃত সিরিয়াল, চলচ্চিত্র, রাজনীতি ও তৃণমূলের ঐতিহ্য, ইতিহাস আমাদের প্রাণের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাথা। এসবই গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে– সম্প্রচার হলেই কি দর্শক তাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে উপভোগ করতে পারছেন?

এখানেও মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। মানসম্পন্ন-বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার প্রশ্নে এসব সোশ্যাল মিডিয়া কি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে? এখনো আমরা সেই পর্যায়ে যেতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এখন সময় এসেছে বিশেষায়িত টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনা করা।

সম্ভাবনার সম্প্রচার কমিশন

ইতোমধ্যে ২০১৪ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রণীত হয়েছে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা। এতে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সম্প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে বেতার ও টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিশ্বে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুষ্ঠানমালা এখন বাংলাদেশেও প্রচারিত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সম্প্রচার মাধ্যমগুলো নিজস্ব প্রযোজনার বাইরেও বেসরকারি ও সৃজনশীল ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এতে সম্প্রচার মাধ্যমগুলোয় প্রযোজিত ও বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠানের মাঝে সৃজনশীল ও নান্দনিক অনুষ্ঠানের সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সব নাগরিকের চিন্তা-চেতনা ও বিবেক, বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেখানে আরও বলা হয়েছে, 'সকল সম্প্রচার মাধ্যমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় এনে এ সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।' ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে– আইনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠিত হবে। এ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে। এ কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য থাকবেন। সবশেষে বলা হয়েছে, সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমানে সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগটি যাতে তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয়। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে সংবাদপত্রের ওয়েজ বোর্ডের আলোকেই জাতীয় সম্প্রচার কমিশনে সংবাদকর্মীদের পেশাগত পদবি, বেতনভাতা এবং শৃঙ্খলিত ব্যবস্থাপনা আমাদের সম্প্রচার ব্যবস্থাপনায় আনবে অভিনব পরিবর্তন।

লেখক: গণমাধ্যম গবেষক, সিনিয়র টেলিভিশন বার্তা প্রযোজক
এটিএন বাংলা

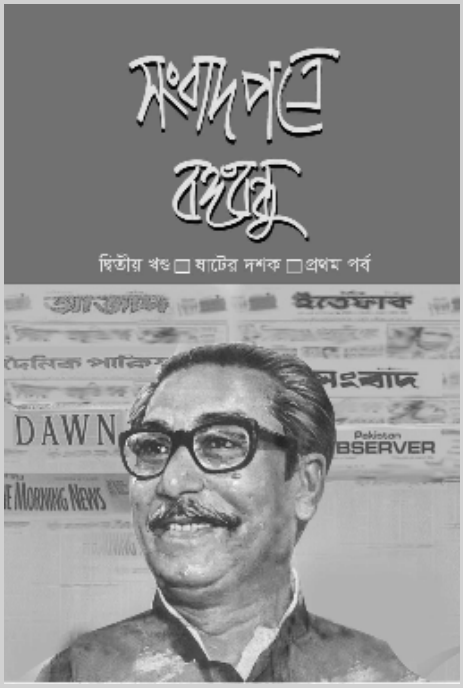

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ঢাকার বাইরে টিভি সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ বিপদ ও বিপত্তি

আমীন আল রশীদ

ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতা এমনিতেই নানা কারণে চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ। সে হিসেবে টেলিভিশন সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ আরও বড়ো। বিভিন্ন সংবাদপত্রে যারা স্থানীয় প্রতিনিধি, সংবাদদাতা এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের মূল শক্তি হচ্ছে সোর্স বা সূত্র। তাঁরা সবসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারলেও অন্য সাংবাদিকের কাছ থেকে বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ফোনে কল করে তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। যত বড়ো ঘটনাই হোক, কেবল মোবাইল ফোনে তথ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

একজন সাংবাদিক যে প্রতিবেদনটি লেখেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটি কপি-পেস্ট করেন অন্য সাংবাদিক। কেবল প্রতিবেদনটি মেইল করার আগে প্রতিবেদকের নামটি বদলে দেন। এ বিষয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি বা 'জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট' থাকে। কমবেশি অনেকেই এর সুবিধা নেন। তবে এই আদানপ্রদানটি চলে ডে ইভেন্ট বা দিনের ঘটনা সংশ্লিষ্ট সাধারণ খবরের ক্ষেত্রে। যেমন– দুর্ঘটনা, বিশেষ ব্যক্তি,

ইন্টারনেটনির্ভর সরাসরি সম্প্রচারের সবচেয়ে বেশি ও সহজ প্রযুক্তির নাম ব্যাকপ্যাক। এটি সহজে বহনযোগ্য। ঢাকার বাইরে বড়ো শহরগুলোর অফিসে সাধারণত ব্যাকপ্যাক দেওয়া হয়। ... যেমন– সুপ্রিমকোর্ট, জাতীয় প্রেস ক্লাব, মতিঝিলসহ যেসব জায়গায় নিয়মিত খবর তৈরি হয়, সেসব জায়গায় টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই লাইন টেনে রাখে এবং যেদিন লাইভ হয়, সেদিন অফিস থেকে ব্রডকাস্ট টিমের লোক গিয়ে সেটি দেখভাল করেন। অনেক সময় নানা কারণে ক্যাবল কাটা পড়ে। ফলে লাইভ বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত হয়ে যায়

এমপি-মন্ত্রীর অনুষ্ঠান, সরকারের কোনো প্রচারমূলক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা খেলাধুলা। বিশেষ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সাধারণত এই আদানপ্রদান হয় না। বিশেষ প্রতিবেদনের আইডিয়া নিয়ে সাংবাদিক নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করেন ঠিকই; লেখেন যে যার মতো।

টেলিভিশন সাংবাদিকতায় কপি-পেস্টের সুযোগ কম। এর মূল কারণ মাইক্রোফোন বা বুম। বিশেষ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তো বটেই, দিনের ঘটনার ক্ষেত্রেও।

ধরা যাক, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ঝালকাঠি প্রতিনিধি আক্কাস সিকদার কাঁঠালিয়া উপজেলার একটি অনুষ্ঠান কাভার করে এলেন।

সেখানে আয়োজকদের বক্তব্যও তিনি তাঁর ক্যামেরা এবং অফিসের মাইক্রোফোন বা বুমে ধারণ করলেন। কিন্তু এনটিভির প্রতিনিধি কে এম সবুজ তাকে বললেন, 'ভাই ভিডিও ফুটেজটা দিয়েন।' আক্কাস সিকদার হয়তো সম্পর্কের খাতিরে ভিডিও ফুটেজটি দিলেন। কিন্তু সবুজ যখন ওই সংবাদ এনটিভিতে পাঠালেন, তার কিছুক্ষণ পরই অফিস থেকে তাকে ফোন করে জানতে চাওয়া হবে, ফুটেজে এনটিভির বুম দেখা যাচ্ছে না কেন?

পত্রিকায় এই ভয় কম। কেননা প্রথম আলোর প্রতিবেদকের কোনো খবর যদি অন্য কোনো পত্রিকার প্রতিনিধি নাম বদলে পাঠিয়ে দেন, সেটি পত্রিকা অফিস বুঝতে পারবে না। তবে এক্ষেত্রেও বিপদ হতে পারে, যদি রিপোর্টের মধ্যে লেখা থাকে, 'এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন।' দেখা গেল, সমকালের প্রতিনিধি অসতর্কতার কারণে ওই লাইন থেকে প্রথম আলো শব্দটি ফেলেননি। স্থানীয় পর্যায়ে টিভি সাংবাদিকতার আরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলো বুম বা মাইক্রোফোনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। মোটা দাগে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

পত্রিকা ও টিভি সাংবাদিকতার পার্থক্য

সংবাদপত্র ও টেলিভিশন সংবাদে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন প্রথম সারির কোনো পত্রিকায় সাংবাদিকতা করলেই যে তিনি টেলিভিশন রিপোর্টার হিসেবেও খুব ভালো করবেন, এমনটা না-ও হতে পারে। কারণ টেলিভিশন সংবাদ মূলত ম্যাটার অব পিকচার অর্থাৎ ছবিই হচ্ছে টিভি সংবাদের প্রাণ। পত্রিকার সংবাদে যেমন তথ্য ও পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ, টিভির ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টো। এখানে অনেক বেশি তথ্য বা পরিসংখ্যান পরিত্যাজ্য।

টিভিতে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করাও খুব কঠিন। কারণ পত্রিকায় যেমন শুধু সূত্র উল্লেখ করেই অনেক বড়ো প্রতিবেদন করা যায়, টিভির ক্ষেত্রে তা কঠিন। কেননা যে কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে দরকার ছবি এবং সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য। খুব ব্যতিক্রমী কোনো ইস্যুতে ছবি বা বক্তব্য ছাড়া গ্রাফিক্স দিয়ে টিভি রিপোর্ট করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এটি বার্তা বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা মানতে চান না। তারা রিপোর্টারকে চাপ দেন ছবি ও বক্তব্যের জন্য।

পত্রিকা ও টিভির খবরের কাঠামোও এক নয়। পত্রিকায় যেমন 'ষড় ক' বা ফাইভ ডব্লিউ ওয়ান এইচ-এর সূত্র মেনে লিখলেই একটি সংবাদ দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে টিভির সংবাদে সবসময়ই এই 'ষড় ক' আবশ্যক নয়।

পত্রিকার রিপোর্ট লেখা হয় পাঠকের পড়ার জন্য। সেখানে বুঝতে অসুবিধা হলে পাঠকের একই লেখা একাধিকবার পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু টিভি বা সম্প্রচার মাধ্যমের খবর তৈরি করা হয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব শ্রেণির মানুষের জন্য। অর্থাৎ সম্প্রচারমাধ্যমের খবরের ভাষা হতে হয় এতটাই সহজ ও সাবলীল যে সেখানে অপরিচিত কোনো শব্দ ব্যবহারের সুযোগ নেই। যে কারণে বলা হয়, সম্প্রচারমাধ্যমের খবর হবে রাইট ফর টেল, অর্থাৎ বলার জন্য লেখা। পড়ার জন্য নয়।

টিভি সংবাদের কাঠামোও আলাদা। সেখানে এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলো পত্রিকার খবরে নেই। পত্রিকার সংবাদে যেটিকে বলা হয় ইন্ট্রো বা সংবাদ-সূচনা। সেখানে টিভির খবরের সূচনা বা ইন্ট্রোকে বলা হয় লিঙ্ক বা ইনভিশন (আইভি)। কোনো খবরে দু-তিন লাইনের একটা আইভি বা লিঙ্ক থাকার পর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও বক্তব্য বা শট জুড়ে দিলে সেটিকে বলা হয় আইভি শট। আইভির পরে খবরটিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য যদি একটা উভ বা আউট অব ভিশন থাকে, তাহলে সেটি উভ শট। এর মানে, টিভি নিউজের সব খবরেই আইভি অবশ্যই থাকতে হবে। প্যাকেজ হলেও সেখানে একটা আইভি বা লিঙ্ক থাকবে, যেটি পড়েন উপস্থাপক।

এগুলো টিভি সংবাদের খুব সাধারণ ধারণা বা এবিসিডি। যারা দীর্ঘদিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে হাত পাকিয়েছেন, তাঁরাও যে টিভি সংবাদের এই জার্গন বা পরিভাষাগুলো জানবেন, এমনটা না-ও হতে পারে। আবার টেলিভিশনের জন্য যদি প্যাকেজ করতে হয়, সেখানে আরও বেশি মুনশিয়ানার দাবি রাখে। প্যাকেজের আইভি কতটুকু হবে, সেখানে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য বা শট/সিংক কতটুকু থাকবে, এর দৈর্ঘ্য কতটুকু হওয়া স্ট্যান্ডার্ড এবং সর্বোপরি একটা প্যাকেজের দৈর্ঘ্য কতটুকু হওয়া উচিত– এসব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে ভালো টিভি রিপোর্টার হওয়া কঠিন।

ঢাকার বাইরে যারা সাংবাদিকতা করেন, তাঁদের অধিকাংশই যেহেতু সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করে এই কাজ করেন না, তাই ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ তৈরির এই পার্থক্যটা তাঁদের জানতে হয় চর্চার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষেরই উচিত তাদের প্রতিনিধিদের জন্য এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তবে প্রশিক্ষণ বা পড়াশোনার চেয়েও বেশি জরুরি কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও আগ্রহ। যার আগ্রহ বেশি, তিনি নিজ উদ্যোগেই শিখে নেন।

ক্যামেরা

ঢাকার বাইরে যারা বিভিন্ন টেলিভিশনের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের অধিকাংশকেই প্রতিষ্ঠানের তরফে ক্যামেরা দেওয়া হয় না। বরং প্রতিনিধিরা নিজেদের পয়সায় হ্যান্ডিক্যাম বা এরকম অল্প দামি ক্যামেরা কিনে কাজ চালান। বিভাগীয় এবং কয়েকটি বড়ো জেলা শহর ছাড়া সব জেলাতেই টিভি সাংবাদিক একই সঙ্গে ক্যামেরাপার্সন ও রিপোর্টারের কাজ করেন। ফলে বড়ো ক্যামেরা নিয়ে তাঁর পক্ষে যাতায়াত করা কঠিন। অনেক জায়গায় দু-একজন ক্যামেরাপার্সন ঘটনাস্থলে যান এবং সব টিভির সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের লোগো সংবলিত বুম বা মাইক্রোফোন নিয়ে সেখানে হাজির হন। অর্থাৎ টিভি সাংবাদিক যেখানে ১৫ জন, দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাপার্সন একজন বা দুজন। অনেক সময় স্থানীয় সাংবাদিক নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে যে ক্যামেরা কিনলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অফিস থেকে সেই ক্যামেরার দাম দেওয়া হয় না। কারণ প্রতিনিধিরা কর্মস্থল পরিবর্তন করেন।

সরাসরি সম্প্রচার

স্থানীয় পর্যায়ে টিভি সাংবাদিকদের আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচার। কয়েকটি প্রযুক্তিতে টিভিতে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় প্রযুক্তি ডিএসএনজি (DSNG-Digital Satellite News Gathering), ডিএমএনজি (DMNG- Digital Mobile News Gathering), ব্যাকপ্যাক, ক্যাবল ও মোবাইল ফোন।

ডিএসএনজি সাধারণত বড়ো কোনো ঘটনার জন্য পাঠানো হয়। এটি বেশ ব্যয়বহুল এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য একটি আলাদা গাড়ির প্রয়োজন হয়। এটি ইন্টারনেটনির্ভর সরাসরি সম্প্রচার প্রযুক্তি।

ডিএমএনজি মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পরিচালিত হয়। এটিও ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের কাছে থাকে না।

ইন্টারনেটনির্ভর সরাসরি সম্প্রচারের সবচেয়ে বেশি ও সহজ প্রযুক্তির নাম ব্যাকপ্যাক। এটি সহজে বহনযোগ্য। ঢাকার বাইরে বড়ো শহরগুলোর অফিসে সাধারণত ব্যাকপ্যাক দেওয়া হয়। এর বাইরে অধিকাংশ প্রতিনিধির কাছেই ব্যাকপ্যাক থাকে না। ক্যাবলও ব্যয়বহুল। এটি সাধারণত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ব্রডব্যান্ড কানেকশনের মতো আলাদা লাইন টেনে তৈরি করা হয়। যেমন– সুপ্রিমকোর্ট, জাতীয় প্রেস ক্লাব, মতিঝিলসহ যেসব জায়গায় নিয়মিত খবর তৈরি হয়, সেসব জায়গায় টেলিভিশিন কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই লাইন টেনে রাখে এবং যেদিন লাইভ হয়, সেদিন অফিস থেকে ব্রডকাস্ট টিমের লোক গিয়ে সেটি দেখভাল করেন। অনেক সময় নানা কারণে ক্যাবল কাটা পড়ে। ফলে লাইভ বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত হয়ে যায়। ঢাকার বাইরেও টেলিভিশনের অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে এভাবে ক্যাবল লাইন টেনে রাখা যায়।

তবে ইদানীং স্থানীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি লাইভ হচ্ছে স্মার্টফোনের সঙ্গে একটি বিশেষ ডিভাইস সংযুক্ত করে। এটিতে খরচ কম এবং বহনও সহজ। তবে ডিএসএনজি, ব্যাকপ্যাক বা ক্যাবলের মতো ছবির মান ভালো নয়। তবে কাজ চালানো যায় এবং কোনো কোনো টেলিভিশনের ঢাকা অফিসের রিপোর্টারও এখন খরচ কমানো এবং ঝামেলা এড়াতে এই প্রযুক্তিতে লাইভ দিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন।

নিয়োগ

স্থানীয় পর্যায়ে টিভি সাংবাদিকের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ নিয়োগপত্র পাওয়া। এটি শুধু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে নয়; সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বছরের পর বছর বিনা পয়সায় কাজ করেন অনেক সাংবাদিক। অথচ নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদপত্র বাদ দিলে বাকিদের আচরণ এক্ষেত্রে একেবারেই পেশাদারি নয়।

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এটি আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ। কেননা পত্রিকায় কপি-পেস্ট করে সংবাদ মেইলে পাঠানো যত সহজ, টিভি সংবাদের ক্ষেত্রে তা এত সহজ নয়। কারণ টিভির খবরের সঙ্গে ছবি দিতে হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবি সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং পাঠানো প্রথমত সময়সাপেক্ষ, পাশাপাশি ব্যয়বহুল।

অনেকেরই এরকম অভিজ্ঞতা আছে যে, মাসের পর মাস কোনো টিভিতে পরীক্ষামূলকভাবে খবর পাঠিয়েছেন অথচ শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এই সময়ে তিনি খবর পাঠাতে গিয়ে যে পয়সা খরচ করেছেন, তা-ও পাননি। এমনকি ছবি ও খবর পাঠাতে গিয়ে যে টাকা খরচ হয়েছে, তা-ও পাননি। কারও কারও এরকম অভিজ্ঞতাও আছে যে, মাসের পর মাস খবর পাঠিয়েছেন অথচ হেড অফিসে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়েছে তাকেসহ আরও কয়েকজনকে। দেখা গেল, যিনি দীর্ঘদিন খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর বদলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আরেকজনকে।

টেলিভিশনের স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময়ই পেশাদারিত্ব বা সাংবাদিকের ডেডিকেশনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, এমনটা নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখানে বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

বেতন ও সততা

স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিককে সব টেলিভিশন ভালো বেতন ও আর্থিক সুবিধা দেয় না। কারও কারও বেতন কাঠামো বেশ ভালো। কেউ কেউ নিয়মিত পেতন পান না। কেউ আবার টাকা পান তাঁর কতগুলো স্টোরি/প্যাকেজ প্রচার হলো তার ওপর ভিত্তি করে। অনেক সময় সাংবাদিককে খবর সংগ্রহের জন্য অনেক দূরে যেতে হয়। কারও কারও মোটরসাইকেল থাকলেও বাকিদের যেতে হয় গণপরিবহনে। কিন্তু সবাই যাতায়াত বিল পান না। আবার বিল অফিসে জমা দিলেও হিসাব বিভাগ থেকে নানারকম প্রশ্নের মুখে পড়েন। এর উল্টো চিত্রও আছে। স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকের কারও কারও বিরুদ্ধেই আর্থিক অসততার অভিযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ করে কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে আয়োজকদের কাছে অনেকে সরাসরি টাকা চান। এরকম অভিযোগ অনেক সময় হেড অফিসেও আসে। তাতে অনেকের চাকরিও চলে যায়। এর মানে, এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন কোনো কোনো সাংবাদিকই। এ সংখ্যাটি হয়তো কম। ফলে দু-একজন আর্থিক অসততার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে কালিমা লাগে পুরো পেশায়। সাধারণ মানুষ তখন পুরো পেশার মানুষকে খারাপ চোখে দেখতে শুরু করেন। কেননা সাংবাদিকের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তাঁরা বিশ্বাস করতে চান, সাংবাদিক সঠিক কথাটি লিখবেন ও বলবেন। কিন্তু মানুষ যখন সাংবাদিকের কাছ থেকে এই সততা আর বস্তুনিষ্ঠতা পান না, তখন তাঁরা হতাশ হন।

একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা

স্থানীয় পর্যায়ে অনেকেই একসঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। আবার অধিকাংশেরই সাংবাদিকতা হচ্ছে দ্বিতীয় পেশা। কারও কারও নেশা। ফলে দেখা যায়, কেউ শিক্ষকতা, ব্যবসা, আইন পেশা বা অন্য কোনো কাজে জড়িত থাকেন মূল কাজ হিসেবে। পাশাপাশি সাংবাদিকতা করেন। তবে শুধু ঢাকার বাইরে নয়, ঢাকায় যারা গণমাধ্যমের হেড অফিসে কাজ করেন, তাঁদের সম্পর্কেও অনেকের ধারণা যে, এটি তাঁদের দ্বিতীয় কাজ বা সাইড প্রফেশন। 'সাংবাদিকতার পাশাপাশি আর কী করেন?' এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় অনেক সাংবাদিককেই। এর মানে, সাংবাদিকতা যে একটি আলাদা পূর্ণাঙ্গ পেশা, সেটি এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঢাকার বাইরে তো নয়ই। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিভাগীয় শহরগুলো। কেননা এসব শহরে সব বড়ো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অফিস থাকে। সেখানে পূর্ণকালীন সাংবাদিক কাজ করেন। এর বাইরে অন্যান্য জেলা পর্যায়ে যারা কাজ করেন, সাংবাদিকতা তাঁদের দ্বিতীয় পেশা হিসেবেই স্বীকৃত।

টেলিভিশনের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে অন্য কোনো কাজ করা কঠিন। কারণ টেলিভিশনে কাজের চাপ বেশি। বিশেষ করে ছবির কারণে। আবার একজন স্থানীয় সাংবাদিক একসঙ্গে একটি বা দুটি বাংলা পত্রিকার পাশাপাশি একটি ইংরেজি পত্রিকায় বা কোনো অনলাইন পত্রিকায় কাজ করতে পারলেও একসঙ্গে দুটি টেলিভিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ নেই। অনেকে একটি পত্রিকার পাশাপাশি একটি টিভিতে কাজ করেন। এক্ষেত্রে একটা বড়ো সংকট হয় লেখার স্টাইলে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, টিভি ও পত্রিকার খবরের স্টাইল একেবারেই আলাদা।

খবরের মান

স্থানীয় পর্যায়ে যারা সাংবাদিকতা করেন, তাঁদের মধ্যে কারও কারও লেখার মান বেশ ভালো। তাদের লেখা বড়ো কোনো সম্পাদনা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া যায়। আবার কেউ কেউ যা লিখে পাঠান, তা রিরাইট বা পুনরায় লিখতে হয়। এজন্য তাঁরা নিজে যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায় প্রতিষ্ঠানের। যেহেতু টেলিভিশন সংবাদের ফরম্যাট ও স্টাইল আলাদা, সুতরাং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের একজন সাংবাদিক ভালো টিভি রিপোর্ট লিখতে পারবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আবার সব টিভির নীতি ও স্টাইল এক নয়। দেখা যায়, স্থানীয় প্রতিনিধিদের সবাই এসব নীতি ও স্টাইল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এ বিষয়ে তাঁদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকে না। এমনকি বছরে একবার যে প্রতিনিধিদের সম্মেলন করা দরকার, অধিকাংশ টিভি স্টেশন তা-ও করে না। ফলে সাংবাদিক যে যার মতো খবর পাঠান এবং তা প্রচারও হয়। মানের উন্নতি হয় না। এ কারণে টেলিভিশনে দৈনিক ঘটনা এবং সাধারণ ইস্যুর বাইরে স্থানীয় পর্যায় থেকে বিশেষ প্রতিবেদন চোখে পড়ে কম। আবার টেলিভিশনে যে ধরনের বিশেষ প্রতিবেদন হওয়া উচিত, তার সঠিক গাইডলাইনও অনেক সময় প্রতিনিধির কাছে থাকে না।

এরকম আরও অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয় স্থানীয় টিভি সাংবাদিককে। আর এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকেই মূল ভূমিকা নিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে সাংবাদিকের নিজেদেরও আগ্রহ থাকা দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব। আমাদের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এত বছরেও কেন পেশাদার হয়ে উঠল না বা উঠতে পারল না, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা জরুরি।

লেখক: বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রযুক্তি ও সাংবাদিকতা বিকাশের সঙ্গে বেড়েছে চ্যালেঞ্জ

মামুন অর রশিদ

কয়েক বছর আগের ঘটনা, সবার নিশ্চয় মনে আছে– ঈদের সময় পদ্মায় পিনাক-৬ নামের একটি লঞ্চ ডুবে যাওয়ার দৃশ্য এবং সাভারের ৯ তলা রানা প্লাজা ভবন ধসে পড়ার দৃশ্যের কথা। আর এ দুটি ঘটনারই মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করা হয়েছিল, যা সেসময় দেশের প্রায় সব জাতীয় টেলিভিশন ও শীর্ষ অনলাইন পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করে। এটি সম্ভব হয়েছিল মুঠোফোন প্রযুক্তির কারণে। বর্তমানে প্রতিদিনই এরকম ঘটে যাওয়া নানা দৃশ্য সহজে ধারণ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে প্রযুক্তির নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কারণে।

সাংবাদিকতার আদি পর্ব থেকে বর্তমান সময়ের আধুনিক সাংবাদিকতার রূপান্তর একদিনেই তৈরি হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ পর্যায়ে এসেছে। আধুনিক প্রযুক্তি সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ধরনকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। কাগজের সাংবাদিকতা থেকে অনলাইন সাংবাদিকতা পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই তৈরি হয়েছে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তির কারণে নানা প্লাটফর্মে সংবাদ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। আগে যেখানে সংবাদের জন্য পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত, সেখানে এখন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মুখে মুখে পৌঁছে যাচ্ছে।

বিশ্বের বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যম যেমন– সিএনএন, বিবিসি, আলজাজিরার মতো মূলধারার গণমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করছে। সংবাদ-সূত্র হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকদের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনের শেষাংশে ঘটনাস্থলের আশপাশের পাঠককে তাঁদের মতামত বা মন্তব্য তুলে ধরতে অনুরোধ করছে। ... ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, মূলধারার গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত অনেক সংবাদই প্রথমে ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

সাংবাদিকতা জগতের প্রথম মাধ্যম হলো সংবাদপত্র, তারপর আসে রেডিও। এদের হটিয়ে জায়গা করে নেয় টেলিভিশন সাংবাদিকতা। তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমশ অগ্রগতির পথ ধরে আজ সাংবাদিকতা ডিজিটাল রূপ ধারণ করেছে। সংবাদপত্রের যুগে মানুষ আরও কিছু চাইছিল, সেই চাহিদাটা পূরণ করেছে রেডিও ও টেলিভিশন। যান্ত্রিক এ যুগে যন্ত্রমানবের হাতে তেমন সময় নেই পরদিন পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশের জন্য কিংবা

ঘণ্টাখানেক পর টেলিভিশনের বুলেটিনের জন্য অপেক্ষা করা। তার চাই– যখনই ঘটনা, তখনই জানা। তাই ডিজিটাল সাংবাদিকতার বিভিন্ন রূপ সেই চাহিদা মেটাচ্ছে। ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ, ল্যাপটপ থেকে ট্যাব আর স্মার্টফোন। বর্তমানে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, হাতে থাকা ডিভাইসের মাধ্যমে সারা দুনিয়া করায়ত্ত, তখন সংবাদ কী করে নাগালের বাইরে থাকে।

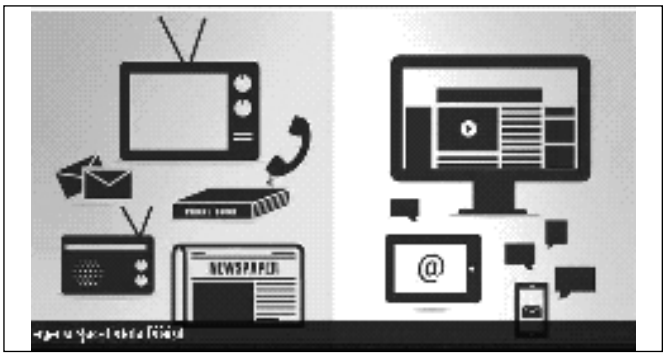

চিত্র: নতুন ও পুরোনো ধারার মিডিয়া

ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা টেলিভিশনে একটি সংবাদ একবার প্রচার হয়ে গেলে তা দ্বিতীয়বার দেখতে পরবর্তী সংবাদ সম্প্রচারের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কাগজের পত্রিকা প্রকাশ হয় ২৪ ঘণ্টা পরপর। অনলাইন পত্রিকা চলমান ঘটনার সংবাদ প্রকাশের একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। এতে আর্কাইভ থাকে, যে কোনো পাঠক ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় তার পছন্দের সংবাদটি পড়তে পারেন। প্রয়োজন হলে প্রিন্ট করতে পারেন, খবরের লিঙ্ক অন্যকে পাঠাতে পারেন ইচ্ছেমতো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন অনেক ক্ষেত্রে খবরের উৎস হিসেবে কাজ করছে। সেখানে এখন অনেকেই নিউজ শেয়ার করছেন। শিরোনাম পছন্দ হলে অনেকেই লিঙ্কে ক্লিক করে বিস্তারিত পড়ে নিচ্ছেন। এছাড়া যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে, মোবাইল ফোনেই অনলাইন পত্রিকা পড়তে পারছেন। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে এখন অনলাইন মিডিয়ার প্রতি ঝুঁকছেন পাঠক। অনলাইন সাংবাদিকতা আসলে পাঠককে সময়ের সঙ্গে চলতে সাহায্য করে। যে কোনো সময় যে কোনো খবর অনলাইন পত্রিকা সবার আগে প্রকাশ করতে পারে। সে কারণে অনলাইন সাংবাদিকতা হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক। এ সাংবাদিকতা চতুর্মাত্রিক। অনলাইন পত্রিকায় সাধারণত চারটি মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ করা হয়– লেখা, ছবি, অডিও ও ভিডিও। অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে এ সুযোগ নেই বললেই চলে।

অনলাইন সাংবাদিকতা, যাকে আমরা ডিজিটাল সাংবাদিকতাও বলি, সেটি হচ্ছে হালের সাংবাদিকতার একটি ধরন, যার বিষয়বস্তু কাগজ বা সম্প্রচারমাধ্যমের বদলে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হয়। ডিজিটাল সাংবাদিকতার সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক আছে। খবর বা ফিচার যখন পাঠ্যবিষয়, অডিও, ভিডিও ও ইন্টারঅ্যাকটিভিটির সহায়তায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে আমরা অনলাইন বা ডিজিটাল সাংবাদিকতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে, অনলাইন পত্রিকা হলো একটি সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ, যা এককভাবে শুধু অনলাইনে প্রকাশিত অথবা কোনো মুদ্রিত সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ হিসেবেও প্রকাশিত হতে পারে।

তথ্য মোতাবেক জানা যায়, ১৯৭৪ সালে ব্রুস পারেলউ ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনলাইন সংবাদপত্র চালু করেন। ১৯৮৭ সালে শুরু হওয়া সরকারি মালিকানাধীন ব্রাজিলীয় সংবাদপত্র 'জর্নালদোদিঅ্যা' নব্বই দশকের দিকে অনলাইন সংস্করণের সূচনা করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক সংবাদপত্র অনলাইনে প্রকাশনা শুরু করে ১৯৯০ সালের শেষদিকে। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে অনলাইন সাংবাদিকতার শুরু ২০০৫ সালের দিকে। ২০০৬ সালে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম বাংলাদেশে প্রথম পুরোপুরি অনলাইনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনলাইন ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা না থাকায় ২০১০ সাল পর্যন্ত এ মাধ্যমের পাঠক ছিল হাতেগোনা। এরপর মানুষের হাতের নাগালে সহজে ইন্টারনেট চলে আসে। বাড়তে থাকে অনলাইন পত্রিকার পাঠক। বর্তমানে দেশে অনলাইন মিডিয়ার সংখ্যা হাজারেরও অধিক। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের নিউজ পোর্টাল বা অনলাইন সংবাদপত্র দেখতে পাই– ১. ডেইলি ইভেন্ট নিউজ পোর্টাল, ২. বিশেষ সংবাদভিত্তিক নিউজ পোর্টাল, ৩. বিশেষায়িত নিউজ পোর্টাল, ৪. মিশ্র নিউজ পোর্টাল।

সাংবাদিকতার কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা পরিচয় ব্যতিরেকে অনলাইনভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যখন কেউ তার চারপাশের ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত কিংবা সঠিক তথ্য-উপাত্ত লেখনী, তথ্যচিত্র, ইনফোগ্রাফিক্স, খুদেবার্তা, অডিও, ভিডিও বা অন্য কোনোভাবে জনস্বার্থে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ করে, তখন তাকে জনসাংবাদিকতা বলা হয়। সিটিজেন জার্নালিজমের মাধ্যমে একজন সচেতন নাগরিক তাঁর নিজের জ্ঞান ও সৃজনশীলতা সমাজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে পারেন।

বিজ্ঞাপননির্ভর বাণিজ্যিক মডেলে পরিচালিত মূলধারার গণমাধ্যমের একাংশের আধেয় তৈরি ও প্রচারের নানা মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবমুক্ত নাগরিক সাংবাদিকতা আজ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষেত্রবিশেষ মালিকপক্ষের স্বার্থ, বহুজাতিক কোম্পানিসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমূল্য ও এজেন্ডা সেটিংয়ের মতো প্রচলিত ধারার গেটকিপারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালনের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে গণমানুষের স্বার্থে কাজ করার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গণমানুষের খবর ও তথ্য সংগ্রহ, পরিবেশন, বিশ্লেষণ এবং প্রচারে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে সিটিজেন জার্নালিজম বা নাগরিক সাংবাদিকতা। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এবং ডটকম ধারণার আবির্ভাব মূলধারার গণমাধ্যমের আধেয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। জ্য রোসেনসের মতে, প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমে যারা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা, তারাই হচ্ছেন নাগরিক সাংবাদিকতার নীতিনির্ধারক তথা সাংবাদিক, মালিক ও সম্পাদক। একসময় যারা শুধু গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত তথ্য তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার এই সময়ে তারাই সংবাদ তৈরি ও প্রচার করছে। নাগরিক সাংবাদিকতার একটি গুরত্বপূর্ণ দিক হলো– এটিকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কোনো সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর সবারই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে তার চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তুলে ধরতে পারেন, প্রতিবাদ জানাতে পারেন কিংবা একাত্মতা ঘোষণা করতে পারেন।

বিশ্বের বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যম যেমন– সিএনএন, বিবিসি, আলজাজিরার মতো মূলধারার গণমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করছে। সংবাদ-সূত্র হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকদের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনের শেষাংশে ঘটনাস্থলের আশপাশের পাঠককে তাঁদের মতামত বা মন্তব্য তুলে ধরতে অনুরোধ করছে। আর সাম্প্রতিক এই ধারা থেকে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, মূলধারার গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত অনেক সংবাদই প্রথমে ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট পিসির মতো ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তি ব্যবহার করে যখন কেউ যে কোনো স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রচারের কাজ করেন, তাকেই 'মোবাইল সাংবাদিকতা' বা সংক্ষেপে মোজো বলা হয়। মোবাইল সাংবাদিকতা বর্তমানে দ্রুত ও জনপ্রিয় একটি সংবাদমাধ্যম, যার সহায়তায় প্রতিবেদক বিভিন্ন ধরনের বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে এবং ইন্টারনেটের সহায়তায় সংবাদ তৈরি, সম্পাদনা ও নিজের কমিউনিটিতে দ্রুত ভাগাভাগি করতে পারে। একজন প্রতিবেদকের মতোই বিভিন্ন সময়ে মোবাইল সাংবাদিক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকও হতে পারেন, যিনি ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ক্যামকর্ডার, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্মার্টফোন অথবা ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার করেন নিজের কাজের জন্য। এক্ষেত্রে একটি দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ কিংবা মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজের সংবাদ ও ছবি প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে থাকেন মোবাইল সাংবাদিক। ২০০৫ সাল থেকে মোজো বা মোবাইল জার্নালিজম ব্যবহৃত হচ্ছে। যার শুরুটা হয়েছিল পোর্ট মেয়ারস নিউজপ্রেস থেকে। পরে এ পরিভাষাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের গাননেট নিউজপেপারের মাধ্যমে।

সাংবাদিকতায় প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সময়ে সংবাদের জগতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো ভুয়া সংবাদ বা গুজব রটানো। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে একদল কুচক্রী মহল

ভুয়া খবর রটায়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমগুলোয় এই অপতৎপরতা বেশি লক্ষণীয় হচ্ছে। সামাজিকমাধ্যমে ফিল্টারিং বা গেটকিপিংয়ের কোনো সুযোগ না থাকায় সহজে এটি ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক সময় সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সংবাদের সূত্র ধরে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো সংবাদ প্রচার করে কোনো ধরনের যাচাই ছাড়াই। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় ভুয়া খবর প্রকাশিত হওয়ার প্রকোপ দেখা যায়। আর ভুয়া খবর ঠেকাতে ফেসবুক, টুইটারসহ নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্প বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নাসির হোসেন ছোট বোনের সঙ্গে তোলা একটি সেলফি তার অফিসিয়াল পেজে পোস্ট করেন। একপর্যায়ে কিছু মানুষের নোংরা মন্তব্যের কারণে নাসির হোসেন সেই পোস্ট মুছে দিতে বাধ্য হন। এক সময় নায়করাজ রাজ্জাক মারা গেছেন বলে ফেসবুকে প্রচারণা চালানো হয়। এ খবরে প্রবীণ এই শিল্পী তখন মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। ভালো বা খারাপ ঘটনা ঘটাতে মাধ্যমের নিজস্ব কোনো ভূমিকা থাকে না, বরং যে বা যারা যে উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করে, তার মাধ্যমেই খারাপ বা ভালো নির্ধারিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার এই যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ব্যবহার করে অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

চিত্র: আলোচিত কিছু ভুয়া সংবাদের ছবি

বিশ্বের অনেক সংবাদ সংস্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সংবাদ তৈরি করছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংবাদ তৈরি করছে, এর মধ্যে যেমন টিভি চ্যানেলগুলো রয়েছে, একইভাবে রয়েছে সংবাদ সংস্থা বুমবার্গ, রয়টার্সও। অনেকেই একে সৃজনশীল সাংবাদিকতার জন্য হুমকি বা বড়ো কোনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই সংবাদের সব কাজ হবে। বর্তমানে সাংবাদিকতা গতানুগতিক ধারার মধ্যে প্রশিক্ষিত হয়ে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে প্রত্যেকে সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে এবং সিটিজেন জার্নালিজমের কারণে তারা নিজেদের সাংবাদিক দাবিও করছে। তবে মূলধারা সেটিকে চ্যালেঞ্জ করছে এই জায়গা থেকে যে সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদ সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ হচ্ছে না। কেবল টেক্সট, অডিও বা ভিডিও ছাড়িয়ে সাংবাদিকতা এখন পৌঁছে গেছে মাল্টিমিডিয়ার দ্বারপ্রান্তে। সব ধরনের মাল্টিমিডিয়া এবং লাইভ সম্প্রচার নিয়ে যখন বার্তাকক্ষ কাজ করবে, তখন একজন সাংবাদিককেও এসব মাধ্যমে কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এটাই বাস্তবতা। বর্তমানে পাঠক-দর্শকের চাহিদার কারণেই সাংবাদিকতার ধরন বদলে যাচ্ছে। মানুষ এখন একই সঙ্গে পড়তে, দেখতে ও শুনতে চায়। ফলে গণমাধ্যমের বিকল্প কিছু ভাবার সুযোগ নেই। মাল্টিমিডিয়ার এই ব্যবহার আমাদের জন্য ভালো। তবে দক্ষতার সঙ্গে না করতে পারলে তা বুমেরাং হয়ে যাবে। এসব অনলাইন পত্রিকার সংবাদ পড়ে পাঠক বিভ্রান্ত হন। বিরক্ত হয়ে পুরো অনলাইন গণমাধ্যমের সমালোচনা করেন। ডোমেইনের দাম কম হওয়ায় আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে অনলাইন পোর্টাল। অনলাইন পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক হিসেবে নিজেকে জাহির করার একটা প্রবণতা এই সময়ে খুব বেশি করে চোখে পড়ছে।

সাংবাদিকতা নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি আত্মস্থ করানোর দায়িত্ব মিডিয়া হাউসগুলো যেমন নেবে, তেমনই এই ধারণাগুলোর জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সিলেবাসে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা পুরোনোরা নতুন যে কোনো কিছু গ্রহণে 'কালচারালি শকড' হয়। ফলে নতুনদের মধ্য দিয়ে এটি বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র

*. http://www.deshersomoy.com/2016/07/13/ গণমাধ্যমের নতুন মাধ্যম-ম/
*. https://bn.quora.com/ ডিজিটাল সাংবাদিকতা কী
*. https://www.prothomalo.com/opinion/article/1069037/ সাংবাদিকতায় পরিবর্তন ঘটছে
* https://ti-bangladesh.org/blog/beta/index.php/en/blog/146-2016-06-12-06-21-02.html
* https://www.prothomalo.com/opinion/article/486238/ মোবাইল সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের সম্ভাবনা

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

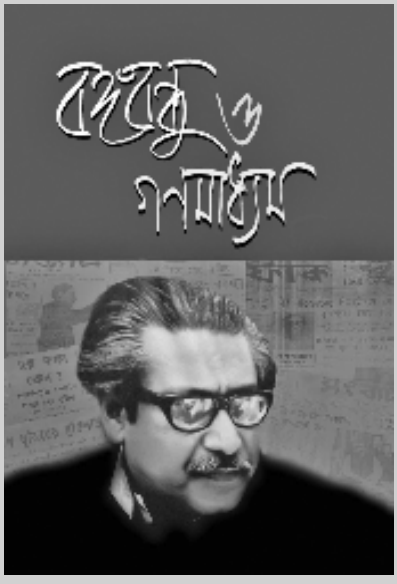

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিকতার ছায়াবৃক্ষ, আমাদের নক্ষত্রজন

ড. জ্যোৎস্নালিপি

মৃত্যু অমোঘ। তবুও কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের আবেগতাড়িত করে। বেদনাবিধুর করে। আশাহত করে। আমাদের ছলছল চোখে শূন্যতা ভিড় করে। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা বোধহয় এমনই! বরেণ্য সাংবাদিক ও শিশু-কিশোর সংগঠক মো. শাহ আলমগীর আমাদের তেমনই এক প্রিয়জন। প্রিয় নাম। আত্মার আত্মীয়। যাঁর কাছে 'অন্যায়' আর 'ভুল' শব্দ দুটি পেয়েছিল ভিন্ন অর্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন– 'ভুল' বা 'অন্যায়' মানুষের জন্মগত নয়। ভালোবেসে কাউকে সংশোধন করাটাই হলো আসল শিক্ষা। অমায়িক সুভাষী মানুষটি ব্যক্তিজীবনে যেমন সততার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই পেশাগত জীবনেও সৎ ও কর্মনিষ্ঠ একজন মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি যে কোনো কাজকে সহজ করে উপস্থাপন করতে পারতেন। যে কোনো সমস্যার সমাধান তিনি এমনভাবে করতে পারতেন, কোনো পক্ষই বিরূপ হতে পারত না। তিনি এই গুণ আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর সততা এবং ভালোবাসা দিয়ে। মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার গুণ ছিল তাঁর সহজাত। সদা হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটি ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় অকাল প্রয়াত হন।

বরেণ্য এই সাংবাদিক মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালের ৭ জুলাই পিআইবির মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানসহ বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টেরও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। বিশিষ্ট এ সাংবাদিক ২০১৫ সালের ১৮ মে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন।

১৯৭৪ সাল। এ বছর খুব বন্যা হলো। পরদিন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। তাতে কী! সারা দিন ত্রাণ বিতরণ করলেন শাহ আলমগীর। বরাবরই সংগঠন করা খুব পছন্দ করতেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই সাংস্কৃতিক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে থাকেন। কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভলোবাসতেন। স্কুলের অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করতেন নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি

তাঁর সাংবাদিকতা জীবন ছিল বর্ণাঢ্য। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি একাধিক সম্প্রচার ও মুদ্রণ গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮০ সালে 'কিশোর বাংলা' পত্রিকা দিয়েই তিনি তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন। এখানে তিনি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত

ছিলেন। এরপর তিনি দৈনিক জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম আলোয় যুগ্ম বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক, একুশে টেলিভিশনে হেড অব নিউজ, যমুনা টেলিভিশনে পরিচালক (বার্তা) এবং মাছরাঙা টেলিভিশনে বার্তাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিশুকল্যাণ পরিষদ এবং শিশু ও কিশোরদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'চাঁদের হাট'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালনা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন তিনি। সাংবাদিক নেতা হিসেবেও ছিলেন জনপ্রিয়। তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা, সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

শাহ আলমগীরের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার জাফরপুর গ্রামে। নানাবাড়িতে। তাঁর পৈতৃক বাড়িও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানায়। তাঁর মায়ের নাম যোবেদা খাতুন। বাবার নাম আবু ইউসুফ সরকার। বাবার চাকরির কারণে ময়মনসিংহে কাটে তাঁর কৈশোরকাল। পরে অবশ্য ১৯৭৭ সালের দিকে ঢাকার পূর্ব গোড়ানে দোচালা টিনের ঘর তৈরি করে পরিবারসহ বসবাস শুরু করেন তাঁর বাবা। বাড়ির নাম দেন 'সরকার বাড়ি'। মা-বাবার সঙ্গে এগারো ভাইবোন নিয়ে ছিল তাঁদের পরিবার। বাবা চাকরি করতেন পুলিশ বিভাগে। মা ঘর আর সন্তানদের সামলাতেন। বড়ো বোনটি মারা যান আড়াই বছর বয়সে। তারপর থেকে তিনি পরিবারের সবার দাদা হয়ে উঠেছিলেন। পরিবারের সবাইকে ছায়া দিয়ে রাখতেন তিনি।

শাহ আলমগীর ময়মনসিংহের গৌরীপুর আর কে হাইস্কুল থেকে ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর গৌরীপুর কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে। এখান থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর মস্কো ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ও থমসন ফাউন্ডেশন পরিচালিত সাংবাদিকতায় উচ্চতর কোর্স সম্পন্ন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সেও অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– করাচিতে সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া আয়োজিত ইলেকট্রনিক মিডিয়াবিষয়ক কর্মশালা, ফিল্ম আর্কাইভস আয়োজিত ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ও ভারতের গোয়ায় UNDP আয়োজিত 'South Asian media and its role in attaining the Millennium Development Goal' শীর্ষক সম্পাদকদের কর্মশালা।

কিশোর আলমগীর ময়মনসিংহের দুর্গাপুরের পাহাড়ি এলাকা ঘুরে বেড়াতেন। গাছের ছায়ার বসে পাখি দেখতেন আর তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। ঘুরতে ঘুরতে দুপুর রোদে ক্লান্ত হলে জমিদার বাড়ির চারদিকে শানবাধানো ঘাটের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতেন। কখনো কখনো ভাই আর বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে থাকত। দুর্গাপুর এলাকায় গারোদের বাস। গারোদের সঙ্গেও কিশোর আলমগীরের সখ্য গড়ে উঠে। সমবয়সি বন্ধু আর ভাইদের সঙ্গে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতেন। ক্যারম খেলা খুব পছন্দ ছিল তাঁর। আরেকটি মজার খেলা সমবয়সিদের সঙ্গে খেলতেন। সেই খেলার নাম হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায় 'জালান্তি'। 'জালান্তি' মানে বল ছুড়ে মেরে শরীরে লাগিয়ে ব্যথা দেওয়া। নিজের ভাইদের শুধু নয়,

বোনদেরও সাঁতার কাটা বা এ ধরনের খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন মায়ের কঠোর বিধিনিষেধ থাকার পরও। দাদার ভরসাতেই বোনেরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন।

বড়ো হয়েও শান্ত আর নিরীহ স্বভাবের কারণে মেজো ভাইকে ভয় পেতেন তিনি। কারণ তাঁর মেজো ভাই ছিলেন খুব দুরন্ত স্বভাবের। অনেক সময় মেজো ভাইয়ের ভয়ে দৌড়ে পালাতেন কিশোর আলমগীর। এক দৌড়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যেতেন। নিজে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করলেও অন্যদের থেকে বড়ো ভাই আলমগীরকে আগলে রাখতেন তিনি। ১৯৭১ সাল। দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। সে সময় কিশোর শাহ আলমগীর বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে নেমে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে বাঁশ দিয়ে রাইফেল বানিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতেন। শিশুবেলা থেকেই বইপড়ার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল তাঁর। যেখানে বইয়ের লাইব্রেরি আছে, সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন। সে সময় দেয়াল পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় ছিল। দেয়ালিকা প্রকাশ করতেন খুব আগ্রহভরে। আর দেয়ালিকায় দেয়ালজুড়ে থাকত শাহ আলমগীরের হাতের লেখা। এলাকার শিশুকিশোরদের একসঙ্গে জড়ো করে খেলাধুলা করতে উৎসাহ দিতেন। নিজেও দাঁড়িয়ে থেকে কিশোরদের খেলা তত্ত্বাবধান করতেন। আর সবাইকে উৎসাহ দিতেন সংগঠন করার ব্যাপারে।

১৯৭৪ সাল। এ বছর খুব বন্যা হলো। পরদিন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। তাতে কী! সারা দিন ত্রাণ বিতরণ করলেন শাহ আলমগীর। বরাবরই সংগঠন করা খুব পছন্দ করতেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই সাংস্কৃতিক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে থাকেন। কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভলোবাসতেন। স্কুলের অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করতেন নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। গৌরীপুর স্কুলের ছাত্র থাকাকালীনই লেখালেখি করতেন।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর ঢাকায় এলেন শাহ আলমগীর। রফিকুল হক দাদুভাইয়ের হাত ধরে 'চাঁদের হাটে' যুক্ত হলেন। শাহ আলমগীর শিশুকিশোর সংগঠন 'চাঁদের হাট'-এর সভাপতি ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। একদিন 'চাঁদের হাট'-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (প্রেস রিলিজ) বাংলাদেশ টেলিভিশনে দিয়ে আসতে হবে। যেতে কেউ আগ্রহী নন। দাদুভাই যখন শাহ আলমগীরকে বললেন সে কথা, বিনয়ের সঙ্গে তিনি তখন অনেক রাস্তা হেঁটে রামপুরা বিটিভি ভবনে গিয়ে সেটি পৌঁছে দিয়ে এলেন। এটাই ছিল তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। ভালোবাসা। আদর্শ। শৈশব থেকেই নেতৃত্ব দেওয়ার একটা ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল। কোনো মিছিল হলে শাহ আলমগীর সবার আগে স্লোগান দিতেন।

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০০৬, চন্দ্রাবতী স্বর্ণপদক-২০০৫, রোটারি ঢাকা সাউথ ভোকেশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০০৪ এবং কুমিল্লা যুব সমিতি অ্যাওয়ার্ড-২০০৪ পেয়েছেন। পেশা ও ব্যক্তিগত কাজে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে– রাশিয়া, আজারবাইজান, লাটভিয়া, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, কেনিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফ্রান্স ও জার্মানি।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ'কে (পিআইবি) একটি সক্রিয় ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। পিআইবি'র ইতিহাসে তিনি নক্ষত্র হয়ে আলো ছড়িয়েছেন। তাঁর কর্মকালীন পিআইবিতে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স কোর্স চালু, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রথম অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষা, গণমাধ্যমবিষয়ক সাময়িকী নিরীক্ষার মানোন্নয়ন, সারা দেশে সাংবাদিকদের অসংখ্য প্রশিক্ষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সাংবাদিকদের জন্য গ্রন্থ প্রকাশ, অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষা, শহীদ সাংবাদিক কর্নার, পিআইবি আইন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে একাধিক গবেষণা গ্রন্থ তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। তিনি সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে যেমন ভাবতেন, তেমনি সাংবাদিকদের বিপদে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তায় পাশে থাকতেন।

আত্মপ্রত্যয়ী এই মানুষটি যেমন বড়োমাপের সাংবাদিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন বড়ো মনের মানুষ। তাঁর জীবনদর্শন ছিল মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া। তাঁর এই আদর্শ আমাদের পাথেয় হয়ে থাকুক।

লেখক: গল্পকার, শিশুসাহিত্যিক ও সহকারী সম্পাদক, পিআইবি

সৃষ্টিকর্তা তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করলেন...

পলাশ আহসান

২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা দিন আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গেই ছিলাম। আগের গাড়িতে তিনি একা। আর আমরা তাঁর পেছনে অসংখ্য গুণগ্রাহী। তাঁর সঙ্গে এমন ভ্রমণ, আমার কাছে নতুন কিছু না। এবার শুধু পার্থক্য ছিল অন্যসময় থাকতাম তাঁর গাড়িতে। এবার আর পারিনি। তিনি ছিলেন ফ্রিজিংভ্যানে। এই অগস্ত্যযাত্রায় চাইলেও কেউ সঙ্গী হতে পারে না। প্রাণী মাত্রই এ যাত্রায় শামিল হতে হবে জানি। কিন্তু দেশের মানুষের গড় আয়ু যেখানে সত্তরের বেশি, সেখানে মাত্র বাষট্টিতে এই যাত্রা? উনি তো একা থাকা পছন্দ করতেন না। নিজে সারাক্ষণ হাসতেন এবং চারপাশে হাসিমুখ দেখতে চাইতেন। তাহলে কেন এই অবিচার? কার কাছে তাঁর এই অকাল মৃত্যুর বিচার চাইব?

টানা ১১ বছর পর পর চারটি নিউজরুমে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। সবসময় দেখতাম– 'নিউজরুম ছাড়তেন রাত ১১টার পর আর আসতেন ১১টার মধ্যে। কোনো কোনো দিন সকালেই চলে আসতেন। এর মধ্যেই ছিল ইউনিয়ন, প্রেস ক্লাব। এছাড়া প্রতিদিন আমার মতো অসংখ্য

'কাজে সময় দাও', এই তিনটি শব্দের মধ্যে আটকে ছিলেন আলমগীর ভাই। নিজে সারা দিন কাজের মধ্যে থাকতেন। চাইতেন সহকর্মীরাও যেন থাকে। ২০০২ থেকে ২০১২ সাল– টানা ১০ বছর তাঁর সঙ্গেই ছিলাম চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, যমুনা টেলিভিশন ও মাছরাঙায়। তাঁর সম্মতিতেই এসেছিলাম ৭১-এ

সাঙ্গোপাঙ্গর উৎপাত তো ছিলই। এছাড়াও কথা বলতেন সারা দেশ থেকে দেখা করতে আসা সাংবাদিকদের সঙ্গে। থাকতেন সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের সঙ্গেও।

২০০২ সালের শেষের দিকে কোনো এক সন্ধ্যায় চ্যানেল আইয়ের সে সময়ের বার্তা পরিচালক শাইখ সিরাজ আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি কোনো একটা নিউজের রানডাউন দিচ্ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও জেনে নিয়েছিলেন আমার আদ্যোপান্ত। তারপর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী করতে হবে। খুব সহজ করেই সেদিন বলেছিলেন আমার কাজটি কত কঠিন হবে। যখন বললাম,

আমি টিভিতে নতুন, তিনি বললেন– 'শুধু চাকরি করো না, শুরু থেকে কাজে সময় দাও, শিখে যাবে।'

এই যে তিনি বললেন, 'কাজে সময় দাও', এই তিনটি শব্দের মধ্যে আটকে ছিলেন আলমগীর ভাই। নিজে সারা দিন কাজের মধ্যে থাকতেন। চাইতেন সহকর্মীরাও যেন থাকে। ২০০২ থেকে ২০১২ সাল– টানা ১০ বছর তাঁর সঙ্গেই ছিলাম চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, যমুনা টেলিভিশন ও মাছরাঙায়। তাঁর সম্মতিতেই এসেছিলাম ৭১-এ। বছরখানেক পর যুক্ত হয়েছিলেন পিআইবিতে। পিআইবির সঙ্গে আমার আগে থেকে কাজের সম্পর্ক ছিল। আলমগীর ভাই যুক্ত হওয়ার পর সেটি আরও শক্ত হয়।

সত্যি বলতে কী, ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল– এই টানা ১৭ বছর শুধু কাজই করেছি আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গে। এই দীর্ঘ সময়ে যত বৈঠক, যত ভ্রমণ এমনকি ব্যক্তিগত কথাবার্তায়ও কাজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত কাজের কথায় কখনো একঘেয়েমি লাগেনি। কারণ তিনি জানতেন কাজ কীভাবে আনন্দময় করে তুলতে হয়। নিউজরুমে তো দেখেছিই, দেখলাম পিআইবিতেও। সামনে বসিয়ে কথা বলছেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফাইল দেখছেন। ছুটির দিনগুলোয় চলে যাচ্ছেন ঢাকার বাইরে ট্রেনিংয়ে। এক সফরে তিন-চারটা ট্রেনিংয়ে যোগ দিয়েছেন– এমন নজিরও আছে।

আলমগীর ভাই সম্পর্কে এই লেখা পড়তে গিয়ে অনেকের মনে হতে পারে, আমি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতির কথাই বেশি বলছি। আসলে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কাছাকাছি যারা ছিলেন, তাদের দেখা বর্ণনা ছাড়া উপায় নেই। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে অন্য অনেকের মতো তাঁর নিজের কোনো বই বা লেখা পাওয়া দুষ্কর। কতবার অনুরোধ করেছি, ভাই যেগুলো বলছেন, এগুলো লিখে ফেলেন। বলতেন, লিখলে তো হতো; কিন্তু সময় কই? আসলেই আলাদা করে সময় বের করার সময় আলমগীর ভাইয়ের ছিল না। বার্তাকক্ষ আর সাংবাদিকতার মাঠ শক্ত করার কাজ করেছেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে যেটা কারও চোখে পড়ে না।

আমি টেলিভিশনের সাংবাদিক হিসেবে পেয়েছি আলমগীর ভাইকে। সবসময়ই দেখেছি তিনি বার্তাকক্ষের প্রতিদিনের কাজের পাশাপাশি সাংবাদিকতার সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রাখতেন। এর মধ্যে ঢাকায় যিনি বা যারা কাজ করছেন, তাদের কথাও যেমন ভাবছেন, প্রত্যন্ত দূরের জেলা বা বিভাগে যিনি কাজ করছেন, তিনিও বাদ পড়ছেন না। খেয়াল করতেন ঢাকার বাইরের যারা কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে কেউ খারাপ আচরণ করছে কি না। কোনো কারণে করে ফেললে ডেকে বুঝিয়ে বলতেন, কেন এ রকম করা উচিত নয়।

পিআইবিতে যুক্ত হওয়ার পর দেখলাম সাংবাদিকদের ভালো কীসে হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। মনে হলো, এত দিন যেন এই সুযোগটির অপেক্ষায় ছিলেন। আমরা যারা তাঁর কাছে ছিলাম, তাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন। যার পক্ষে যতটুকু দেওয়া সম্ভব বের করে নিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেই কাজটি করছিলেন একজন ধ্যানী-তপস্বীর মতো। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় যারা ইতিবাচক বদল এনেছেন, বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকতায়, তাঁদের মধ্যে আলমগীর ভাই অন্যতম।

আলমগীর ভাইয়ের ভাইবোনরা বলছেন, লেখক হতে চেয়েছিলেন তিনি। যে কারণে বিসিএস ক্যাডারে যেতে চাননি। সিনেমা বানাতে চেয়েছিলেন। একটি সিনেমার সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর আর এগোননি। ভেবেছিলেন সাংবাদিকতায় থাকলে লেখালেখিতে সময় দেয়া যাবে। সেই ভাবনাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ সারা পৃথিবীর গুণী লেখকদের অনেকেই সাংবাদিক। কিন্তু তাদের কাউকে সাংবাদিকতা গোছানোর কাজটি মাথায় নিতে হয়নি।

আলমগীর ভাই পিআইবিতে আসার পর যখনই দেখা করতে আসতাম জিজ্ঞাসা করতেন, এখন কী লিখছ? গল্প করতে করতে নানা আইডিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁকে কিছু লিখতে বললেই বলতেন, লেখব, একটু ব্যস্ততা কমুক। আপাতত তোমরা চালিয়ে যাও। তাঁর ব্যস্ততা কমানো আর হলো না। আমার যত লেখালেখি, এতে তাঁর উৎসাহ ছিল সবার আগে। একুশে গ্রন্থমেলায় গিয়ে ফোন করতেন, তোমার প্রকাশক যেন কারা? বইটা কিনতেন, পড়তেন, তারপর এটা নিয়ে কথা বলতেন।

পিআইবিতে গেলে নানা ধরনের বই পেতাম তাঁর কাছে। খানিকটি মজা করে বলতেন, তোমরা লোকজনকে জ্ঞান দেবে আর পড়বে না, তা কী করে হয়। আমার লেখাপড়া সাংবাদিকতায় নয়, তিনি তা জানতেন। তাই আমাকে বারবার বলতেন, একাডেমিক পড়াশোনাটা দরকার। পিআইবিতে ডিপ্লোমা করতে বলতেন। সময়ের অভাবে পারছিলাম না। পিআইবি অনলাইন কোর্স চালু করার পর আমি যখন ছাত্র হিসেবে যুক্ত হলাম, কী যে খুশি হয়েছিলেন– বর্ণনা করা যাবে না। বিভিন্ন কোর্সে গিয়ে বার্তা সম্পাদক হওয়ার পরও লেখাপড়া করতে হয়, সেই উদাহরণ হিসেবে তিনি আমার কথা বলতেন। আসলে সাংবাদিকতার উন্নয়ন ছাড়া এই ভদ্রলোকের মাথায় কিছুই ছিল না।

আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গে সবশেষ কথা হয়েছিল তাঁর সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগে। পরে ফোনে দু-তিনবার কথা হয়েছে। সে নেহায়েত নিয়মিত সৌহার্দ বিনিময়। কিন্তু মনে রাখার মতো কথাটি হয়েছিল মুখোমুখি কথা বলার সময়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম শরীর এখন কেমন? বললেন, দেখ শরীরের একটা রোগ হয়েছে। আমি শুরু থেকেই চিকিৎসা করাচ্ছি। একে সর্বোচ্চ চিকিৎসা বলতে পার। সারলে সারবে, না সারলে আর কী... বলে সেই মন ভোলানো পরিচিত হাসিটা দিলেন। সেই হাসিমুখটাই এখনো ঘুরছে মাথার মধ্যে।

বছরদেড়েক আগে থেকে তিনি রক্ত রোগের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। আমি জানতাম। সবই বলতেন, কিন্তু আচরণে কখনো মনে হতো না তাঁর বড়ো কিছু হয়েছে। অফিস থেকে হাসপাতালে যাচ্ছেন। আবার অফিসে আসছেন। যেন পাত্তাই দিচ্ছেন না শরীর খারাপটাকে। সেদিন খানিকটা পাত্তা দিলেন। তাঁর বলার ধরনের কারণ আমি বুঝলাম না। তাছাড়া তাঁর যে আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার মতো কোনো রোগ হতে পারে, সেটা আঁচ করার কথাও নয়। কারণ তিনি ছিলেন খুবই নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মানুষ। চারপাশে এত গুণগ্রাহী, এত ভক্ত– কেউ বুঝল না ভেতরে ভেতরে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আরেকদিন কাজের ফাঁকে বলছিলেন, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য কী জানো, কোনো মানুষ যদি কাজ করতে করতে মারা যায়। সেদিনও বুঝিনি তাঁরও ইচ্ছা ছিল এভাবে কাজ করতে করতে চলে যাওয়া। সৃষ্টিকর্তা শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করলেন। কিন্তু আমার মতো অনেককেই করলেন অভিভাবকহীন।

লেখক: বার্তা সম্পাদক, একাত্তর টেলিভিশন

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নিভৃতচারী সাংবাদিক নিয়ামত হোসেন

রাশেদ রাব্বী

সময়টা বিংশ শতকের ষাটের দশক। বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক পরিমণ্ডলের চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনও তা থেকে মুক্ত থাকেনি। পাকিস্তানি স্বৈরশাসন ও শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট ও পদদলিত হচ্ছিল বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার যে জোয়ার ৫২'তে বয়ে গিয়েছিল বাংলার পলিদ্বীপের বুকে, তাতে ক্রমশ ভাটা পড়ছিল। বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও চর্চা ছিল না বললেই চলে। শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, বিশেষ করে, জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে সংস্কৃতিচর্চা, তার তেমন কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বরং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে থেকে কিছু কবি-সাহিত্যিক সরকারি নির্দেশাশ্রয়ী পাকিস্তানি সংস্কৃতি নামে এক ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।' যাঁরা এর বাইরে ছিলেন, তাঁরা কোনো সংঘবদ্ধতা গড়ে তুলতে পারেননি।

১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সৃজনী প্রকাশ করে একুশের সংকলন 'পলাশ ফোটার দিন'। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ও সামরিক শাসন জারির পর নিষিদ্ধ ঘোষিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামের সংকলনটির পর ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে সৃজনীর উদ্যোগে প্রকাশিত 'পলাশ ফোটার দিন'ই এদেশের দ্বিতীয় একুশে সংকলন। এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কজন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিয়ামত হোসেন অন্যতম

ফলে অনেকের একক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে অনিবার্যভাবেই। তবে গণমানুষের জন্য সংস্কৃতিচর্চায় অঙ্গীকারবদ্ধ কিছু তরুণ এই পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে চলছিলেন। এই সংগঠিত প্রয়াসের সবচেয়ে বড়ো স্রোতধারাটি ছিল 'সৃজনী'। সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী জ্বালিয়ে ছিল আলোর মশাল। বেশ কয়েকজন তরুণের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই গোষ্ঠী। তাঁদের ধমনিতে প্রবাহিত রুধির ধারার সম্মিলিত নির্যাস নিয়ে চির সবুজ 'সৃজনী'-বৃক্ষ ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনাবিধৌত পলিদ্বীপে ক্রমশ মহিরুহ হয়ে উঠেছিল। এই তরুণেরা ছিলেন আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, চেতনায় অসাম্প্রদায়িক এবং শিল্পাদর্শে

রবীন্দ্রানুরাগী। ষাট ও সত্তরের দশকজুড়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানি ভাবধারার শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিকারীদের বিপরীতে এঁদের হাতেই চর্চিত ও লালিত হতে থাকে বাঙালি সর্বজনীন শিল্প ও সাহিত্যের মূলধারা। এঁরা কখনোই আপস করেননি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, লোকায়ত মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে। এই তরুণদের নাম: অজয় গুপ্ত, ইমরুল চৌধুরী, নিয়ামত হোসেন, আবু নাহিদ, মোহম্মদ মোস্তফা, হাবিবুর রহমান মল্লিক, কামরুল আহসান, মনজুর আহমদ, মাসুদ আহমেদ, ইউসুফ পাশা, হেদায়েত হোসাইন মোর্শেদ ও গোলাম মোহম্মদ মাস্তানা। ১৯৬০। সেপ্টেম্বর মাস। এই তরুণ দল এক বিকেলে রমনার রেসকোর্সের (অধুনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সবুজ ঘাসে বসে 'এসো, কিছু একটা করি' মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। বাংলার উর্বর মাটিতে বপন করলেন 'সৃজনী' নামক পরিপুষ্ট ও সতেজ বীজ। তখন সৃজনীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন কবি, শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রয়াত নিয়ামত হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক সুসাহিত্যিক ইমরুল চৌধুরী। এর সঙ্গে পরবর্তী নানা পর্যায়ে যুক্ত হন মাহবুব তালুকদার, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, জিয়া আনসারী, শুভ রহমান, শহীদুর রহমান, ওআজেদ মাহমুদ, সোলায়মান, আবেদ খান, রশীদ সিনহা, সফিকুন নবী, আহমেদ মনসুর, তাজুল ইসলাম, ফেরদৌস আরা মিনু, আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া, ইয়াহিয়া বখত, হারুন উর রশীদ, এনায়েত হোসেন পান্না প্রমুখ। প্রতিষ্ঠালগ্নেই প্রয়াত নিয়ামত হোসেন ছিলেন সৃজনীর সংগঠক ও লেখক। নিয়ামত হোসেন তখন সৃজনীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, প্রধানত কবিতা ও ছড়ায় তখনই প্রায়-পরিণত হাত তার তরুণদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। সৃজনীর ওই প্রাথমিক পর্যায়টিতেই অর্থাৎ ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'সৃজনী'র প্রথম কবিতা সংকলন। সংকলনটির নাম 'শান্তির সপক্ষে আমাদের কবিরা'। সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন অজয় গুপ্ত ও নিয়ামত হোসেন। প্রচ্ছদও এঁকেছেন নিয়ামত হোসেন। প্রকাশক ছিলেন ইমরুল চৌধুরী। এ সময় থেকেই সৃজনীর কর্মতৎপরতা বিভিন্নমুখিতা অর্জন করতে থাকে; সৃজনীর সদস্যরা একদিকে যেমন বন্যা উপদ্রুত মানুষের জন্য ঢাকার পথে পথে নিজেদের ব্যানার নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে সাহায্য সংগ্রহ করেছেন, তেমনি নিয়মিত শনিবারের সাহিত্য বৈঠকে মিলিত হয়ে নিজেদের রচনা পাঠ ও আলোচনা, কখনো কখনো বিশ্বসাহিত্যের ধ্রুপদি ও সমকালীন ধারার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য নির্বাচিত রচনা থেকে পাঠ করে ক্রমশ একটি সুনির্দিষ্ট জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য আদর্শ গঠন করে চলছিলেন। সেসময় বন্যার ওপর গান লিখেছিলেন নিয়ামত হোসেন, সুর দিয়েছিলেন সৈয়দ শামসুল হুদা। সৃজনী সাহিত্যিক ও শিল্পীগোষ্ঠীর সাহিত্য বৈঠক কখনো গেণ্ডারিয়ার ১৬ রজনী চৌধুরী রোডে আবু নাহিদের বাড়িতে, কখনো ৭ দীননাথ সেন রোডে অজয় গুপ্তের বাড়ির ছাদে, কখনো ইমরুল চৌধুরীর ২৫ দীননাথ সেন রোডের বৈঠকখানা ঘরে, আবার কখনো বা নর্থব্রুক হল রোডে নিয়ামত হোসেনের বাসায় অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সৃজনী প্রকাশ করে একুশের সংকলন 'পলাশ ফোটার দিন'। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ও সামরিক শাসন জারির পর নিষিদ্ধ ঘোষিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামের সংকলনটির পর ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে সৃজনীর উদ্যোগে প্রকাশিত 'পলাশ ফোটার দিন'ই এদেশের দ্বিতীয় একুশে সংকলন। এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কজন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিয়ামত হোসেন অন্যতম। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। পাকিস্তানের এই সাম্প্রদায়িক ও বজ্জাতি নীতির প্রতিবাদ করে সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ভেদবুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধান্তকে তাঁরা গোটা বাঙালি সংস্কৃতির ওপরেই হামলা হিসেবে বিবেচনা করে। এমন ছিল নিয়ামত হোসেনদের সৃজনী গোষ্ঠীর রবীন্দ্রানুরাগ ও সাহিত্যাদর্শ। নিভৃতচারী এই কবি ও সাংবাদিক নিয়ামত হোসেন আজ আমাদের মাঝে নেই। কর্মজীবনের শেষ ২৪ বছর কাটিয়েছেন দৈনিক জনকণ্ঠে। পেশাগত জীবনের ব্যস্ততম সময় শুরু হয়েছে তারও আগে। ১৯৪১ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান সাংবাদিকের কর্মজীবনের সূচনা হয় মার্কিন সংস্থা ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাসে নিজেকে সম্পৃক্ত করা তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। কারণ পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা জীবনের সহকর্মীদের কাছে সেই সময়ের স্মৃতিচারণ তাঁকে অতীতের এক সুবর্ণ অধ্যায়ে নিয়ে যেত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নাকি স্মরণশক্তির দৌর্বল্য সব মানুষকেই স্মৃতিবিভ্রাটের পর্যায়ে নিয়ে যায়। নিয়ামত হোসেনের বেলায় তা ছিল একেবারেই ব্যতিক্রম। ফেলে আসা কর্মজীবনকে স্মরণ চেতনায় অম্লান করাই শুধু নয়, তার চেয়েও বেশি রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার লাইন হুবহু বলে দেওয়া তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম দিক। সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির এমন প্রখরতা তাঁর সহকর্মীদের কাছে ছিল সত্যিই বিমুগ্ধ হওয়ার মতোই। ১৯৬৪ থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাসে তথ্য বিভাগের সম্পাদক-অনুবাদকের কাজ করেছেন নিরলস প্রেরণায়। ২৭ বছর কোনো দিকে তাকানোর সময়ই হয়নি। সেই মধুর স্মৃতিচয়ন তাঁকে আনন্দে বিহ্বল যেমন করত, একইভাবে সেই সময়ের সামাজিক পরিমণ্ডলের হরেক রকম উত্থান-পতনের জ্বালাময়ী ইতিহাসও তাঁর স্মরণ চেতনায় গাঁথা হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যিক ক্রমবিবর্তনের ধারা যেমন গণমানুষকে উদ্বেলিত করেছিল, পাশাপাশি শাসন-শোষণের নিপীড়ন ও স্মৃতির মিনারে জ্বলজ্বল করে ভাসত। ষাটের দশক থেকে স্বাধীনতা অর্জনকাল পর্বের অর্থাৎ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একজন বিদগ্ধ দর্শক নিয়ামত হোসেন। নিজেকে এই চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম সব বাঙালির জীবনে এক মহিমান্বিত অধ্যায়– সেই বোধ তিনি লালন করেছেন জীবনব্যাপী। একাত্তরে বিজয়ের নিশান ওড়ানো থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রতিটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করে উল্লসিত যেমন হতেন, তেমনি বিষণ্ণতায় ভেঙে পড়তেন '৭৫-এর রক্তাক্ত অধ্যায়কে মনে করে। একসময় কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে ওঠা শিশু-কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর'-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। লেখক, কলামিস্ট এবং কবি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সাংবাদিকতা জীবনের এক অনবদ্য অধ্যায়। সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া এই নিবেদিত সাংবাদিক আমৃত্যু দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগনায় জন্ম নেওয়া নিয়ামত হোসেন তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিও রোমন্থন করতেন ঘনিষ্ঠজনদের কাছে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সমাজের অবক্ষয়, মৌলবাদের উত্থান, ধর্মীয় বিদ্বেষকে কখনো মানতে পারতেন না। মানুষকে মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। রবীন্দ্র-নজরুলের পাশাপাশি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা তাঁকে প্রতিনিয়তই উদ্দীপ্ত করত। অবলীলাক্রমে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁদের কবিতা তিনি বলতে পারতেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে কত জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য পেয়েছেন, সেটাও মানস চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে খেলাঘরের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের সম্পর্কে অনেক অজানা কথা তাঁর মুখ থেকে শোনার সুযোগ পেয়েছে নবীন প্রজন্ম। কবি হিসেবে নিজস্ব মৌলিক রচনা তো ছিলই, তিনি অগ্রজ বিখ্যাত কবিদের কবিতার প্যারোডি লিখতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর চাকরি জীবনের শেষ সময়টুকু কেটেছে অসহ্য নৈঃসঙ্গ্যে। একমাত্র ছেলে বিদেশে থাকত। সাহিত্যিক স্ত্রী নিলুফার হোসেন মীরাকেও হারিয়েছেন মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে। একেবারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন আত্মপ্রচারবিমুখ এই গুণী ব্যক্তি জীবনের শেষ ক'টা বছরে। প্রতিদিনই অফিসে যেতেন। ছুটি কাটানোর তাগিদ ছিল না তাঁর। শরীরটাও যে কখনো খারাপ থাকত না তা কিন্তু নয়। চোখে দেখতেন কম। পড়তে কষ্ট হতো। সম্পাদকীয় সম্পাদনা করতে অন্যের সাহায্য নিতেন। একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক নিয়ামত ভাই কর্মজীবনের গোধূলিলগ্নেও যতখানি পেরেছেন দৈনিক জনকণ্ঠকে সময় এবং শ্রম দিতে কার্পণ্য করেননি। একসময় দৈনিক বাংলা'য় নিয়মিত প্রকাশ পেত 'নিয়ামত হোসেনের প্যারোডি'। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ কবির জনপ্রিয় কবিতার প্যারোডি করতেন সমসাময়িক নানা বিষয়ের আলোকে। এসব প্যারোডি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেসময়। সমাজের নানা অসংগতি তিনি এসব প্যারোডির মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। নিয়ামত ভাইয়ের মতো এমন নিরহংকার, প্রচারবিমুখ, বিনয়ী মানুষ আজকের দুনিয়ায় বড়ো বিরল। কারও সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে– এমনটি কখনো শোনা যায়নি। কারও সঙ্গে মত না মিললে তিনি তাকে এড়িয়ে চলতেন কিন্তু কখনোই তার ওপর চড়াও হতেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক, দুর্দিনের সাথী। রোজ সকালে নিয়ম করে রবীন্দ্রসংগীত শুনতেন। কথায় কথায় তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও নজরুল, সুকুমার রায়, জীবনানন্দ, সুকান্ত, সুভাষ প্রমুখ কবির অনেক কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ। সদা হাসি-খুশি এই মানুষটি বুকের ভেতর একটা ব্যথা বয়ে বেড়াতেন। সেটা জন্মভূমি ত্যাগের বেদনা। তাঁর জন্ম অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগনায়। একবার এক সহকর্মী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'ফেলে আসা জন্মভূমির কথা মনে পড়ে না নিয়ামত ভাই?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমৃত্যু সর্বক্ষণ!' তিনি তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে। আমাদের স্মৃতিতে, চেতনায় ও চর্চায়।

লেখক: সিনিয়র রিপোর্টার, যুগান্তর

উপকূল সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

রফিকুল ইসলাম মন্টু

পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনপদের নাম উপকূল। এই জনপদের মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। প্রতিবছর দুর্যোগে হাজারও মানুষের প্রাণহানি ঘটে। কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ভাসমান দিন কাটায়। জীবিকানির্বাহে সংকটের শেষ থাকে না। এর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উপকূলে। প্রান্তিকের এই বিপন্নতার চিত্র কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমে খুব কমই উঠে আসছে। গণমাধ্যমের বেশির ভাগ ফোকাস দুর্যোগ কিংবা অন্য চলমান ঘটনায়। 'ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে সতর্কীকরণ সংকেত– তিন, চার, ছয়, আট...।' সতর্কীকরণ বার্তা যত বিপদের দিকে এগোয়, ততই দ্রুতবেগে ব্যস্ত হয়ে ওঠে গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় বার্তাকক্ষ। উপকূলের দিকে বিপদ আসার খবরের ছবি চাই, সবার চেয়ে ভালো ছবি, লিড করার মতো ছবি! বিস্তারিত প্রতিবেদন চাই, সবার চেয়ে ভালো প্রতিবেদন। গণমাধ্যমের ক্যামেরার চোখ তখন উপকূলের প্রান্তিকে, সেই সঙ্গে বাড়ে সংবাদকর্মীর ব্যস্ততাও। আর সেই ঘূর্ণিঝড়টি যদি মহাপ্রলয় নিয়ে উপকূলে

মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতিবেদনও যে পাঠকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন। মানুষের খবর জানতে একেবারে মানুষের কাছে যাওয়া। বঞ্চিত মানুষটির মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে ঘটনার বিবরণ। ... পাঠক রাষ্ট্রের আলোচিত বিষয় ও রাজনৈতিক খবরের ওপর কিছুটা ঝুঁকে থাকলেও তাদের জানার আগ্রহের পরিধি অনেক বেড়েছে। তারা অন্য খবরের পাশাপাশি মানুষের খবরও জানতে চান। উপকূলের মানবিক আবেদনধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোয় জনমত সৃষ্টি হতে পারে

আঘাত হানে, তাহলে তো ঢাকা থেকে দলবেঁধে সংবাদকর্মী ছুটেন উপকূলের দিকে। খবর খুঁজি উপকূলের প্রান্তিকে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় ওলটপালট জনপদ। ছুটে চলে বিপন্ন মানুষের দল। কেউবা দলছুট। শুকনো মুখগুলোর গভীর চাহনি আর দীর্ঘশ্বাসে কষ্টের ইঙ্গিত। সমুদ্রের নোনা জলে কালচে শরীর। তিনবেলা ভাত জোটানোর লড়াইটা যেন চোখেমুখেই স্পষ্ট। পরিবারের সদস্যসংখ্যা কারও পাঁচ, কারও সাত আবার কারও দশ। বছরের একাধিকবার ঝড়ের তাণ্ডব এদের জীবনের গতিপথ বদলে দেয়। জীবনের লড়াইটা তখন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ নিঃস্ব। একেকটি জনপদ বিলীন হয়ে যায় চোখের সামনে। আবার

জেগে ওঠে নতুন চর। আবার জাগায় স্বপ্ন। উপকূলের এই প্রান্তিকে সরকারি-বেসরকারি সেবাও খুব একটা পৌঁছায় না। তবুও এগিয়ে যেতে হয়। জীবনযুদ্ধের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করতে পারেন না বিপন্ন মানুষও। এসব খবরের খোঁজ করি উপকূলের পথে-প্রান্তরে। উপকূলের অন্ধকার প্রকাশের আলোয় আনার এই নিরন্তর চেষ্টা। এরই নাম উপকূল সাংবাদিকতা। কিন্তু এই সাংবাদিকতায় রয়েছে চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকি। এসব চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকি কাটিয়ে সামনে যেতে পারলে আছে সম্ভাবনার সুদীর্ঘ দিগন্তরেখা। উপকূল সাংবাদিকতা বিকাশের মধ্য দিয়ে সেই দিগন্তরেখায় পৌঁছানো সম্ভব।

গুরুত্বের দিক বিবেচনায় জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ স্থানজুড়ে বিরাজমান 'উপকূল সাংবাদিকতা'। হয়তো এটি এখনো 'উপকূল সাংবাদিকতা' হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কখনো উপকূলের এই ভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতা পরিচিতি পায় মফস্বল সাংবাদিকতা হিসেবে, কখনো বা দুর্যোগ সাংবাদিকতা হিসেবে। ইদানীং এটি জলবায়ু পরিবর্তন সাংবাদিকতা হিসেবেও স্থান করে নিচ্ছে। এই যে বিভিন্ন ফরমেটে আমরা উপকূল সাংবাদিকতা দেখছি, এখানেই রয়েছে সম্ভাবনা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উপকূলের যেখানে বিশেষ অবদান রয়েছে আবার প্রাকৃতিক বিপদের বড়ো সূত্র যেখানে এই উপকূল, সেখানে 'উপকূল সাংবাদিকতা' পৃথক মর্যাদা পাওয়া এখন সময়ের দাবি। কয়েক বছর ধরে নিবিড়ভাবে উপকূল সাংবাদিকতা শুরু হয়েছে। আর এই কাজের ভেতর দিয়ে সামনে আসছে কিছু চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (আইসিজেডএমপি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত দেশের ১৯টি জেলাকে উপকূলের আওতাভুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে। জেলাগুলো হচ্ছে– বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা ও শরীয়তপুর। জেলাগুলোয় সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৯০টি। এর মধ্যে ৪১টি সংসদীয় আসন প্রত্যক্ষ উপকূল সংশ্লিষ্ট। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে উপকূলভুক্ত এ এলাকায় লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। সমগ্র উপকূল অঞ্চলকে 'এক্সপোজড' ও 'ইন্টেরিয়র'– এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ হিসাবে বিপন্নতায় ১৬ জেলা। তিনটি নির্দেশককে ভিত্তি ধরে চিহ্নিত করা হয়েছে উপকূল অঞ্চল। এগুলো হলো– জোয়ার-ভাটার বিস্তৃতি, ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস ও লবণাক্ততার প্রভাব। এ তিন নির্দেশককে কেন্দ্র করেই উপকূল অঞ্চলের অধিকাংশ সমস্যা আবর্তিত। তিনটি নির্দেশকের মধ্যে যেখানে কমপক্ষে দুটি বিদ্যমান, সে এলাকাকে এক্সপোজড জোন আর যেখানে একটি বিদ্যমান, সে এলাকাকে ইন্টেরিয়র জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের বিস্তৃতি কক্সবাজারের শাহপরীর দ্বীপ থেকে শুরু করে পশ্চিমে সুন্দরবন পর্যন্ত। ৭১০ কিলোমিটার তটরেখাবেষ্টিত সমগ্র উপকূলে ঝুঁকিপূর্ণ জেলা ১৬টি। জেলাগুলো হচ্ছে– পূর্ব উপকূলের কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর; মধ্য উপকূলে বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, শরীয়তপুর এবং পশ্চিম উপকূলে রয়েছে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। পরোক্ষভাবে উপকূলের আওতায় আরও তিনটি জেলা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর। মোটা দাগে সমগ্র এই অঞ্চলের সাংবাদিকতাকেই 'উপকূল সাংবাদিকতা' ধরা যায়। তবে সমগ্র উপকূল অঞ্চলকে একই ফ্রেমে নিয়ে এসে পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে যে সাংবাদিকতা, সেটাকেই প্রকৃত 'উপকূল সাংবাদিকতা' বলা উচিত।

সূত্র বলছে, ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর তাপমাত্রা বেড়েছে দশমিক ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৯৬১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে গড়ে প্রতিবছর তাপমাত্রা বেড়েছে দশমিক ৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষ ১০ বছরে তাপমাত্রা এত বেড়েছে যে ৪০ বছরের গড় তাপমাত্রার হার দ্বিগুণ হয়েছে। ১০০ বছরে বাংলাদেশে তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, একই সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে দশমিক ৫ মিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম খুলনা অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার রেকর্ড করা হয়েছে ৫ দশমিক ১৮ মিলিমিটার। এসব তথ্য থেকে দেখা যায়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। এরপরও এ হারে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৮৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতিবেদনও যে পাঠকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন। মানুষের খবর জানতে একেবারে মানুষের কাছে যাওয়া। বঞ্চিত মানুষটির মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে ঘটনার বিবরণ। সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সেসব অজানা কাহিনি তুলে ধরা যেতে পারে পাঠকের সামনে। পাঠক রাষ্ট্রের আলোচিত বিষয় ও রাজনৈতিক খবরের ওপর কিছুটা ঝুঁকে থাকলেও তাদের জানার আগ্রহের পরিধি অনেক বেড়েছে। তারা অন্য খবরের পাশাপাশি মানুষের খবরও জানতে চান। উপকূলের মানবিক আবেদনধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোয় জনমত সৃষ্টি হতে পারে। উপকূলের ইস্যুকে প্রধানত ৮টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো: (১) পরিবেশ-প্রতিবেশ, (২) জলবায়ু পরিবর্তন, (৩) দুর্যোগ-দুর্বিপাক, (৪) নাগরিক সেবা, (৫) দুর্নীতি-অপরাধ, (৬) রাজনীতি, (৭) সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং (৮) উন্নয়ন ও অপ-উন্নয়ন।

নিবিড় উপকূল সাংবাদিকতা প্রান্তিকের জেলে-কৃষক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনতে পারে। এর মাধ্যমে উপকূলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। ... প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন জনপদের মানুষ কী সমস্যায় পড়ছেন, কীভাবেই বা তার সমাধান করছেন, সব বিবরণ প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা

উপকূল সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি প্রসঙ্গে বলার আগে এই ধরনের সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা খুবই জরুরি। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মানুষ বসতি বদলাচ্ছে বারবার। এসব ঝুঁকির মধ্যেই বেঁচে আছে উপকূলের প্রায় চার কোটি মানুষ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাই এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা পিছিয়ে রাখছে। উপকূলের বহু এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণেই সেখানকার মানুষ কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। এরই প্রভাব পড়ছে সমাজের নানা স্তরে। অশিক্ষা-অসচেতনতা জনপদের মানুষের অনগ্রসরতার গণ্ডি পেরোতে দিচ্ছে না। উপকূলের মানুষকে সেসব সংকট থেকে বের হতে সহায়তা করার ভাবনা থেকেই ভিন্নধারার উপকূল সাংবাদিকতার পথে চলা।

দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ অঞ্চলটি পিছিয়ে আছে যুগের পর যুগ। দুর্যোগ এলে সব গণমাধ্যমে হইচই পড়ে যায়। 'সিডর', 'আইলা', 'মহাসেন'-এর কল্যাণে উপকূলের প্রতি গণমাধ্যমের সাময়িক নজর পড়ে উপকূলের প্রান্তিকে। দুর্যোগ সরে গেলে সেসব কথা কারও মনে থাকে না। দ্বীপের খবর কেউ রাখেন না। উপকূলের বিচ্ছিন্ন জনপদের প্রকৃত খবর নেই রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারছে না। সেখানকার জেলে কীভাবে বেঁচে থাকেন? কৃষক কেন ফসল পান না? শিশু কেন স্কুলে যেতে পারে না? নানামুখী দুর্যোগে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে?

এসব প্রশ্নের জবাব আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আবার থাকলেও আছে শুধু উপরিভাগের তথ্য। ভেতরের তথ্য জানার সুযোগ একেবারেই কম। উপকূলকে এগিয়ে নিতে হলে, সেখানকার মানুষের সংকট কাটাতে হলে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাই। তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, উপকূলের সমস্যা নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাবার সুযোগ করে দেওয়া, নীতিনির্ধারকদের সামনে সমস্যা সমাধানের পথ বের করে দিতেই উপকূল সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আর এ লক্ষ্য নিয়েই আমি এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সাংবাদিকতায় যুক্ত হই। এখানে চ্যালেঞ্জ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভালো প্রতিবেদন তৈরির অনেক ক্ষেত্র। যথাযথ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপকূলের অনেক নতুন তথ্য তুলে আনা সম্ভব, যা দিয়ে চমৎকার প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে।

নিবিড় উপকূল সাংবাদিকতা প্রান্তিকের জেলে-কৃষক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনতে পারে। এর মাধ্যমে উপকূলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। দুবলার চর, নিঝুমদ্বীপ, মনপুরা, হাতিয়া, শাহপরীর দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন জনপদকে কেন্দ্রের সামনে উপস্থাপন করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন জনপদের মানুষ কী সমস্যায় পড়ছেন, কীভাবেই বা তার সমাধান করছেন, সব বিবরণ প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। খতিয়ে দেখতে পারে কেন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য সরকারি-বেসরকারি সেবা মিলছে না? কেনই বা তারা পিছিয়ে আছে যুগের পর যুগ? এর সঙ্গে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ, সরকারি-বেসরকারি তৎপরতা আর নতুন নতুন ভাবনার খবরাখবর তুলে আনতে পারে উপকূল সাংবাদিকতা। তথ্য প্রচার এবং এ সংক্রান্ত নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া সম্ভাবনাময় অঞ্চলটিকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। মনে রাখা প্রয়োজন, বারবার কড়া নাড়লেই উপকূলের অন্ধকার দুয়ারে আলো ফেলা সম্ভব। আর সেক্ষেত্রে উপকূল সাংবাদিকতা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

উপকূল সাংবাদিকতায় যেখানে এত সম্ভাবনা ও সুযোগ, সেখানে বাংলাদেশের উপকূল সাংবাদিকতা কতটা এগিয়েছে? সংগত কারণেই এই প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উপকূলের খবরের প্রতি এদেশের কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের নজর খুবই কম। বহুমুখী প্রতিবন্ধকতায় উপকূলের মানুষের সংকটের বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হতে পারেনি। ফলে সংবাদকর্মীরাও বিশেষভাবে উপকূল সাংবাদিকতায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন না। ঠিক কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের মতোই উপকূল অঞ্চলে কর্মরত সংবাদকর্মীও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকূলের কিছু চলমান বিষয়ে খবর তৈরির পর থেমে যান। অনেকে আবার দৈনন্দিন খবরের চাপে উপকূল নিয়ে বিশেষ খবর তৈরির সুযোগ পান না। তাদের পক্ষে শহর ছেড়ে প্রান্তিকের কোনো জনপদে যাওয়াও সম্ভব হয় না। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, উপকূল অঞ্চলে বেশকিছু স্থানে ভালো লিখিয়ে রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত প্রান্তিকের মানুষের খবর রাখেন। তবে সে সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। এ সংখ্যা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের দিক থেকে উৎসাহ একেবারেই কম। উপকূলের সাংবাদিকতায় এটিই সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এ সমস্যার কারণে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও একজন সংবাদকর্মীর পক্ষে সেভাবে উপকূলের ইস্যু নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। তবে বাধা থাকবে, সেই বাধা অতিক্রম করে উপকূল সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে হবে।

উপকূলের প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে দ্বীপ ও চর। ভাঙনকবলিত এলাকা রয়েছে অসংখ্য। এমন অনেক সংকটাপন্ন এলাকা আমি চিনি, যেখানে কখনো কোনো সংবাদকর্মীর পা পড়েনি। পা ফেলেননি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা কিংবা জনপ্রতিনিধি। কেমন আছেন ওইসব এলাকার মানুষ? জানি, প্রান্তিকের এ দুর্গম জনপদে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহে সময় ও অর্থের প্রয়োজনটাই সবার আগে দেখা দেয়। তারপরও নিজের প্রয়োজনেই উপকূল অঞ্চলে কর্মরত প্রত্যেক সংবাদকর্মীর উচিত নিজ নিজ এলাকা ভালোভাবে চেনা। একটি এলাকা ভালোভাবে চেনা থাকলে যে কোনো প্রতিবেদন লেখা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া সরেজমিন এলাকায় গেলে লেখার ধরনটাও বদলে যায়। বিষয়টি আরও সহজভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। উপকূলের জেলাগুলোর মধ্যে প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি দুর্গম এলাকা রয়েছে। এসব এলাকার তথ্যাবলি নীতিনির্ধারক মহলে পৌঁছাতে হলে উপকূলের সাংবাদিকদেরই সবার আগে নজর ফেলতে হবে।

অবশ্যই চ্যালেঞ্জ আছে। দুর্গম এলাকার তথ্য তুলে আনতে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই! আর সাংবাদিকতা পেশাটাই তো চ্যালেঞ্জের। ঝুঁকি আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার নামই উপকূল সাংবাদিকতা। পশ্চিম উপকূলের সুন্দরবনের গা ঘেঁষে জেগে থাকা উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের মোংলায় রয়েছে দুবলার চর। এর আওতায় রয়েছে অনেক চর। শুঁটকি উৎপাদনকে কেন্দ্র করে শীত মৌসুমে সেখানে হাজারও মানুষের ভিড় জমে। এ ছাড়াও কিছু মানুষ সেখানে নিয়মিত জীবিকার পথ খোঁজেন। একজন সংবাদকর্মী চাইলেই খুব সহজে সেখানে সংবাদ সংগ্রহে যেতে পারেন না। সুন্দরবনের আওতায় থাকায় দুবলার চরে যেতে বন বিভাগের অনুমতি লাগে। তাছাড়া ওই চরে যাওয়ার জন্য নেই কোনো যানবাহন। দ্বীপ জেলা ভোলার দিকে চোখ ফেরালে চোখে ভাসে অসংখ্য দ্বীপ-চরের ছবি। কয়টা দ্বীপে গিয়ে কজন সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছেন? সেখানকার অনেক দ্বীপ এখনও অধিকাংশ সংবাদকর্মীর কাছেই অচেনা।

পূর্ব উপকূলে চোখ ফেরালেও অনেক স্থানের একই চিত্র। কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের কুদিয়ার টেক তো সমুদ্রে হারিয়ে গেল! তারই কাছে গ্রাম তাবালরচরও হারানোর পথে। সেখানকার মানুষের দুরবস্থা কতজন সংবাদকর্মী নিজের চোখে দেখেছেন? বাড়ি হারানো মানুষ কোথায় গেলেন? ক'জন সংবাদকর্মীর কাছে সে খবর আছে? ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়ে কক্সবাজারের মহেশখালীর ধলঘাটা ইউনিয়ন, টেকনাফের সাবাং ইউনিয়নের মানুষের কেবলই ছোটাছুটি। কে কার খোঁজ রাখে! আবার আসি ভোলার দ্বীপ চরনিজামের দিকে। দ্বীপ উপজেলা মনপুরা থেকে তিন ঘণ্টা ট্রলার চালালে ওই দ্বীপের দেখা মেলে। সেখানকার মানুষের কাছে পৌঁছায় না কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা। কীভাবে জীবনটা পার করছেন ওই এলাকার মানুষ? কীভাবেই বেড়ে উঠছে সেখানকার আগামী প্রজন্ম? কী খোঁজ আছে উপকূলের সংবাদকর্মীদের কাছে? পটুয়াখালীর আন্ডারচর, চরমোন্তাজ, চরকাজল, চরলতা, রাঙ্গাবালির সরেজমিন তথ্য-উপাত্ত কজন সংবাদকর্মীর কাছে আছে? ভাঙন রোধে অর্থ বরাদ্দের পরও লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের লুধুয়ার বড়ো অংশ অল্পদিনের ব্যবধানে বিলীন হয়ে গেল। নিস্ব হলো বহু মানুষ। কই, এ সম্পর্কে খুব বেশি প্রতিবেদন তো চোখে পড়ল না!

সময়, অর্থ ও সুযোগ– এ তিনটি প্রশ্ন বারবারই আসে। তবে উপকূলের সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিও বড়ো বিষয়। এর সঙ্গে সাংবাদিকের সততা, একনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা এবং নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরি। উপকূলীয় কোনো শহরে রাজনৈতিক হানাহানি, সড়ক দুর্ঘটনা, এমনকি কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত হানার বিষয়টিকেও পুরোপুরি উপকূল সাংবাদিকতার আওতায় ফেলতে পারি না। নদীভাঙনে তাৎক্ষণিক কয়েকটি পরিবার নিস্ব হওয়া কিংবা জলোচ্ছ্বাসে কোনো এলাকার ফসলের ক্ষতির মতো বিষয়কেও উপকূল নিয়ে ব্যতিক্রমী সাংবাদিকতার আওতায় ফেলা যায় না। এজন্যই উপকূলের সাংবাদিকতায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় চোখের (থার্ড আই) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপকূলের সংবাদকর্মীকে নতুন খবরের সন্ধান দেবে, যা ইতঃপূর্বে কখনো বিস্তারিতভাবে লেখা হয়নি। প্রত্যেক সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরি। আমি কী চাই? আমি কি অন্য দশজন সংবাদকর্মীর মতো দৈনন্দিন খবর নিয়েই ব্যস্ত থাকব? নাকি নতুন কিছু সন্ধান করব? আমার লক্ষ্যই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেবে। আর এক্ষেত্রে উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একা সংবাদকর্মীর ওপর সব দায়দায়িত্ব ফেলে রাখলেও চলবে না। উপকূল সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবিলায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণ ও রিপোর্টিং পরিকল্পনায় উপকূলের ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। গণমাধ্যমগুলো উপকূল নিয়ে পৃথক বিট যেমন তৈরি করতে পারে, তেমনি বিভাগ চালু করতে পারে। পাশাপাশি উপকূল ইস্যুতে উপকূলের সংবাদকর্মীদের পেশার মানোন্নয়নে নজর দিতে হবে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহায়তা নিয়ে সংবাদকর্মীর পেশাগত মানোন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো। উপকূল অঞ্চলের সাংবাদিকদের নিয়ে ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকি অতিক্রম করে একদিন উপকূলের অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হবে। কেন্দ্রীয় গণমাধ্যমের নজর পড়বে উপকূলের অন্ধকারে। আর সেই সঙ্গে উপকূলের অন্ধকার উঠে আসবে প্রকাশের আলোয়। এরই পথ ধরে উপকূলের মানুষ এগিয়ে যাবেন স্বপ্ন পূরণের পথে। সেই দিনের অপেক্ষা করছি।

লেখক: উপকূল অনুসন্ধানী সাংবাদিক

সংবাদের আলোয় আলোকিত

সালাম জুবায়ের

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের যে আধুনিক ধারা এখন বহমান তা প্রথম দৈনিক সংবাদের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে বা গড়ে উঠেছে। যেভাবেই বলি, এটা পরম সত্য যে, সংবাদের দেখানো পথ বেয়েই বাংলাদেশে একদিকে সাংবাদিকতা, অন্যদিকে সংবাদপত্রের নিজস্ব ধারা অর্জন সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের সংবাদপত্র মানেই ছিল কলকাতার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন ধারার অনুসরণ। সে ধারা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়েছিল সংবাদই। এ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে– বাংলাদেশে সাংবাদিকতার প্রথম যুগে দৈনিক সংবাদ আধুনিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে পথ দেখিয়েছে। অন্য কথায়, দৈনিক সংবাদের আলোয় আলোকিত হয়েছে বাংলাদেশের আধুনিক সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা। আর সংবাদের সে দীপ্তি যে প্রখরতা এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল তার প্রমাণ এখনকার সংবাদ। সংবাদের অনেক কিছুই আগের মতো নেই। যুগের সঙ্গে, সময়ের নানা ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বা আধুনিকতাকে ধরে রাখতে অনেক পরিবর্তন

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের যে আধুনিক ধারা এখন বহমান তা প্রথম দৈনিক সংবাদের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে বা গড়ে উঠেছে। যেভাবেই বলি, এটা পরম সত্য যে, সংবাদের দেখানো পথ বেয়েই বাংলাদেশে একদিকে সাংবাদিকতা, অন্যদিকে সংবাদপত্রের নিজস্ব ধারা অর্জন সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের সংবাদপত্র মানেই ছিল কলকাতার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন ধারার অনুসরণ

হয়েছে। কিন্তু যে ধারা সংবাদের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার আলো এখনো ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এর পাশাপাশি আরেকটি তথ্য সংযোজন করা অত্যাবশ্যক, তা হচ্ছে দৈনিক সংবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি কথা প্রথমেই বলতে হয় বা শুনতে হয়, তা হলো দৈনিক সংবাদ তার দীর্ঘ চলার পথে সবসময়ই সবচেয়ে মর্যাদাকর ঘটনা এবং প্রতিভাদীপ্ত মানুষের সঙ্গে থেকেছে। পেশাগত আলো ছড়ানোর পেছনে এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং মেধাসম্পন্ন মানুষের কর্মকাণ্ড প্রধান নিয়ামক হিসেবে

কাজ করেছে, পরবর্তী যুগে যদিও অন্য অনেক পত্রিকা এবং অনলাইন শুরু হওয়ার পর এ জগতের অনেক কিছুই নতুন ভাব ও অভিধা পেয়েছে।

সংবাদের জন্ম ১৯৫১ সালে। তখন বাংলাদেশে সংবাদপত্র বলতে ছিল দৈনিক আজাদ। কলকাতা থেকে আনন্দবাজার এবং অন্য দু-একটি পত্রিকা ডাকযোগে আসত। আর ছিল কিছু ম্যাগাজিন ধরনের সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর মধ্যে বিনোদন পত্রিকাই ছিল বেশি। এর মধ্য দিয়েই সংবাদপত্র পাঠকদের তৃষ্ণা মিটতো। সেই অবস্থার পরিবর্তন হয় দৈনিক সংবাদ প্রকাশের পর। সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মূলত এদেশীয় একটি সংবাদপত্র প্রচলনের প্রত্যাশা নিয়েই। প্রগতিশীল একজন ব্যবসায়ীর হাত ধরে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আনুষঙ্গিক নানা কারণে তারপক্ষে সংবাদপত্র চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন সংবাদ চলে যায় রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের হাতে। এরপরই সংবাদের পথ রাজনৈতিক দিকে চলে যায়। এর কারণ ছিল আরও রাজনৈতিক। তখন বাংলাদেশে, অন্য অর্থে, পূর্ববঙ্গে ছিল মুসলিম লীগের শাসন। মুসলিম লীগ ছিল মূলত একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। ক্ষমতায় থাকার জন্য যেটুকু সংবাদ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড করা প্রয়োজন সেটুকু করার তাগিদ ছাড়া সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতায় যে বস্তুনিষ্ঠতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন সে সময়ে সংবাদ কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করেননি বা করতে পারেননি। তবে সেসব দিকে মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছা তাদের মধ্যে প্রথমদিকে ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না অবশ্য। কিন্তু মুসলিম লীগের সংবাদপত্র চালানোর মতো ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় '৫৪ সালের নির্বাচনে তাদের ভরাডুবির পর। তখন সংবাদপত্র নিয়ে আর কিছু করার মতো অবস্থাও তাদের ছিল না। এসময় সংবাদের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন নরসিংদীর ঘোড়াশালের জমিদার পরিবারের সন্তান আহমদুল কবির। তিনি তখন শিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে মেধাবী এবং আদর্শবাদী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রগতিশীল বাম রাজনৈতিক ধারায় তিনি দীক্ষিত। তিনি সংবাদ কিনে নেন। সংবাদ জন্ম নেওয়ার সময় এর সম্পাদক হিসেবে ছিলেন সেসময়ের নানাভাবে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব খায়রুল কবির। তিনি ছিলেন আহমদুল কবিরের বড়ো ভাই। খায়রুল কবির পরবর্তীতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতের অন্যতম দিকপাল হয়ে উঠেছিলেন।

আহমদুল কবির সংবাদের মালিকানা কিনে নেওয়ার পর এর খোলনলচে পালটে ফেলেন। এই পালটে ফেলার পেছনে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন কাজ করেছে। আগেই বলেছি আহমদুল কবির মূলত ছিলেন বাম ঘরানার প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত একজন আধুনিক মানুষ। এই অর্জন ছিল তাঁর উচ্চমার্গের পড়াশোনা এবং সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মানসিকতা থেকে উদ্ভূত। তিনি যে কতটা মেধাবী ও আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন, তা অনুধাবন করা যায় সেই সময়ে তার রাজনৈতিক অর্জন বিশ্লেষণ করলে। তিনি তার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনযাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রথম সহসভাপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা তাঁর জীবনের একটি বিরল অধ্যায়। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো, আহমদুল কবির একটি জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁর মধ্যে বাম প্রগতিশীল এবং সমাজের অবহেলিত মেহনতি মানুষের ভালো জীবনযাপন প্রাপ্তির চিন্তা স্থান করে নিয়েছিল। তাঁর এই আদর্শ দেশের নানা উত্থান-পতনের পরও অব্যাহত ছিল মৃত্যু পর্যন্ত। বিলাসী জীবন ত্যাগ করে তিনি সাধারণ জীবনযাপন করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি অসাধারণ উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। এটা যেমন তাঁর জীবনযাপন বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তেমনি দৈনিক সংবাদ পরিচালনার ক্ষেত্রেও বলা যায়। সবখানেই ছিল তাঁর ভিন্নধর্মী আদর্শবাদিতা। আর এভাবে নির্লোভ ও আদর্শবাদী জীবনের দিকে নিজেকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতের দিকপাল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে একটি নতুন রূপ দিতে পেরেছিলেন, যে ধারা এখনো অব্যাহত আছে তাঁর উত্তর প্রজন্মের হাত ধরে।

আহমদুল কবির তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের কারণেই হাতে নিয়েই নতুন জীবন দিলেন সংবাদকে। মৃত্যুপথযাত্রী একটি সংবাদপত্রকে তিনি নতুন দিকে নিয়ে গেলেন। সেই নতুন দিকটি হলো, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের সংবাদপত্র পড়ার সংস্কৃতিকে তিনি আরও বিস্তৃত করে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী জীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার মুখপত্র হিসেবে তুলে ধরলেন। এই অসাধারণ কাজটি করে তিনি এক্ষেত্রে হয়ে উঠলেন পথপ্রদর্শক। তাঁর এই ভিন্নধর্মী চিন্তার আরও ব্যাপক প্রসার ঘটে পরবর্তীকালে অন্য সংবাদপত্রগুলো একই ধরনের পথচলা শুরু করার মধ্য দিয়ে। আগেই বলেছি, তখন সংবাদপত্র পাঠ ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের বিষয়। তা থেকে বের করে আহমদুল কবির সংবাদপত্রকে ছড়িয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষক, প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক থেকে শুরু করে উচ্চমার্গের পেশাজীবীদের পাশাপাশি একজন সাধারণ শ্রমিককেও তিনি সংবাদপত্র পাঠের গণ্ডিতে নিয়ে আসেন। এই আনাটা ছিল সংবাদপত্রকে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের পাঠযোগ্য করার মধ্য দিয়ে। একজন রাজনৈতিক কর্মী, একজন উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষাবিদ যেমন তার পাঠযোগ্য বিষয় পাচ্ছে সংবাদপত্রে, তেমনি পাটকল-সুতাকলের একজন সাধারণ শ্রমিকও তাঁর পাঠযোগ্য বিষয় পাচ্ছেন দৈনিক সংবাদে। সাধারণ মানুষ তার রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের খবর পাচ্ছিলেন সংবাদ পড়ে। একজন প্রান্তিক কৃষক, চাষিও দৈনিক সংবাদকে তার পাশে পাচ্ছিলেন। কোন মাসে কোন ধান রোপণ করতে হবে, সে খবরটিও সংবাদ খুব যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন পাতায় তুলে ধরেছে। যেমন তুলে ধরেছে শিশুদের কথা, নারীদের কথা, ব্যবসায়ীদের কথাও। সেই সময় শিশুদের জন্য আলাদা পাতা, নারীদের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, কৃষকদের জন্য– সবার, সব পেশার মানুষের কথা বলার জন্য, সুখ-দুঃখ প্রকাশের জন্য সংবাদ পৃথক পৃথক বিভাগ শুরু করেছিল। এটা একটি অসাধারণ ঘটনা বিশেষ করে সংবাদপত্রের সেই প্রাথমিক যুগে। এখন এই সময়ে বসে এখনকার প্রজন্মের পক্ষে ৫০-৬০ বছর আগের সংবাদপত্রের রূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বুঝতে হলে অনেক গবেষণা করে তথ্য বের করতে হবে। তখনই সংবাদকে চেনা যাবে।

সংবাদে গ্রামীণ জনপদ, কৃষক– এসব বিষয় এত জোরালোভাবে উঠে আসত যে, শহরের আড়ম্বরপূর্ণ সমাজের পাশাপাশি গ্রামের নিরাভরণ পরিবেশেও সংবাদপত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল দৈনিক সংবাদ। দৈনিক সংবাদের পাতায় কৃষক ও গ্রামীণ জনপদের কথা তুলে ধরে সংবাদের রিপোর্টার মোনাজাতউদ্দিন বাংলাদেশের সংবাদজগতে একটি ভিন্ন ধারাই সংযোজন করে ফেললেন। তা হলো 'গ্রামীণ সাংবাদিকতা' এবং 'চারণ সাংবাদিকতা'

সংবাদে গ্রামীণ জনপদ, কৃষক– এসব বিষয় এত জোরালোভাবে উঠে আসত যে, শহরের আড়ম্বরপূর্ণ সমাজের পাশাপাশি গ্রামের নিরাভরণ পরিবেশেও সংবাদপত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল দৈনিক সংবাদ। দৈনিক সংবাদের পাতায় কৃষক ও গ্রামীণ জনপদের কথা তুলে ধরে সংবাদের রিপোর্টার মোনাজাতউদ্দিন বাংলাদেশের সংবাদজগতে একটি ভিন্ন ধারাই সংযোজন করে ফেললেন। তা হলো 'গ্রামীণ সাংবাদিকতা' এবং 'চারণ সাংবাদিকতা'। এই অসাধারণ কাজ হয়েছে দৈনিক সংবাদের মাধ্যমেই। আর এসবই ছিল সংবাদপত্র শিল্পে যেমন, তেমনি সাংবাদিকতায়ও মাইলফলক। সংবাদপত্রের এই বিষয়ভিত্তিক বিবর্তন নিয়ে যদি গবেষণা হয় তবে তার সিংহভাগজুড়েই থাকবে দৈনিক সংবাদ, দৈনিক

সংবাদের বিভিন্ন বিষয়। কারণ সংবাদপত্রের যা কিছু অভিনব, নতুন এবং আধুনিক সংযোগ তার সব না হলেও সিংহভাগই হয়েছে দৈনিক সংবাদের হাত ধরে।

সংবাদপত্রের ভাষার ব্যবহার নিয়েও দৈনিক সংবাদের নিজস্ব অবস্থান ছিল ভিন্ন রকম। তখন যে গুটি কয়েক সংবাদপত্র ছিল তার সবই সাধুভাষা ব্যবহার করত। সংবাদ সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে চলতি ভাষার প্রয়োগ শুরু করে। এটা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বলিতেছি, করিতেছি-এর স্থানে বলছি, করছি'র ব্যবহার তখনকার সময়ের চাহিদায় সংবাদ সংযোজন করেছিল। তাতে ভাষার যে আধুনিকতা তা পরিস্ফুট হয়েছিল। এর ফল হিসেবে আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সংবাদকে নিজেদের পত্রিকা বলে মনে করতে পেরেছিল, যা পরে অন্য পত্রিকার ভাগ্যেই জুটেছিল।

দৈনিক সংবাদ এই যে নানাভাবে নানা সময়ে সংবাদপত্র শিল্পকে সংগঠিত, সমৃদ্ধ, সংযোজিত এবং সুশোভিত করেছে তার পেছনে কাজ করেছে সেই সময়ের দেশের সবচেয়ে দক্ষ, মেধাবী, অভিজ্ঞ এবং সৃজনশীল একদল মানুষ। সেই গুণী মানুষেরাই বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে সবচেয়ে বেশি এবং সৃজনশীল অবদান রেখেছেন। তাঁরাই তাঁদের মেধা ও মননের ধারাবাহিকতায় সাংবাদিকতার পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মেধা-গুণে তৈরি হওয়া সাংবাদিকরাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা পেশা ও সংবাদপত্র শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এখনো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখনো তাঁদের হাতে তৈরি মেধাবী সাংবাদিকরা, এক অর্থে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিচরণ করছেন এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করছেন। এভাবে বলতে গিয়ে যেসব গুণী সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের নাম আমাদের সামনে চলে আসে, সময়ে-অসময়ে সাংবাদিকতা সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা বা কারও গুণকীর্তনের সময় যাদের কথা মনে পড়ে, এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, খায়রুল কবির, জহুর হোসেন চৌধুরী, সত্যেন সেন, রণেশ দাশ গুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ নূরুদ্দিন, তোহা খান, কেজি মুস্তাফা, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, সন্তোষ গুপ্ত, বজলুর রহমান, আউয়াল খান, তোয়াব খান, গোলাম সারওয়ার প্রমুখ। এই গুণীদের সবাই একসময় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দৈনিক সংবাদে অবদান রেখেছেন।

এসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির বাইরে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী দৈনিক সংবাদে নিয়মিত কলাম লিখেছেন। তাঁদের কলাম লেখার শুরুও হয়েছিল দৈনিক সংবাদে। সংবাদপত্রে কলাম লেখার যে ধারা এখন খুবই সমৃদ্ধ, একসময় সেই ষাট ও সত্তরের দশকে এ কলাম লেখার প্রচলন হয়েছিল দৈনিক সংবাদেই। সংবাদে কলাম লিখে একাধিক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী প্রায় কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। এটাও হয়েছিল দৈনিক সংবাদ তখন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রায় 'অবশ্য পাঠ্য' তালিকায় ছিল বলে এবং তখনকার সংবাদপত্র পাঠক সেসব কলামে ব্যক্ত মতামতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বলেই তারা প্রায় পাঠকের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন। সংবাদপত্রে কলাম লেখার সেই ধারা পরে আরও বিকশিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এখন কলাম লেখা সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেক অবদান রাখছে। আমরা যারা সংবাদে তৈরি এবং বর্ধিত বিকশিত তাদের জন্য আনন্দের যে, এই কলাম লেখার ধারা সংবাদই প্রথম শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে সেসব গুণী ব্যক্তির নাম সবার সামনে এসে আমাদের এই প্রজন্মের সংবাদকর্মীদের সম্মানিত করছে প্রতিনিয়ত।

আরেকটি ক্ষেত্রে দৈনিক সংবাদের অবদান ছিল প্রায় কিংবদন্তির মতো। তা হলো দৈনিক পত্রিকার পাতায় সাহিত্যচর্চার নতুন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত করা। এ কাজটি দৈনিক সংবাদ এতটাই সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছে যে, একপর্যায়ে অনেক লেখক দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে লেখা ছাপা হওয়ার কারণে গৌরবের অধিকারী হতেন, অন্য অর্থে বলা যায় 'জাতে ওঠা লেখক' হয়ে উঠতেন। এটা সংবাদের কৃতিত্বের একটি বড়ো অধ্যায় হয়ে আছে। অনেক লেখক 'লেখক' হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন কি না, তার কিছুটা নির্ভর করত তার লেখা দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়েছে কি না তার ওপর। এই অবস্থা দীর্ঘদিন, প্রায় দশকের পর দশক অব্যাহত ছিল। এ ধারা পরবর্তী সময়ে অন্য দৈনিক পত্রিকা অনুসরণ করে আরও বেশি সমৃদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করেছে হয়তো; কিন্তু সংবাদের সে ধারাকে পেছনে ফেলতে পারেনি। ভবিষ্যতেও দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সময় দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীর নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হবে। এটা এখন এক ধরনের কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে।

সংবাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সমৃদ্ধ প্রসঙ্গ চারিপাশে ভিড় করবে। সেটা কি সংবাদ লেখা, সংবাদ পরিবেশন এবং বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি– যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা– সবকিছুই শুরুর দিকে সংবাদের আলোয় আলোকিত হয়েছে। সে আলোর ঔজ্জ্বল্য আরও অনেক দিন আমাদের, বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগৎকে আলোকিত করে যাবে– সন্দেহ নেই।

লেখক: চিফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলাদেশে জনসংযোগ এখনো বিকাশমান পেশা

নূর ইসলাম হাবিব

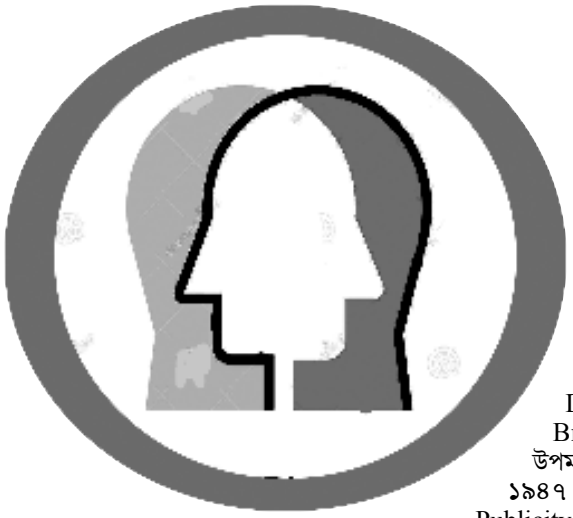

বাংলাদেশে আজকের যে জনসংযোগ পেশা, তার সূত্রপাত গত শতাব্দীর প্রথমদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন প্রতিষ্ঠিত হয় Board of Publicity, Central Board of Information (1921), Directorate of Public Information (1923), Directorate of Information and Broadcasting (1931). এর পথ ধরে উপমহাদেশে জনসংযোগ পেশার বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর প্রতিষ্ঠিত হয় Publicity Department. পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে প্রচার বিভাগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Public Relations Directorate. শব্দটি এই প্রথম চালু হলো এদেশে।

চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি প্রচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাজী দীন মোহাম্মদ, আব্বাস উদ্দীন, জসীমউদ্দিন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, সলিমুল্লাহ ফাহমী, জয়নাল আবেদিন, খায়রুল কবীর, নাজির আহমেদ, আবুল হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা এখনো বিকাশ পর্বে রয়েছে। এদেশে সময়ের বিবেচনায় এ পেশা খুব পুরোনো নয়। তারপরও বর্তমানে এ পেশা অনেক দূর এগিয়েছে। ... জনসংযোগ ও প্রচার মূলত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ও মুক্ত অর্থনীতির যৌথ ফসল। জনসংযোগ আপন বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমাদের দেশে বিশেষায়িত পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে

এযাবৎ কালের এসবই ছিল মাত্র সরকারি কার্যকলাপের বিবরণ জনগণকে জানানো। বর্তমানে জনসংযোগ বলতে যা বুঝি, তা তখনো শুরু হয়নি। ১৯৭২ সালের পর আবশ্য সমগ্র কর্মকাণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বতন্ত্র তথ্য মন্ত্রণালয়। এর অধীনে খোলা হয় স্বতন্ত্র দপ্তর– গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর। বেতার ও টেলিভিশন তো আগে থেকেই ছিল। এসব সংস্থায় বর্তমানে যারা কর্মরত, তাঁরা অবশ্যই আপন ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাজীবী, নিছক সরকারি কর্মচারী নন। প্রযুক্তি, কারুকৌশল, সুকুমার কলা, সৃষ্টিধর্মী উদ্ভাবন– এসব কিছুর পরিমিত ও আবেদনময় সমন্বয়ই আধুনিক

জনসংযোগ পেশার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশে জনসংযোগ ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ তথা গণযোগাযোগের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠছে এবং বিকাশ লাভ করছে।

পথিকৃৎ: বাংলাদেশে এ পেশার পথিকৃৎ হলেন সৈয়দ নুরুদ্দীন, খায়রুল কবীর, এটিএম মেহেদী, মোতাহারুল হক চৌধুরী, আবদুল ওহাব, মো. নুরুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম, আহমেদ কামাল, রকীব উদ্দীন আহমেদ, মজিবর রহমান ভূঁইয়া, এম এ খালেক ভূঁইয়া, সৈয়দ জাফর আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, ফয়জুল কবীর, তোয়াব খান (মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাবেক প্রেস সচিব ও সাবেক পিআইও), সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, আহমেদ জামাল, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ বদরুল হক, আনিস চৌধুরী, যাহিদ হোসেন, এম তাজুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ (সাবেক তথ্যমন্ত্রী) প্রমুখ।

নারী পথিকৃৎ: জনসংযোগ পেশা নারীর জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং। সংখ্যায় কম হলেও এ পেশায় নারীরা এগিয়ে আসছেন। স্বাধীনতার পর এ পেশায় যেসব নারী আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সাদেকা শফিউল্লাহ, হোসনেয়ারা বেগম, মরিয়ম খাতুন, রোকেয়া সুলতানা, রাবেয়া ইসমাইল, রাশিদা মহিউদ্দিন, নাজমা বিনতে আলমগীর, ফেরদৌসী সুলতানা, মেরিনা ইয়াসমিন, হাশিমা গুলরুখ প্রমুখ। সাদেকা শফিউল্লাহ সত্তরের দশকের পথিকৃৎ জনসংযোগবিদ। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্বকালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রচারকর্মে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। আরেকজন সফল নারী জনসংযোগবিদ নাজমা বিনতে আলমগীর। তিনি বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস অথরিটির (বেপজা) জেনারেল ম্যানেজার (জনসংযোগ) হিসেবে কর্মরত আছেন। আশির দশকের শেষের দিকে তিনি বেপজার জনসংযোগ বিভাগে যোগ দেন এবং নিজের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। আরেক নারী জনসংযোগবিদ হলেন ফেরদৌসী সুলতানা। তিনি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (জনসংযোগ) পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসরে যান। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির সহ-সভাপতি। অন্যতম পথিকৃৎ জনসংযোগবিদ মেরিনা ইসায়মিন মার্কিন দূতাবাসে প্রেস সেকশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা এখনো বিকাশ পর্বে রয়েছে। এদেশে সময়ের বিবেচনায় এ পেশা খুব পুরোনো নয়। তারপরও বর্তমানে এ পেশা অনেক দূর এগিয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এ যুগে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি জনসংযোগ পেশাও নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেশ, জাতি ও সরকারের সার্বিক সাফল্য বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে জনসংযোগ বিরাট ভূমিকা রাখছে। জনসংযোগ ও প্রচার মূলত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ও মুক্ত অর্থনীতির যৌথ ফসল। জনসংযোগ আপন বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমাদের দেশে বিশেষায়িত পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর জনসংযোগবিদকে বলা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ। জনসংযোগ আধুনিক পেশা। জনসংযোগ বাংলাদেশে মর্যাদাপূর্ণ পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পর দেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জনসংযোগ পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে। বর্তমানে জবাবদিহিতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের সাফল্য জনগণকে জানাতে চায়। দেশে পাস হয়েছে তথ্য অধিকার আইন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনসংযোগকর্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন, আকাশ সংস্কৃতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (Social Media) প্রতিটি সংস্থার কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। জনমতকে উপেক্ষা করে নয় বরং জনমত ও জনপ্রত্যাশাকে প্রাধান্য দিয়েই প্রণীত হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ কর্মকৌশল। ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে পেশাদার জনসংযোগকর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, বিমা, এনজিও, বিদেশি হাইকমিশন/দূতাবাস, বহুজাতিক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় জনসংযোগ বিভাগ রয়েছে। তাছাড়া বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলও জনসংযোগ বিভাগ খুলেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচারকাজের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রেস উইং। এছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর আছে একজন করে জনসংযোগ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সরকারের আছে একজন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আছে একজন প্রেস সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রয়েছেন একজন প্রেস সচিব ও একজন তথ্য উপদেষ্টা।

জনসংযোগ পেশাটি বিশ্বের অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন নামে অবিহিত হয়ে আসছে। Public Relations Officer, Communication Officer, Corporate Relations Officer, Information Officer, Media Relations Officer, Media Officer, External Affairs Officer, Public Information Officer, Corporate Communication Officer, Advocacy Officer নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ পেশা চালু আছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮০০টি প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ বিভাগ চালু আছে।

বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতি: জনসংযোগ পেশার মানোন্নয়ন, পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে কয়েকজন পথিকৃৎ জনসংযোগবিদের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালের ২২ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতি (Public Relations Association of Bangladesh– BPRA)। ২৫ সদস্যের সমন্বয়ে তখন গঠন করা হয় একটি কার্যকরী কমিটি। সাধারণ সদস্য ছিলেন ৯৬ জন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মো. নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ আহমেদ জামাল। নারী সদস্য ছিলেন পাঁচজন। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে প্রথম জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বিপিআরএ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক জনসংযোগ সমিতির তৎকালীন সভাপতি ভারতের শ্রী সনৎ লাহিড়ী যোগদান করেছিলেন। বিপিআরএ'র দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী প্রমুখ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে থাকেন।

বর্তমানে বিপিআরএ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন মোস্তফা-ই-জামিল এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আছেন মনিরুজ্জামান টিপু। জনসংযোগ সমিতির উদ্যোগের ফলেই ১৯৮২ সালে তৎকালীন তথ্য সচিব এবিএম গোলাম মোস্তফার উদ্যোগে একটি ডিও লেটার ইস্যু করা হয়। এতে জনসংযোগ পেশাকে বিশেষায়িত পেশা এবং জনসংযোগবিদকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি জনসংযোগ সমিতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

জনসংযোগ সংক্রান্ত প্রকাশনা: বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও জনসংযোগ পেশায় বিশেষজ্ঞদের লেখা সংবলিত একটি স্মরণিকা বের করা হয়। এটি সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। জনসংযোগ বিষয়ে কোনো সংকলন বা প্রকাশনা এটিই প্রথম।

শুধু প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যেই নয়, প্রায় প্রতিটি জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিপিআরএ একটি করে স্মরণিকা প্রকাশ করে আসছে। সেগুলোয় দেশ-বিদেশের জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের উন্নতমানের লেখা স্থান পেয়ে থাকে। ১৯৯৩ সালে সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের ভারত সফর উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়, যা সর্বমহলের প্রশংসালাভ করে। এসব স্মরণিকা জনসংযোগবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক জনসংযোগ সমিতি ও বাংলাদেশ: একসময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জনসংযোগ সমিতির সদস্য ছিল। এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ৪টি বিশ্ব কংগ্রেসেও যোগদান করে। এগুলো হচ্ছে– ১৯৮২ সালে ভারতের বোম্বেতে অনুষ্ঠিত নবম বিশ্ব কংগ্রেস, ১৯৮৫ সালে নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডামে দশম বিশ্ব কংগ্রেস, ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত একাদশ বিশ্ব কংগ্রেস এবং ১৯৯১ সালে কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বিশ্ব কংগ্রেস।

বাংলাদেশে জনসংযোগ শিক্ষা: বাংলাদেশে প্রধান প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসংযোগ বিষয়টি

পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত আছে। এক্ষেত্রে অগ্রপথিক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। ষাটের দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ বিষয়ে পাঠদান করে আসছে। এভাবে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত পেশাদার জনসংযোগবিদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংযোগ শিক্ষার পথিকৃৎ হলেন অধ্যাপক আতিকুজ্জামান খান, অধ্যাপক কিউএআইএম নুরুদ্দিন, অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান, অধ্যাপক ড. এম তৌহিদুল আনোয়ার, অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন, অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান এম আলী প্রমুখ।

খ্যাতিমান অধ্যাপক কিউএআইএম নুরুদ্দিন দীর্ঘ তিন দশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এমএ শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জনসংযোগ বিষয়ে পাঠদান করে গেছেন। সৃষ্টি করেছেন জনসংযোগ পেশায় শিক্ষিত পেশাদার জনসংযোগবিদ। জনসংযোগ শিক্ষার আরেক পথিকৃৎ অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দশক ধরে জনসংযোগ বিষয়ে পাঠদান করে যাচ্ছেন। অধ্যাপক ড. গোলাম রহমানও চার দশক ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসংযোগ বিষয়ে পাঠদান করে যাচ্ছেন। তবে বাংলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কারণে এ বিষয়ে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

জনসংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশে সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে চাকরিপূর্ব ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ তেমন নেই। এক্ষেত্রে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সরকারি সংস্থা হিসেবে জনসংযোগ বিষয়ে মাঝেমধ্যে কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এখন পর্যন্ত দেশে আলাদা কোনো জনসংযোগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া অনিয়মিতভাবে জনসংযোগের ওপর কোর্স পরিচালনা করে থাকে। জনসংযোগবিদদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে।

জনসংযোগ পেশার কতিপয় সমস্যা: বাংলাদেশে জনসংযোগ এখনো বিকাশমান পেশা হিসেবেই অগ্রসর হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে কিছু সমস্যার বিদ্যমানতা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় কোনো সংস্থায়ই সুস্পষ্ট জনসংযোগ বা যোগাযোগ নীতিমালা নেই। ব্যবস্থাপনার ভুলের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় রোধে তাৎক্ষণিকভাবে জনসংযোগের ব্যবহার করা হয়। এটিকে বলা যায় Fire Alarm Approach. যেমন আগুন লাগার পর ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকা হয়। ভুল সংশোধনের জন্য নয় বরং ভুল যাতে না হয়, সেজন্য জনসংযোগ বিভাগের পরামর্শ নিতে হবে।

বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাধারণত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, প্রকাশিত সংবাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা, সংশোধনী ও প্রতিবাদলিপির লেখক মনে করা হয়। এসব কাজের প্রয়োজনেই শুধু তাদের ডাকা হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সভায় তাদের ডাকা হয় না। আর ডাকা হলেও কথা বলার সুযোগ থাকে না। অথচ তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা, ভাবমূর্তি নির্মাণ ও জন-আস্থা অর্জনে শীর্ষ ব্যবস্থাপনাকে মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারেন।

কখনো কখনো জনসংযোগ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ও সাংবাদিকতায় অনভিজ্ঞ লোকজন চাকরি পেয়ে যান। তারা জনসংযোগ কাজে ব্যর্থতার পরিচয় দেন এবং কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তিনি কর্তৃপক্ষের ধমক খেয়ে অথবা ভুল করতে করতে জনসংযোগ পেশা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। এভাবে তারা এ পেশার মর্যাদাকে নিচু পর্যায়ে নিয়ে আসেন। তবে একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদপত্র মেধার বিকল্প হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, মেধা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক অধ্যয়ন জনসংযোগ পেশার জন্য অপরিহার্য।

কতিপয় সুপারিশ: বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও সংস্থাকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই সুসংজ্ঞায়িত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জনসংযোগ ও প্রচার নীতিমালা থাকতে হবে। যার লক্ষ্য হবে সংস্থার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা এবং সাফল্য ও ভালো কাজ জনসমক্ষে তুলে ধরা। জনসংযোগ কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে এবং দিতে হবে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রাধিকার, যানবাহন, প্রয়োজনীয় বাজেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি থাকতে হবে।

ভাবমূর্তি বা সুনাম বৃদ্ধির জন্য একতরফা যোগাযোগ করলেই চলবে না। জনমত জানতে হবে এবং তাদের Feed back নিতে হবে। এখানেই প্রয়োজন জনমত জরিপ ও গবেষণা। নিয়োগ দিতে হবে দক্ষ, যোগ্য, মেধাবী এবং এ পেশায় আগ্রহী ব্যক্তিকে, যারা ৯টা-৫টা অফিস সময়ের বাইরেও ২৪ ঘণ্টা কাজ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। জনসংযোগ কর্মকর্তাকে কোনো সত্য লুকানোর কাজে ব্যবহার না করে সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও সংস্থাকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই সুসংজ্ঞায়িত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জনসংযোগ ও প্রচার নীতিমালা থাকতে হবে। ... জনসংযোগ কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে এবং দিতে হবে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রাধিকার, যানবাহন, প্রয়োজনীয় বাজেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি থাকতে হবে

তথ্যসূত্র

১. মির্জা তারেকুল কাদের, বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশার বিকাশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা,
২. Professor QAIM Nuruddin, Abuses of Public Relations, Media, Dhaka University, 1990.
৩. রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, বিপিআরএ স্মরণিকা-২০০৪ এ প্রকাশিত বাণী
৪. মো. নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা, বিপিআরএ স্মরণিকা-২০০৪
৫. মির্জা তারেকুল কাদের, বিপিআরএ জনসংযোগের পটভূমি : আধুনিকতার উন্মেষ, কৌশল ও বিনিয়োগ, স্মরণিকা-২০০৪
৬. মির্জা তারেকুল কাদের, সম্পাদিত জনসংযোগ ও প্রকাশনা গ্রন্থে প্রকাশিত নিম্নে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলোর সহায়তা নেওয়া হয়েছে:
   ক) বাংলাদেশে জনসংযোগ –মির্জা তারেকুল কাদের
   খ) জনসংযোগ: মাত্র কয়েকটি কথা –নির্মল সেন
   গ) বাংলাদেশে জনসংযোগ –তোয়াব খান
   ঘ) বাংলাদেশে জনসংযোগ পেশা –মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
   ঙ) জনসংযোগ: মহিলাদের চ্যালেঞ্জিং পেশা –পারভীন সুলতানা
   চ) বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির ইতিহাস –মো. নুরুল ইসলাম

লেখক: সহকারী পরিচালক, আইএসপিআর

অটিজম সচেতনতায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

বিনয় দত্ত

অটিজম কী– এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেরই এখনো ভুল ধারণা আছে। এই ভুল ধারণার কারণে এখনো অটিজমের সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না অনেক শিশু। আমার ছোটোবেলার স্মৃতি দিয়েই শুরু করি। ছোটোবেলায় আমাদের এলাকায় দুই ভাইবোন ছিল। তারা দেখতে সাধারণ শিশুর মতো ছিল না। আমি প্রায়ই ভাবতাম, এরা এমন কেন? সেই ভাবনা ছোটো বয়সে কারও কাছে বলার সাহস পেতাম না। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন হতো। যখন আমরা খেলার মাঠে খেলতে যেতাম, ওই দুই ভাইবোন আসত। তাদের কেউই খেলায় নিত না। তারা এসে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করত। তারপর চলে যেত। তাদের দেখে আমার ভীষণ মায়া হতো। মায়ার পরিমাণ এতটাই বেশি যে, মাঝেমধ্যে কষ্টে কান্না পেত। কিন্তু কাউকে বলতে পারতাম না।

তাদের মুখ দিয়ে লালা পড়ত। হাঁটাও স্বাভাবিক ছিল না। হাতগুলো বাঁকানো। দাঁতগুলোও কেমন যেন, বেশ বড়ো। কিছুই স্বাভাবিক শিশুর মতো নয়। কথা বলার ভঙ্গি স্বাভাবিক ছিল না। মানে তারা যে শব্দ বলত, তা স্পষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে খুব জেদ করত। জেদের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। ওদের বাবা এসে ভাইবোনকে চড়থাপ্পড় দিয়ে নিয়ে যেতেন। তখন আরও মায়া হতো। ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেতাম, কিন্তু ছোটো বিধায় কিছু বলতে পারতাম না।

সময় বদলেছে। মানুষ এখন মুহূর্তেই অনেক কিছু জানতে পারছে। আমার দেখা নব্বইয়ের দশকের সেই রোগ এখন আমাদের কাছে অতি পরিচিত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ১৬ লাখ ৪৪ হাজার ৬০৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৭ হাজার ৪১৭ জন রয়েছেন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অটিজম কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। ... কখনো কখনো এত জেদ দেখায়, যা নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেক সময় একই শারীরিক ভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন বারবার করতে থাকে

এ দুই ভাইবোন সবসময় একসঙ্গে থাকত। তাদের আরও দুইজন যমজ ভাই ছিল। এ দু'ভাই বয়সে তাদের চেয়ে ছোটো। কিন্তু তারাও মাঝেমধ্যে এই বিশেষ ভাইবোনদের মারত। মাঝেমধ্যে দেখতাম একটা রুটি নিয়ে কীভাবে যেন খাচ্ছে। বোনটা কখনো হাসতে হাসতে আকাশের দিকে তাকাত। আকাশে তাকিয়ে মনে হয় হারিয়ে যেত।

এরা ঈদের সময় সুন্দর জামাকাপড় পরত। সেই জামাকাপড় পরে আবার রাস্তায় বসে পড়ত। মাটি বা ইট নিয়ে খেলতে বসে পড়ত। আমি বড়ো হতে হতে এদের আর দেখিনি। তারা আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যায়। নব্বইয়ের দশকের এই স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল। সেই সময় রোগের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলেও এখন এ রোগ সম্পর্কে আমি জানি। অটিজমে আক্রান্ত হয়েছিল তারা। আমার বিশ্বাস, সেই সময় তাদের বাবা-মা এ রোগ সম্পর্কে জানতেন না।

২. সময় বদলেছে। মানুষ এখন মুহূর্তেই অনেক কিছু জানতে পারছে। আমার দেখা নব্বইয়ের দশকের সেই রোগ এখন আমাদের কাছে অতি পরিচিত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ১৬ লাখ ৪৪ হাজার ৬০৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৭ হাজার ৪১৭ জন রয়েছেন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অটিজম কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। এটি মানুষের বিকাশজনিত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। শিশুর জন্মের পর তিন বছরের মধ্যে এ সমস্যা চোখে পড়ে।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ, আচরণ ও আগ্রহে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। অনেকেই শব্দ, গন্ধ, স্পর্শে বেশি সংবেদনশীল থাকে। নিয়ম অনুযায়ী কাজে ব্যত্যয় ঘটলে তারা রেগে যায়। কখনো কখনো এত জেদ দেখায়, যা নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেক সময় একই শারীরিক ভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন বারবার করতে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর বর্ণনা অনুযায়ী অটিজমে আক্রান্ত শিশুর ১০টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা
২. সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাব বিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা,
৩. একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি
৪. শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা
৫. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিঁচুনি,
৬. এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা,
৭. চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা,
৮. অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা,
৯. অসংগতিপূর্ণ হাসিকান্না,
১০. অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা।

এই দশটির বাইরেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন:
১. দেরিতে কথা বলাসহ উচ্চারণগত সমস্যা
২. চারপাশের অধিকাংশ বিষয়ে অনাগ্রহ বা সামান্য আগ্রহ
৩. আবেদন-উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়া, এমনকি বাবা-মা কোলে নেওয়ার পরও এমন হওয়া
৪. সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়া
৫. বেশি অস্বাভাবিকতার মধ্যে চোখের কাছে আঙুল কচলানো, হাততালি, লাফ দেওয়া, পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে হাঁটাহাঁটি
৬. কিছু শিশুর একদম চুপ থাকা।

এসব সমস্যা থাকলে সেই শিশুকে অটিস্টিক শিশু বা অটিজমে আক্রান্ত শিশু বলা যায়।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অটিস্টিক শিশু বেশ সম্ভাবনাময়। প্রতি ১০ জন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে একজনের ছবি আঁকা, গান, গণিত বা কম্পিউটারে প্রচণ্ড দক্ষতা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অটিস্টিক শিশু তাদের কর্মে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

৩. অটিজম সম্পর্কে সবারই সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। সেসময়ের বাস্তবতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম ছিল প্রগতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর একটি পদক্ষেপ। সেই ধারা অব্যাহত রেখে বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অটিজম নিয়ে কাজ শুরু করে। ২০০৮ সাল থেকে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল শিশুর অটিজম এবং স্নায়ুবিক জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার কাজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ায়। প্রথমে নিজ দেশ বাংলাদেশে এবং পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় তিনি কাজ করেন।

অটিজম সম্পর্কে সবারই সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ... ২০০৮ সাল থেকে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল শিশুর অটিজম এবং স্নায়ুবিক জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কাজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ায়। প্রথমে নিজ দেশ বাংলাদেশে এবং পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় তিনি কাজ করেন

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুলকে 'হুঅ্যাক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে। তাঁর উদ্যোগেই ২০১১ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় অটিজম নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনের পর গড়ে ওঠে সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক। সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্য, সামাজিক ও শিক্ষা সহায়তা দেওয়ার জন্য অবকাঠামো গড়তে কাজ করছে।

বর্তমান সরকারের উদ্যোগেই অটিজম সচেতনতায় বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ থেকেই অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও উন্নয়নে বাংলাদেশে আরম্ভ হয় এক নতুন পদযাত্রার। বিশ্বব্যাপী অটিজম মানচিত্রে জোরালোভাবে যুক্ত হয় বাংলাদেশ।

অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্কদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ২ এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে প্রতিবছর আমাদের দেশেও ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করা হচ্ছে।

এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সবার কাছে অটিজম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয় এবং অটিজম সচেতনতায় সচেষ্ট ভূমিকা রাখা হয়।

৪. অটিজম শিশুর পরিচর্যা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে অভিভাবকদের সচেতনতা, অটিজম সম্পর্কে দক্ষতার ফলে অটিস্টিক শিশুকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ এবং একাগ্রতা। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর পরিচর্যা, প্রস্তাব এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল:

১. অভিভাবকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ জরুরি
২. শিক্ষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্টসহ সবাইকে সম্মিলিতভাবে পরিচর্যায় অংশ নেওয়া
৩. কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য শিশুকে উৎসাহিত করা
৪. শুরুতে সাধারণ মূলধারার স্কুলে প্রেরণ
৫. স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও শিশুকে সামাজিক রীতিনীতি শেখানোর চেষ্টা
৬. সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুর অংশগ্রহণ
৭. শিশুর উৎসাহের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া, সেটির চর্চা করা (যেমন– ছবি আঁকা, গান গাওয়া, খেলাধুলা ইত্যাদি)
৮. প্রয়োজনে বিশেষায়িত স্কুলের সাহায্য নেওয়া,
৯. ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা (স্পিচ থেরাপি), প্রয়োজনে ইশারা ভাষা শেখানো,
১০. অকুপেশনাল থেরাপি (দৈনন্দিন কাজ, বৃত্তিমূলক কাজ ইত্যাদি শেখানো)
১১. সাইকোথেরাপি, সেনসরি ইন্টিগ্রেশন (সংবেদনশীলতা বাড়ানোর কৌশল) ইত্যাদি
১২. সমস্যা অনুযায়ী কিছু ওষুধ প্রদান, তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী
১৩. সার্বিকভাবে প্রচার-প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলা,
১৪. অটিজম আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যয় সর্বত্র একই রকম রাখা ও ওষুধের মূল্য হ্রাস করা জরুরি
১৫. সরকার থেকে আইডি কার্ড দেওয়া দরকার, যাতে হারিয়ে গেলে বা কোথাও কোনো বিপদে পড়লে সহযোগিতা পেতে পারে
১৬. আলাদা বিনোদনের ব্যবস্থা করা
১৭. সম্পত্তিতে অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া,
১৮. ঢাকার বাইরে জেলা ও গ্রামাঞ্চলে অটিস্টিক শিশুর জন্য চিকিৎসা ক্যাম্প করা জরুরি, যেখানে চিকিৎসকরা তাদের কাছে যাবেন
১৯. অভিভাবকহীন অটিস্টিক আক্রান্তদের জন্য আশ্রম গড়ে তোলা উচিত। যেখানে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকবে। এজন্য বেসরকারি উদ্যোগ নিলে জমি বরাদ্দ ও ভবন নির্মাণে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা প্রদান।

৫. অটিজম এমন একটি রোগ, যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তবে এটি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে অভিভাবক, সরকার এবং গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়ে নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো :

১. শিশুকে 'অটিস্টিক' নয়, বিশেষ শিশু বলা, তা গণমাধ্যমে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা
২. অটিজম আক্রান্ত শিশুর অভিভাবকদের কথা গণমাধ্যমে প্রচার করা,
৩. অটিজমে করণীয় কী, তা প্রচার করা,
৪. প্রতিবছর কী পরিমাণ শিশু অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে, তার শুমারি প্রচার করা
৫. কোনো বিশেষ অঞ্চল বা এলাকায় অটিজম আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়লে তার কারণ নির্ণয় করে জানানো
৬. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সপ্তাহে অন্তত একদিন প্রচার করা,
৭. শিশুর বিনোদনের জন্য বিশেষ কী ব্যবস্থা হতে পারে তা প্রচার করা
৮. 'অটিজম চিকিৎসা' বা 'অটিজম পরিচর্যা' শিরোনামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা,
৯. অটিজম আক্রান্ত শিশুর কোনো অনুষ্ঠান হলে তা আলাদা নজরে প্রচার করা,
১০. অটিজমে আক্রান্ত শিশু সমাজের বোঝা নয়, তা বিভিন্ন সংবাদে প্রচার করা।

গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা অটিজম সম্পর্কে সবার সচেতনতা যেমন বাড়াবে, তেমনি অটিজম আক্রান্ত শিশুর প্রতি সবার বিশেষ নজর থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, অটিজম এমন একটি রোগ, যার প্রতিকারে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান থেকে কাজ করতে পারি। একজন সচেতন মানুষ যেমন বিশেষ শিশুর সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে পারেন, একজন সাধারণ অভিভাবকও অটিজম আক্রান্ত বিশেষ শিশুর সঙ্গে আলাদা আচরণ করতে পারেন। একজন সাধারণ মানুষ, অভিভাবক, গণমাধ্যম এবং সরকারের সঠিক প্রচেষ্টা থাকলে অটিজমে আক্রান্ত শিশুর প্রতি আমাদের উদারতা, ভালোবাসা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

লেখক: সাংবাদিক, যমুনা টেলিভিশন

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তৃতীয় লিঙ্গ: সমাজ, গণমাধ্যম ও লিঙ্গ যোগাযোগ পাঠে কম উচ্চারিত এবং দুর্বোধ্য এক সত্তা

কামরুন নাহার

সমাজ মোটা দাগে দুই ধরনের লিঙ্গের মানুষের কথা বলে– স্ত্রী লিঙ্গ ও পুরুষ লিঙ্গ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ। যখন থেকে লিঙ্গ কী জেনেছি, তখন থেকেই নারী ও পুরুষ লিঙ্গের কথাই জেনেছি। আমাদের এলাকায় এক পরিবারে একটি সন্তান ছিল। দেখতে একেবারে ছেলেদের মতো, কিন্তু সে মেয়েদের পোশাক পরত এবং তাদের মতোই ছিল হাঁটাচলা, কথাবার্তা। এলাকার ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে খুব অবাক হয়ে দেখত। আমি তাকে একটু ভয়ও পেতাম। বড়োরা তাকে নিয়ে এন্তার মজা করতেন। তার নাম ছিল ইসমাইল। আমি যখন জানতে চাইতাম, ও আমাদের মতো কেন নয়? ওর সবকিছু এমন অদ্ভুত কেন? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ও হিজড়া। ও না-নারী, না-পুরুষ। তখন থেকেই তাদের ব্যাপারে আমার কৌতূহল ছিল। বড়ো হতে হতে আরও বেশকিছু জেনেছি এবং জানতে গিয়ে দেখেছি, এদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু যে বলা বা লেখা হয় আমাদের দেশে, তা নয়। কারণ এরা মূলস্রোতের বাইরের মানুষ। নারী ও পুরুষ– এ দুই লিঙ্গের মানুষের বাইরে এই যে ইসমাইলরা সমাজে আছে, যারা কিছুদিন আগেও বিশেষ করে

বাংলাদেশের হিজড়াদের কোনো নির্ধারিত থাকার জায়গা নেই। তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে তাদের ব্যাপারে তথ্যও খুব বেশি পাওয়া যায় না। ২০১৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ... ২০০০ সালে হিজড়ারা ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে বৈঠক করে। বাংলাদেশ সরকার ভোটিং লিস্ট ফর্মে তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্প্রতি

বাংলাদেশে যাদের আইডেন্টিটি ছিল না (এখনো খুব আছে তা নয়), তারা হলো তৃতীয় লিঙ্গ বা Third gender বা transgender। সমাজের প্রচলিত দুই ধারার বাইরের এই তৃতীয় ধারা, তৃতীয় লিঙ্গ মূলস্রোতে মেশার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে সেই শুরু থেকে, সর্বত্র। কেউ কেউ আংশিক সফল হয়েছে, কেউ কেউ আশ্বাসে দিন কাটাচ্ছে।

তৃতীয় লিঙ্গ কী

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের দুই লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যই থাকে। যেমন একই দেহে পুরুষ জননাঙ্গ এবং স্তন যেমন থাকতে পারে, তেমনি নারী জননাঙ্গ আছে

অথচ স্তন নেই– এমনও হতে পারে। কখনো কখনো আচরণে মেয়েদের মতো হয় ঠিকই, কিন্তু শারীরিক গঠন হয় একজন পুরুষের মতো অর্থাৎ শরীরে লোম থাকে, কাঁধ হয় চওড়া পুরুষালি এবং বুক হয় ফ্লাট। যেমন ইসমাইল। ও দেখতে ছেলেদের মতো চওড়া ছিল, কিন্তু আচরণ ছিল মেয়েদের মতো। বাংলাদেশে নারী তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা বেশি। এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম।

তৃতীয় লিঙ্গের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইতিহাস বলে, হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে আছে তৃতীয় লিঙ্গ। ইতিহাস অনুযায়ী, তৃতীয় লিঙ্গের ভূমিকা অনেক পুরোনো, যেটার প্রমাণ হাজার বছর আগের মিসরের ফারাও সভ্যতা থেকে পাওয়া গেছে। সে সময় তারা রাজপ্রহরী হিসেবে কাজ করত। এশিয়ার মুসলিম রাজা-বাদশাহ যেমন মোগল সাম্রাজ্যে কেউ কেউ উপদেষ্টা পরিষদে কাজ করার সুযোগ পেতেন, কেউ মসজিদের প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন, কেউ কেউ আবার সৈনিকের কাজও করতেন। হিজড়া এবং অন্যান্য নামে পরিচিত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ শত শত বছর ধরেই বিনোদিনী (বাইজি এবং যৌনকর্মী) হিসেবে পুরো পশ্চিমা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় কাজ করে আসছে।

বিভিন্ন দেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ একেক নামে এবং বিভিন্ন পেশায় বিরাজমান। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

হিজড়া

ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিজড়া হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ভারতে হাজার বছর ধরে হিজড়ারা আছে। তাদের নিয়ে নানা গাথা প্রচলিত আছে সনাতন ধর্মে। বলা হয়ে থাকে, সনাতন ধর্মের উর্বরতার দেবীর (Fertility Goddess) সঙ্গে হিজড়াদের একটা সম্পর্ক আছে। অন্যের স্বার্থে হিজড়ারা নিজেদের উর্বরাশক্তি (সন্তান ধারণ ও জন্মদান ক্ষমতা) উৎসর্গ করেছেন, যার কারণে তাদের কোনো বিবাহিত জীবন নেই এবং সন্তানদানেও তারা অক্ষম। হিজড়াদের বলা হয়, অর্ধ পুণ্যাত্মা (half sacred)। কোথাও নতুন বাচ্চা জন্মালে বা বিয়ে হলে তারা নেচে-গেয়ে নতুন বাচ্চা এবং নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে। তারা যেহেতু অর্ধ পুণ্যাত্মা এবং তাদের আশীর্বাদ কাজে লাগে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই তাদের আশীর্বাদকে সবাই সাদরে গ্রহণ করে এবং খুশি মনে টাকা-পয়সা বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে তাদের খুশি করে। কেউ তাদের অখুশি রাখে না। অখুশি রাখলে তাদের সন্তানের বা নবদম্পতির অমঙ্গল হতে পারে বলে মনে করা হয়। কারণ হিজড়াদের এই আশীর্বাদ সদ্যজাত সন্তানের সুস্বাস্থ্যে এবং নবদম্পতির সন্তান লাভে কাজে আসে বলে সমাজের একশ্রেণি বিশেষ করে ভারতের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে। আধুনিক সমাজে হিজড়াদের জীবনযাপন বেশ কঠিন, কারণ তাদের নির্ধারিত কোনো আয়ের পথ নেই। ট্রাফিক সিগন্যাল, বাজার, দোকান এবং রাস্তাঘাটে লোকজনের কাছ থেকে চেয়ে এবং বিয়েবাড়ি ও নতুন বাচ্চা হওয়া বাড়িতে নাচগান করে তারা যা উপার্জন করে বা উপহার হিসেবে পায়, তাতেই তাদের চলতে হয়। হিজড়াদের গুরু আছে, যার অধীনে তারা থাকে। গুরুর তদারকি এবং তাঁর অধীনেই নানা আচার-অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনে লিঙ্গ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাদের হিজড়া সমাজে দীক্ষা হয়। ২০১৪ সালে ভারতে হিজড়াদের সমাজে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হিজড়াদের জীবনধারণের চিত্রটা ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কিছু ব্যতিক্রম বাদে প্রায় একই রকম।

কোসেক ও টাভসান

ওরিয়েন্টাল নাচ বা চিফতেতেল্লি নামে যে টার্কিশ নাচ আছে, সেটা মূলত নারীর পোশাক পরে পুরুষরা নাচে। ওই নাচিয়েদের বলা হয় কোসেক ও টাভসান। এ নাচের উৎপত্তি অটোম্যান শাসনামলে। সেই সময় অপেক্ষাকৃত সুন্দর ছেলেরা নারী সেজে নাচত এবং অনেকেই এটা জানত না যে তাদের একটা দলও থাকত, যে দলে সাত বছর বয়স থেকেই ছেলেরা যোগ দিত। কারণ এ উত্তেজনাকর নাচে আয় হতো বেশ ভালো। নারীদের পোশাক পরে নাচগান করা এই ছেলেরা নিজেদের নারী হিসেবে দাবি করত না আবার ঠিক পুরুষ হিসেবেও পরিচয় দিত না। এরা ছিল মূলত তৃতীয় লিঙ্গ, যারা একই সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয় পরিচয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করত।

ওয়ারিয়াস

ইন্দোনেশিয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের নাম ওয়ারিয়াস, যাদের সিংহভাগ মুসলিম। এরা অনেকটা হিজড়াদের মতোই, যারা মূলত পুরুষ। তবে তাদের বিশ্বাস, তারা নারী এবং সেজন্য তারা নারীদের পোশাক পরে। প্রতিবছর মিস ওয়ারিয়াস ইন্দোনেশিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও তারা যে খুব ভালোভাবে সমাজে গ্রহণযোগ্য তা নয়। তারা সাধারণ মসজিদগুলোয় নামাজ পড়তে পারে না। তাই তাদের জন্য আলাদা মসজিদ আছে। সাধারণ চাকরিতে তাদের সুযোগ কম, যার কারণে একটা বড়ো অংশ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে।

ক্যাথোস

থাইল্যান্ডের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে বলা হয় ক্যাথোস। অধিকাংশ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষই যখন সমাজে কম আলোচিত, সেখানে এই ক্যাথোসরা ব্যতিক্রম। থাইল্যান্ডের পপ কালচারে এরা বেশ আলোচিত নাম। তারা একই সঙ্গে ক্রস ড্রেসার এবং ট্রান্সজেন্ডারড। সমাজে তাদের বিচরণটা এতই সাধারণ ও সহজ যে একটি স্কুলের নির্বাচনে দেখা গেছে, সেখানে ১০ ভাগ আছে ক্যাথোস শিক্ষার্থী। যদিও ক্যাথোসরা সব ধরনের সাধারণ চাকরির পাশাপাশি মিডিয়ায়ও কাজ করে এবং একটা বড়ো অংশ যৌনকর্মী। তথাপি সাধারণ মানুষ মনে করে, তাদের যৌনকর্মী হিসেবেই কাজ করা উচিত এবং অনেকেই তাদের চাকরিতে নিতে চায় না।

দ্য সোর্ন ভার্জিন

ভলকান অঞ্চলের আলবেনিয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের নাম সোর্ন ভার্জিন। এরা মূলত নারী, কিন্তু এরা সারা জীবন ভার্জিন এবং পুরুষ হিসেবে বেঁচে থাকার শপথ নেয়। এ শপথ নেয় তারা মূলত পরিবারের প্রধান হিসেবে। অনেক সময় যুদ্ধে একটি পরিবারের সব পুরুষ নিহত হলে দেখা যেত পিতৃতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কুমারী মেয়েরা পুরুষ হিসেবে বাঁচার শপথ নিত এবং এতে তারা বেশ খুশিই থাকত। অধিকাংশ সোর্ন ভার্জিনরা নারী হলেও এমনও ছিল, যারা না-নারী, না-পুরুষ অর্থাৎ এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এই লিঙ্গ এখন কম আলোচিত এবং প্রায় বিলুপ্ত হলেও ভলকান অঞ্চলে এখনো একটা অংশ বাস করে। মেক্সিকোর ওক্সাকা পল্লি অঞ্চলের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে বলা হয় মাক্সেস। এরা মূলত পুরুষ, কিন্তু নারীর পোশাকে নারীর মতো থাকতে ভালোবাসে। 'মুজের' শব্দ থেকে মাক্সেস শব্দের উৎপত্তি, যার মানে হলো 'নারী'। মাক্সেসদের অন্যতম একটা কঠিন কাজ ছিল বৃদ্ধ মা-বাবার দেখাশোনা করা। যেহেতু পরিবারের অন্য নারী এবং পুরুষদের নিজেদের সংসার থাকত, তাই মাক্সেসদের ওপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত।

হারমাফ্রোডাইট

নারী ও পুরুষের প্রাথমিক সব অথবা আংশিক যৌন বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে, তারাই হারমাফ্রোডাইট। এরা তিন ধরনের হয়– মৌলিক, নারী ছদ্মবেশী এবং পুরুষ ছদ্মবেশী। মৌলিকদের একই সঙ্গে পেনিস এবং ভ্যাজাইনা দুটিই আছে। নারী ছদ্মবেশীদের অভ্যন্তরীণ গঠন নারী জননাঙ্গের, কিন্তু বাইরের অর্গানটা পুরুষের আর পুরুষ ছদ্মবেশীদের ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গঠন পুরুষের, কিন্তু বাহ্যিক গঠন নারীর।

শিমেল

শিমেল হলো পুরুষ জননাঙ্গ সংবলিত রূপান্তরিত নারী। এরা পুরুষ হিসেবে জন্মালেও এদের আচরণ থাকে নারীদের মতো, যার কারণে এরা অপারেশনের মাধ্যমে নারীতে রূপান্তরিত হয়। অপারেশনের মাধ্যমে তারা স্তনের অধিকারী হয় অর্থাৎ পুরুষ জননাঙ্গ সংবলিত একজন নারীতে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অধিকার

বাংলাদেশের হিজড়াদের কোনো নির্ধারিত থাকার জায়গা নেই। তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে তাদের ব্যাপারে তথ্যও খুব বেশি পাওয়া যায় না। ২০১৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। বিবিসির জরিপে এদেশে হিজড়াদের সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো। যদিও সরকারি জরিপ মতে, এ সংখ্যা মাত্র ১৫ হাজার। এদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে নিয়ে এনজিওগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি কাজ করছে। ১৯৭০-এর শেষে এবং ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে তাদের ভোটের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা শুধু পুরুষ হিসেবে। ২০০০ সালে হিজড়ারা ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে বৈঠক করে। বাংলাদেশ সরকার ভোটিং লিস্ট ফরমে তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্প্রতি।

হাইকোর্ট ১৪ মে ২০০৯ কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাস্তায় নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন রোধে কিছু গাইডলাইনের উল্লেখ করলেও সেখানে তৃতীয় লিঙ্গের নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। ২০১৪-১৫ বাজেটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩৫টি জেলায় তাদের তৃতীয় লিঙ্গের কার্যক্রম বিস্তারে এবং ১৮ জনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের পদক্ষেপ নেয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সরকারি চাকরিতে আবেদনেরও আহ্বান জানিয়েছে।

ব্লগার ওয়াশিকুর রহমানের হত্যাকারীদের ২০১৫ সালের ৩০শে মার্চ লাবণ্য হিজড়ার সহায়তায় হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। ওয়াশিকুরকে হত্যা করে দুই হত্যাকারী জিকরুল্লাহ ও আরিফুল ইসলাম পালাচ্ছিল এবং পেছন পেছন পুলিশ 'ধর ধর, মানুষ মাইরা থুইয়া আইছে' বলে ছুটছিল। সবাই যখন আতঙ্কে দুই পাশে সরে তাদের রাস্তা করে দিচ্ছিল, তখন ২১ বছরের লাবণ্য দুই হাত দিয়ে দুজনের গেঞ্জি টেনে ধরে। লাবণ্যের সঙ্গে তার দুই সঙ্গী নদী ও চকোরিও ছিল। এরপর চারদিকে লাবণ্যের জয়জয়কার শুরু হয়ে যায় এবং নাগরিক সংহতি নামে একটি সংগঠন তাকে সম্মাননাও দেয়। লাবণ্যের সেই সাহসিকতার পর সরকার হিজড়াদের ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৫ সালে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা আজও হয়নি। ২০১৭ সালে সরকারের সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের আওতায় ৬ হাজার ৯৭০ জন হিজড়ার মাসিক ভাতা ২০১৭-১৮ সালে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। যদিও এর আগে যে ভাতা দেওয়া হতো, তার সুবিধাই অনেকে পেতেন না বা অনেকেই জানতেন না বলেই জানান। ২০১৫ সালের ৯ই জুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিজড়াদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অন্য ব্যাংকগুলোকে অনুরোধ করে। একটি বেসরকারি চ্যানেলে ইতোমধ্যে হিজড়াদের নিরাপত্তাকর্মী এবং অন্যান্য পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বেশ কজন হিজড়া আছেন, যারা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে হস্ত ও কুটিরশিল্পের কাজ শিখে এখন স্বাবলম্বী। আর সবচেয়ে আশার সংবাদ যেটা তা হলো, ২০১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যে পৌর নির্বাচন হয়, তাতে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন সুমি খাতুন এবং দিথি বেগম নামে দুই হিজড়া। ২০১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রথমবার রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী নাদিরা খানম মোবাইল ফোন প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে পত্রিকাগুলো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে ফোকাসের ব্যাপারে এগিয়ে। বিশেষ করে ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন, নিউ এজ এদের নিয়ে মোটামুটি যে ধরনের লেখালেখি করছে, তাতে এ শ্রেণির মানুষের ইতিবাচকভাবে সমাজে অবস্থানের অধিকারের যে বিষয়টি, অবশ্যই সেটিকে তুলে ধরে। বাংলা পত্রিকাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রতিদিন, কালের কণ্ঠের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনলাইন নিউজ মিডিয়াগুলোও তাদের নিয়ে সংবাদ করছে। টেলিভিশন খুব শক্তিশালী মাধ্যম। টেলিভশনেও তাদের কথা উঠে আসছে। তবে তা অপ্রতুল এবং আরও বেশি মাত্রায় ওঠে আসাটা সময়ের দাবি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লিঙ্গ যোগাযোগ পাঠে তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না, অথচ সময় এসেছে তাদের নিয়ে আরেকটু বেশি ভাবা, বলা এবং লেখার। আর নাটক-সিনেমা যা হচ্ছে, সেগুলোর সংখ্যাও আরও বাড়াতে হবে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিয়ে কোনো সিনেমার কথা বলতে বললে কমন জেন্ডার ছাড়া অন্য কোনো সিনেমার কথা মনে আসে না।

কোহিনুর নিউজ প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে মাভিয়া প্রথম খবর পাঠ করেন। ভারতে তৃতীয় লিঙ্গের নারীদের সুন্দরী প্রতিযোগিতাও হয়। বাংলাদেশের হিজড়াদের সামাজিকভাবে একটু কর্মসংস্থান এবং থাকার জায়গা নিশ্চিত করা গেলেই এ প্রান্তিক গোষ্ঠীটি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে।

তথ্যসূত্র

http://www.bbc.com/news/world-asia-34947543
https://www.pri.org/stories/2015-05-31/bangladesh-wants-third-gender-hijras-serve-traffic-police
http://www.daily-sun.com/post/56151/Transgender-Rights-Bangladesh-Style
https://www.hrw.org/news/2018/01/19/bangladesh-transgender-men-fear-their-safety
https://www.nytimes.com/2015/07/03/opinion/tahmima-anam-transgender-rights-bangladesh-labannya-hijra.html
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/05/07/tk100-hike-transgender-allowances/
http://www.thedailystar.net/op-ed/politics/celebration-the-third-gender-135667
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18568/Stenqvist-T-DP15%20final.pdf
https://opinion.bdnews24.com/2013/11/30/the-rights-of-transgendered-individuals-breaking-the-silence/
https://tribune.com.pk/story/1667984/1-first-transgender-person-becomes-news-anchor-pakistan/
http://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2017/12/20/respecting-their-rights/
http://www.thedailystar.net/advancement-of-transgenders-rights-55529
https://thediplomat.com/2018/01/bangladesh-adds-third-gender-option-to-voter-forms/
http://www.bbc.com/bengali/news/2015/12/151215_bangladesh_hijra_elections
http://www.bd-pratidin.com/city-news/2017/12/15/289161

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, পিআইবি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ও গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা

ধনঞ্জয় ঘোষাল

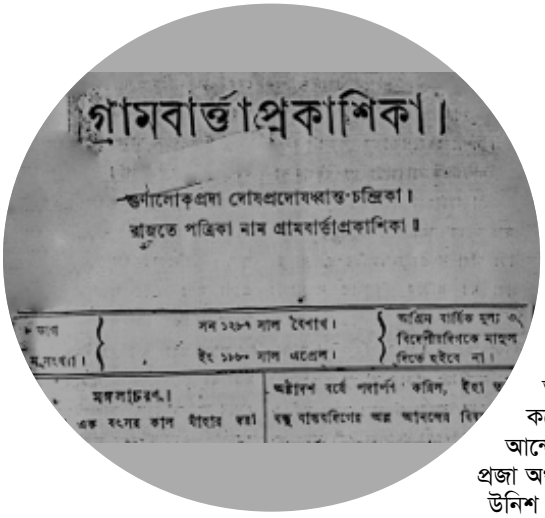
গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

স্বর্গালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।

রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

সন ১২৮৭ সাল বৈশাখ।
ইং ১৮৮০ সাল এপ্রেল।

জমিদার, মহাজন, জোতদার– এসব শ্রেণির নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। মূলত যাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়, তারা সমাজের উপরের তলার মানুষ। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তারা ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল, অন্যায়ভাবে শোষণ করেছিল কৃষক সম্প্রদায় ও প্রজাদের। আর যারা এই আন্দোলন সংঘটিত করেছিল, তারা দরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজা অথবা খেটে খাওয়া মানুষ অথবা কৃষক সম্প্রদায়।

উনিশ শতকের গণআন্দোলনে পাবনার কৃষকবিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাংলার গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তার আগেও কয়েকটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। যেমন– ১৮৩১ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসাত বিদ্রোহ, দুদু মিঞার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, ১৮৫৫ সালে সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ। এসব আন্দোলনের পরেই সংঘটিত হয় ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহ। ১৮৭৩ সালে পাবনার কৃষক বিদ্রোহ তেমনই একটি সংঘটিত আন্দোলন ছিল জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রকাশের শুরু থেকেই বিভিন্ন সময় বলে এসেছিল, জমিদারের সঙ্গে প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হলে কৃষক বা প্রজাদের দুরবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। ১৮৬৩ সালে যখন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয়, তার আগেই নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহ ও তার খবরাখবর সংক্রান্ত কিছু তথ্য গ্রামবার্ত্তার ১৮৬৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রকাশের শুরু থেকেই বিভিন্ন সময় বলে এসেছিল, জমিদারের সঙ্গে প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হলে কৃষক বা প্রজাদের দুরবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। ১৮৬৩ সালে যখন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয়, তার আগেই নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহ ও তার খবরাখবর সংক্রান্ত কিছু তথ্য গ্রামবার্ত্তার ১৮৬৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে যখন পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা বিশেষভাবে পরিচিত একটি কাগজ, প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেই গ্রামবার্ত্তা তার প্রজাবন্ধু পরিচয় লাভ করেছে ততদিনে। ফলত, ধীরে ধীরে জমিদারতন্ত্রের অত্যাচার প্রসঙ্গে

যখন পাবনা অঞ্চলের কৃষকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে, তার পক্ষে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা কীভাবে কলম ধরেছিল, এই বিষয়টিই এখানে অন্যতম আলোচ্য কর্তব্য। কলকাতা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাগজগুলোই বা কোন পক্ষ অবলম্বন করেছিল বা গ্রামবার্ত্তা থেকে কতখানি দূরত্ব তৈরি হয়েছিল কৃষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেটাও নজরে রাখা দরকার।

১৮৭৩ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ক্যাম্বেল। গ্রামবার্ত্তা তখন সাপ্তাহিকভাবে নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। গ্রামবার্ত্তার মুদ্রক তখন রতিকান্ত রায়। মথুরানাথ যন্ত্র ওই সময়েই কুমারখালিতে স্থাপিত হয় এবং গ্রামবার্ত্তা সেখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে গ্রামবার্ত্তা তখন প্রজাপক্ষের প্রতিনিধি। ধারাবাহিকভাবে জমিদারদের নির্মম শোষণের নানাবিধ দিক উল্লেখ করে গ্রামবার্ত্তা দেখিয়েছিল যে, প্রজাদের ক্রোড়ে জমিদাররা কিছুই রাখতে চায় না। নিঃস্ব হতদরিদ্র প্রজাদের কীভাবে শোষণ করে, রক্ত চুষে খাওয়া যায়, তা-ই ছিল জমিদারের মূল লক্ষ্য। যে কারণে জমিদার ও প্রজার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে বারবার দরবার করেছে গ্রামবার্ত্তা।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেটাই উনিশ শতকের গণআন্দোলনে পাবনার কৃষক বিদ্রোহ নামে পরিচিত। জমিদারদের বিভিন্ন ধরনের কর চাপিয়ে দেওয়া, জমি জরিপ করার ক্ষেত্রে তারতম্য বা কোনাকুনি মাপক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কৃষক সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও পায়। যদিও এই আন্দোলনের চরিত্রের অভিমুখ ঘুরে যায়, অন্যান্য অনেক মানুষের ইচ্ছাকৃত ধ্বংসাত্মক কাজকারবারের জন্য। সরকার আইন জারি করে। ১৮৭৩ সালে কীভাবে ও কী কারণে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার মূল জায়গাটি পাবনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা এখানে তুলে ধরা হলো।

১৮৭৩-এর কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি

১৮৭২-'৭৩-এ যে কৃষি সমস্যা উদ্ভূত হয়, তার সূত্রপাত ঘটেছিল সিরাজগঞ্জ সাবডিভিশনের ইউসুফশাহি পরগনা থেকে। সমস্যাদীর্ণ পরগণায় কিছু ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর ধরেই জমির প্রকৃত ভাড়া নিয়মিত আদায় করা হচ্ছিল না। কিন্তু জমিদাররা মাঝেমধ্যেই তার ওপর নানারকম বড় বড় পরিমাণের কর চাপিয়ে আদায় করা শুরু করেছিল। এবং এই ব্যবস্থা এত দীর্ঘদিন ধরে চলছিল যে আদায়ের কতটা প্রকৃত ভাড়া বা খাজনা, আর কতটা অন্যান্য কর তা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। যদিও আইন মোতাবেক খাজনা তখনই বাড়ানো যায়, যখন নিয়মিতভাবে প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে আইনানুগ নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তবু এসব ক্ষেত্রে ওইরূপ কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতো না। অথচ জমিদাররা, অন্তত তাদের অধিকাংশই, চেষ্টা করত অনিয়মিতভাবে মূল খাজনা বাড়াতে এবং ক্ষেত্রবিশেষ খাজনা ও করজুড়ে বিপুল পরিমাণে অর্থ আদায় করতে। তা ছাড়াও তারা স্থির করেছিল যে ওই আদায়ের ওপর বা বাইরে সরকার যদি কোনো কর আরোপ করে তবে তা রায়তদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে এবং কোনো রায়ত যদি এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, তবে তাকে জমি থেকে উৎখাত করা হবে। জমিদারদের এই অন্যায্য বর্ধিত আদায়ের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হলে এবং পথ কর আইনের (Road Cess Act) অধীনে, যে আইনে জমির খাজনা নিবন্ধীকৃত হতো, জেলার সীমানা বৃদ্ধির প্রস্তাব এলে জামিদাররা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তাদের অধীনস্থ ঠিকা চাষিদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো দাসখত লিখিয়ে নিতে সচেষ্ট হলো। ১৮৭২-এ বেশকিছু জমিদার এ প্রয়াসে সফলও হলো এবং দাসখতের শর্তাবলি রায়তদের পক্ষে অন্যায় রকম খারাপ হয়ে দাঁড়াল। এগুলো আংশিকভাবে নথিভুক্তও হলো, কিন্তু গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা নথিভুক্তিকরণের প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলল। যেহেতু জরিপের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপের একক ব্যবহৃত হতো না, এমনকি গ্রাম থেকে গ্রামে, পরগনা থেকে পরগনায় জরিপের ক্ষেত্রে মাপন দড়ির মাপ বদলে যেত, সারা বাংলাজুড়েই জমিদারদের সঙ্গে ঠিকা চাষিদের মতান্তর চলতেই থাকত, যা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। বিশেষ করে পাবনায় এই পরিমাপের একককে বৈষম্য অত্যধিক ছিল। সব জমিদারই সমান খারাপ ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই নিঃসন্দেহে অন্যায় চাপ দিয়ে অন্যায্য বর্ধিত খাজনা আদায় করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যেসব ক্ষেত্রে জমিতে ভাগচাষির সংখ্যা খুব বেশি ছিল, সেসব ক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা ও কায়দা আরও বেড়ে যেত। ভাগচাষিদের মধ্যে অন্তর্কলহ বাধিয়ে জমিদাররা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করত।[১]

প্রথম প্রথম রায়তরা অধিকাংশ চাহিদা সাধ্যমতো মেনে নিয়ে মিটিয়ে দিত। কিন্তু ক্রমশ দু-একটি মেনে না নেওয়া গ্রামের মানুষ আদালতে বিরোধিতা করে সাফল্য পেতে লাগল। একটি গ্রাম প্রথম থেকেই পৃথক ছিল। খাজনা বৃদ্ধির কিছু কিছু মামলায় মুন্সেফ আদালত জমিদারদের পক্ষে রায়দানের পরও আপত্তি জানিয়ে আবেদন করার পর আগের রায় খারিজ হয়ে যায়। একজন অপহৃত রায়তকে মুক্ত করা হয় এবং দোষী জমিদারকে শাস্তি পেতে হয়। এরকম নানা টুকরো সাফল্য বিদ্রোহের পথকে ত্বরান্বিত করে এবং অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হতে থাকে। সে বছর বসন্তে রায়তরা উপযুক্ত বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। জুন নাগাদ এই আন্দোলন সমগ্র ইউসুফশাহি পরগনায় ছড়িয়ে পড়ে। রায়তরা ধীরে ধীরে দলবদ্ধ হয়ে একজন বুদ্ধিমান ছোট জমিদারের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহী' হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে। তারা তাদের জোটবদ্ধতার সংবাদ শন্তিপূর্ণভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদেরও জানায়। 'বিদ্রোহীর রাজা' হিসেবে খ্যাত তাদের দলনেতার নাম ছিল ঈশান রায়। এই দলের উত্থাপিত শর্তাবলি ছিল খুবই গ্রহণযোগ্য, যেমন– পরিমাপের একককে বড় করে বিঘা হিসাবে ধরা এবং তাও খুবই সামান্য খাজনার বিনিময়ে। ফলত অন্যান্য নতুন গ্রামকে ডাকার প্রয়োজন ছিল না। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা করা হলেও প্রথমদিকে সেই চেষ্টা ছিল খুবই মৃদু।[২]

১৮৭২-'৭৩-এ যে কৃষি সমস্যা উদ্ভূত হয়, তার সূত্রপাত ঘটেছিল সিরাজগঞ্জ সাবডিভিশনের ইউসুফশাহি পরগনা থেকে। সমস্যাদীর্ণ পরগণায় কিছু ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর ধরেই জমির প্রকৃত ভাড়া নিয়মিত আদায় করা হচ্ছিল না। কিন্তু জমিদাররা মাঝেমধ্যেই তার ওপর নানারকম বড় বড় পরিমাণের কর চাপিয়ে আদায় করা শুরু করেছিল

১৮৭২-এর জুনের শেষার্ধে দলের আয়তন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দিকে দিকে চরেরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং গ্রামবাসীদের নানা বড় বড় উপদল তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী বদ চরিত্রের কিছু দুষ্কৃতি ও লুটতরাজের সুযোগ নেওয়ার মতলব নিয়ে এইসব জমায়েতে শামিল হতে থাকে। এই মতলবি সুবিধাবাদী ঠিকাদারদের সংখ্যা খুব কম ছিল না, ফলে কিছু বাড়িঘর পোড়ে এবং লুট হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও অন্যান্য কুকর্মের গন্ধও ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যদিও সেগুলো ছিল ভিত্তিহীন। এই বিদ্রোহ চলাকালীন সিরাজগঞ্জ সাবডিভিশনের কেউই গুরুতর আহত পর্যন্ত হয়নি, কোনো জমিদারের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি এবং তেমন কোনো মূল্যবান জিনিসও চুরি যায়নি। যা কিছু অপরাধমূলক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল, তার সবকটিই ঘটিয়েছিল সেই দুষ্কৃতকারীরা, যারা এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের সুযোগ নিচ্ছিল এবং মূল বিদ্রোহ ১৮৭৩-এর জুনের মাঝামাঝি শুরু হয়ে ৩ জুলাইয়েই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১ জুলাই পর্যন্ত ২৬৯টি গ্রাম লিখিতভাবে এই বিদ্রোহে শরিক হয়েছিল। তারপর থেকে দিনে ১০টি কি ১২টি করে আরও গ্রাম এতে যুক্ত হয়।[৩]

৪ জুলাই বাংলার সরকার নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ ঘোষণা প্রকাশ করেঃ
'দেখা যাচ্ছে পাবনা জেলায় জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং রায়তদের বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা তার বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে নানা জায়গায় দাঙ্গা ও ধ্বংসের উদ্দেশ্য নিয়ে বহুসংখ্যক মানুষের জমায়েত হচ্ছে এবং তার ফলে বিচিত্র গুরুতর শান্তিভঙ্গের পরিস্থিতি উদ্ভূত হচ্ছে। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া যাচ্ছে যে, একদিকে যেমন সরকার সকল জোর-জুলুমের থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর এবং জমিদারদের সমস্ত দাবি শুধু আইনের পথেই মেটানোর পক্ষপাতী, অন্যদিকে রায়তদের যে কোনো সন্ত্রাসমূলক ও বেআইনি কাজ সরকার কঠোর হাতে দমন করবে এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের, তা যেই শ্রেণিরই মানুষ হন না কেন, আইনানুগভাবে শাস্তি প্রদান করবে।

একত্রীভূত রায়ত ও অন্যদের তাই অনুরোধ করা হচ্ছে, জমায়েতে না ভিড়ে তারা যেন ব্যক্তিগত ও শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ জানায়। তারা যদি সেইভাবে আসে তাদের সমস্ত কথা ধৈর্য সহকারে শোনা হবে। কিন্তু সরকারি আধিকারিক দাঙ্গাবাজদের কথা শুনবেন না। বরং তারা তাদের প্রতি কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। জমিদারদের চাহিদার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে যেসব জনগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে, তাদের বুঝতে হবে যে তারা শেষ পর্যন্ত শুধু মহামান্য মহারানীর প্রজা। এইসব ব্যক্তি এবং তাদের অনুসরণকারীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে সরকার কখনোই আইন দ্বারা স্বীকৃত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং করবে না। এবং আইন অনুযায়ী তাদের কাছে প্রাপ্য অর্থ ন্যায্য প্রাপকদের হাতে তাদের তুলে দিতেই হবে। শান্তিপূর্ণভাবে জমিদারদের অন্যান্য অতিরিক্ত দাবির বিরোধিতা করার জন্য একত্রিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত, কিন্তু দাঙ্গা প্ররোচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া বেআইনি।'[৪]

যদিও এর দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট– শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, জেলায় মোতায়েনের জন্য অধিক সংখ্যায় পুলিশ পাঠানো হয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ মূলত দাঙ্গা ও বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে গণগ্রেপ্তার চলে এবং ১৪৭ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়। তাই বলে রায়তদের দলগুলো কিন্তু ভেঙে গেল না এবং আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকল পাবনা জেলার প্রায় সর্বত্র এবং বোগরায়। জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত দাবির বিনিময়ে রায়তরা যৎসামান্য করে অর্থ দিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের কাছে দীর্ঘ ও সমস্যাসংকুল আলোচনার মাধ্যমে উত্থিত নানা প্রশ্নের সমাধান না করে আইন প্রণয়ন করার কোনো পথ আর খোলা রইল না। তিনি প্রভাব খাটিয়ে ও পরামর্শ দিয়ে উভয়পক্ষকে সমঝোতায় আনতে সচেষ্ট হলেন। জমিদারদের অনুরোধ করা হলো রায়তদের বর্তমান বন্দোবস্ত ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিরিখে বাস্তবসম্মত শর্ত নিরূপণ করতে এবং রায়তদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হল সরকারি আধিকারিকদের অনুমোদন সাপেক্ষে সেইসব বাস্তবসম্মত শর্তাবলি মেনে নিতে। এই প্রচেষ্টা বেশকিছুটা সফলও হলো।[৫]

ইতোমধ্যে অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনার বাতাবরণও অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। জমিদারদের প্রতিভূরা সুরাহার অব্যবস্থার অবসানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি কমিশন বসানোর আর্জির মাধ্যমে সরাসরি হস্তক্ষেপ চেয়ে সরকারের দ্বারস্থ হলো। ভারত সরকারও এই প্রস্তাব দিয়েছিল। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল খাজনা সংক্রান্ত মামলাগুলোর নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগ করার বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি লক্ষ করেছিলেন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর বেশ সুন্দর সমাধান হয়ে যাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি জমিদার ও তাদের ঠিকা চাষিদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে বিচার করেছিলেন এবং যেহেতু ঠিক কত পরিমাণ খাজনা বাস্তবসম্মত তা নির্ধারণ করা প্রায় অসাধ্য ছিল, তাই তিনি সন্দিহান ছিলেন যে ঠিকা আইনের নতুন সংশোধন না করে এ বিষয়টিকে মেটানো যাবে কি না। বিশেষ কমিশন নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু জমিদার এবং ঠিকা চাষিদের মধ্যে দূরত্ব নিরসনের জন্য কমিশনার নিয়োগের তিনি বিরোধী ছিলেন বরং সামগ্রিকভাবে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে এই নিয়োগ হলে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত সেই বিশেষ কমিশনের নিয়োগ আর করা হয়নি। কিছুটা সমঝোতা, কিছুটা স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ এবং কিছুটা ১৮৭৩-'৭৪-এ আছড়ে পড়া দুর্ভিক্ষের ছায়ায় পাবনার সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে তখনকার মতো চাপা পড়ে গিয়েছিল। জমিদার ও ঠিকাচাষিদের মধ্যে সম্পর্কে দূরত্ব দুর্ভিক্ষের সময়ে কার্যত মুছে গিয়েছিল। ফলে খাজনাবিষয়ক বিকল্প চিন্তার বিষয়টিও মুলতবি হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৩-এর এই খাজনা সমস্যার সূত্র ধরেই অবশ্য পরবর্তীকালে এবিষয়ক আলোচনা ও ব্যবস্থা এগোয়। ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫-র বাংলা ঠিকা আইন (Begnal Tenancy Act of 1885) প্রবর্তিত হয়।[৬]

পাবনার কৃষক বিদ্রোহের রূপরেখা ছিল এই রকম। যে সময়ে পাবনায় কৃষকদের এই আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে, সেই সময়ে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা কীভাবে বিদ্রোহের খবর বা বিদ্রোহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও চিঠি মুদ্রণ করছে, দেখে নেওয়া যাক। ১৮৭২-এ 'জমিদার' নিবন্ধে অবশ্য জানিয়েছিল যে, 'জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ভূস্বামীর ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প...।'[৭] অর্থাৎ জমিদার মানেই খারাপ তা নয়, কিন্তু অত্যাচারী জমিদারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। জমিদারদের যারা কর্মচারী, তাদের আত্মীয়রা বেকার থাকলেই জমির জরিপ শুরু হয়। নির্বোধ জমিদাররা আমলাদের এই বৃদ্ধির কৌশল টের পায় না। ফলে জমি জরিপ করতে আদেশ দেয় জমিদাররা। আর সেই আমিনগণ একটু বাড়তি প্রণামি পেলেই 'বিশ করায় বিঘা নতুবা পনর কাঠায় বিঘা গণনা করেন।[৮] প্রজাদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল প্রায় স্বপ্নের মতো। প্রজাবিদ্রোহের আগুন যে ভেতরে ভেতের ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত জমিদারদের অত্যাচারের বর্ণিত কাহিনি থেকেই।

গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত বিদ্রোহী রাজসভার পরিচয়
Pabna District Gazetters-এ ঈশান রায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে। বিদ্রোহের সঙ্গে যারা সংযুক্ত ছিল, তাদের নামের তালিকা উঠে এসেছে গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত খবরাখবরে। সেখানে অবশ্য বিদ্রোহের নামে যুক্ত হয়ে যাওয়া 'ছোট লোক'দের কার্যকলাপকে সমর্থন করা হয়নি। প্রেরিত পত্রটিতে তৎকালীণ বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

প্রেরিত পত্র

পাবনা জেলার অধীন সাহাজাত পুর প্রদেশের প্রজাগণ, জমিদার দিগের উপর বিরক্ত হইয়া যে প্রকার বিদ্রোহিতারেণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। বিদ্রোহীর দল ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়া নানা স্থানে বিস্তার হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবল সাহাজাত পুরের অধীনস্থ গ্রামসমূহের প্রজাগণ এইরূপ বিদ্রোহী হইয়াছিল। এবার সিরাজগঞ্জ সাব ডিভিশনের অধীন যে কয়েক ষ্টেষণ আছে প্রায় তাহার সমুদায় প্রজাই ঐ প্রকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ধুলাই ষ্টেষণের কয়েকখানি গ্রামের লোক ও এইরূপ ক্ষেপিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই মুসলমান, চাঁড়াল এবং অন্যান্য জাতি। জমীদারকে খাজনা দিব না বলিয়া ক্ষেপিয়া ছিল, এবার তাহাদের দল বল ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা নানা প্রকার অনেক দ্রব্য লুঠ করিয়া পরিশেষে অগ্নি দিয়া কয়েক খানি ঘর পোড়াইয়াছে। সাহাজাতপুরের আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ লাহিড়ির বাড়ীতে ও অন্যান্য আরও কয়েকখানি বাড়ীতে পড়িয়া এই প্রকার লুঠ করিয়াছে। কোন কোন জমীদারের কাছারি বাটী দগ্ধ করিয়াছে। এপ্রকার দৌরাত্ম আরম্ভ করিয়াও শাস্তি ভোগ না করায় তাহাদের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। জমিদার মহাশয় দিগের এবার আর আহারনিদ্রা নাই, প্রজার দৌরাত্ম্যে কম্পমান হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণ কাছারী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কেহ২ পুলিশ ষ্টেশণে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সকল বিদ্রোহী প্রজা দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া কোন কোন জমিদারের কর্ম্মচারী সিরাজগঞ্জে নালিশ করিয়া ছিলেন, তাহাতে মোকদ্দমা অপ্রমাণ হেতু ডিস মিস্ ও ফরিয়াদির শাসন হওয়ায় বিদ্রোহীগণের আস্পর্দ্ধাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা তাহাদের দলের মধ্যে প্রকাশ করে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুকুম হইয়াছে জমিদারদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিলে প্রজার কোন অপরাধ হইবে না। এই অমূলক মিথ্যা জনরবে ছোট লোকের মধ্যে দুষ্কার্য্যে বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মিয়াছে। তাহাদের এই দৌরাত্ম্যের বিষয় পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট মান্যবর শ্রীযুক্ত মেঃ টেলার সাহেবের কর্ণ গোচর হওয়ায় তিনি স্বয়ং তদারকার্থে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। পরে যে রূপ হয় পাঠক বর্গ জানিতে পারিবেন। আমরা অবগত হইলাম বিস্তর ছোট লোক এই জোট বন্দিতে ভুক্ত হইয়াছে। ইহরা লাঠী, সরকী প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া লুঠ পাট করে, সুতরাং ... ইহাদের জোট ভঙ্গ না করিলে যে ইহারা ক্রমে ভয়নক অপরাধের কার্য্য করিতে সাহসী হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কেননা যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহাদের দ্বারা সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাহাদের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমাদের মনেও বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই জন্য প্রার্থনা করি, শাসন কর্ত্তৃগণ ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের শীঘ্র উপায় করুন। ইহাদের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে ধরিয়া শাসন

করিলেই দৌরাত্ম্য নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। প্রজাগণের উপর জমি বলিয়া হাতে খন্তা দেওয়া হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা, তা উচিৎ নহে।[৯]

পাবনার কৃষক বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহীদের তালিকাও প্রকাশ করেছিল গ্রামবার্ত্তা। 'ক্যাম্প নাকালিয়া, ৬ জুলাই' শীর্ষক খবরে গ্রামবার্ত্তা সবিস্তারে জানিয়ে দিল বিদ্রোহী রাজসভার তালিকা।

পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টেলর সাহেব নাকালিয়ায় ক্যাম্প করিয়া আছেন বিদ্রোহীদিগের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তদন্তে লুঠের অনেকদ্রব্য বাহির হইয়াছে। তাঁহার যে রূপ যত্ন দেখা গেল, একটু কী সত্বর হস্তে কার্য্য করিলে, বোধহয় লুঠের অধিকাংশ দ্রব্য পাওয়া যাইবেক এবং বিদ্রোহানল অবিলম্বে নির্ম্মাণ হইবে।

টেলর সাহেবের নিকট বিদ্রোহীরা ক্লাব ষ্টাব্লিসমেন্টের এক তালিকা কোন ব্যক্তি গুপ্তভাবে উপস্থিত করিয়াছে। তিনি তদনুসারে বিদ্রোহী রাজসভার ব্যক্তিগণকে ধৃত করিতেছেন। যাহারা ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে অনেক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রাজসভার তালিকার বিবরণ যাহা জানিয়াছি নিম্নে লেখা গেল।

বিদ্রোহী রাজসভার তালিকা

মহারাজ ঈশানচন্দ্র রায়	বিদ্রোহীর রাজা সাঃ দৌলাতপুর ষ্টেসন সাহাজাতপুর ।
খুদি মোল্লা	রাজমন্ত্রী, যবতলা-ষ্টেসন সাহাজাতপুর।
রোমজান সরকার	না এব, সাঃ ঢুলিয়া বাড়ি, ষ্টেসন ঐ। জাকের জোয়াদ্দার গোমস্তা, সাঃ আড়কান্দি। ষ্টেঃ-ঐ
শম্ভুনাথ পালসাঃ	মেঘুল্যা, সুপারিনটেনডেন্ট মৌপুর।
রহিম প্রামাণিক	সর্দ্দার, সাঃ হোড়দিঘলীয়া।
হাজারি প্রামাণিক	পাইক, সাঃ রূপণী
অরবিন ম্রেধা	সাঃ মহারাজ পুর।
মন্দীর সরকার	জরিপ আমিন, সাঃ হাতকোড়া।
জগৎ ভৌমিক	জজ আমিন, সাঃ ঐ
গঙ্গাচরণ পাল	ছড়াসাগরের পশ্চিমপারের শাসনকর্ত্তা, সাং রুদ্র গাতি।

গঙ্গাচরণ পালের অধীন কর্ম্মচারীগণের নাম প্রকাশ হয় নাই। বড়ল নদীর দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান কর্ম্মচারীগণের উপাধি প্রকাশ নাই। সৈন্যাধ্যাক্ষর মধ্যে কয়েক জনের নাম ফর্দ্দে আছে তাহা নিম্নে নাগডেরার বাজু সরকার ও ছালু সরকার ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান কার্য্যকারক। খরিদা সেখ সাঃ আমশ, দ্বিতীয় বাটী চড়া চিথলিয়া।

মাণিক সেখ	সাঃ ভিটা পাড়া
কাঞ্ছিয়া সেখ	রাঘা বাড়ী
ছালু সরকার, রাজু সরকার	সাঃ ডেমরা
হরিনাথ বিশ্বাস ও মথুর সরকার	হাল মোঃ উল্লাপাড়া-দেলবর মুনসীর বাড়ীর কার্য্য কারক কেহ অনুভব করে, ইহারা গঙ্গাচরণের অধীন লোক, গ্রাম– গ্রাম বিদ্রোহীর জোটনা কারক।

টেলার সাহেবের ওয়ারেন্ট অনুসারে মৌ পুরের আউট পোষ্টের হেড কনষ্টেবল মদন ঘোষ কর্ত্তৃক বিদ্রোহীর মহারাজা ঈশানচন্দ্র রায় ধৃত হইয়াছেন। ইহাকে ধৃত করিতে হেড কনষ্টেবল বাবু বিশেষ অধ্যবসায়, যত্ন ও বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এবং একটুকি কষ্টও পাইতে হইয়াছিল। শুনিলাম ইহার এই কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া টেলার সাহেব ইহাকে সব্ইনস্পেক্টারি পদে উন্নীত কর নার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র রায় এক্ষণ নাকালিয়া মোকামে টেলার সাহেবের নিকট আছেন, দেখিয়া আসিলাম। ইনি ধৃত হইলে, নোলেন সাহেব ইহার বাড়িতে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েক খানা পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে।

ইহাকে গ্রেপ্তার করার সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিলাম ইনি ধৃত হইলে ইহার স্ত্রী প্রকাশ্যরূপে বলিলেন, "পরিণামে আপনার এদশা ঘটিবে জানিয়া পূর্ব্বে নিষেধ করিলে শুনেন নাই, এখন দাসীর কথা ফলিল। আপনি চলিলেন কিন্তু এখন দেশে জমীদারগণ যে আমাকে মুসলমানের সঙ্গে নিকা দিবে তাহার উপায় কি?' "ব্রাহ্মণ কন্যার এই অনুশোচনা বাক্য শুনিয়া দেশের জমীদারগণ শুনিলাম, যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন।

পাবনার কোতোয়ালির ইনস্পক্টর বাবু গুরু গোবিন্দ সিকদার, টেলার সাহেবের ওয়ারেন্ট অনুসারে বিদ্রোহী দলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শম্ভু নাথ পালকে ধৃত করিয়াছেন। শুনিলাম অনেক চেষ্টায় না পাইয়া পরিশেষে কনষ্টেবল দ্বারা নোলেন সাহেবের নামোল্লেখ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ধরা হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি যে শম্ভুনাথ পালের নিকট যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ অমুক স্থানের লুটের মাল অমুককে দিবা, ওমুক স্থানে অমুক তারিখে লুট করিয়া, অমুককে এই কার্য্যের ভার দিয়া ইত্যাদি আদেশ বিশিষ্ট। পত্রগুলো দেখিতে পারি নাই। সুবিধা হইলে পরে দেখিয়া পাঠাইবার যত্ন করিব। রাজমন্ত্রী খুদি মোল্লার অনুসন্ধানের জন্য দুইজন কনস্টেবলসহ গালার পাথালিয়া সরকার টেলর সাহেব কর্ত্তৃক ছদ্মবেশে প্রেরিত হইয়াছে। প্রেরিত ব্যক্তির নাম কেহ বলিতে পারিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি আকারে দীর্ঘের পরিমাণ অপেক্ষা পরিসরে কিছু অধিক এজন এদেশ ব্যবহারিক ভাষায় 'পাখালিয়া' শব্দে খ্যাত উল্লিখিত কয়েক ব্যক্তিই সিরাজগঞ্জ সাব-ডিবিজনের নোলান সাহেবের এলাকাধীন, কিন্তু এটী বড় লজ্জার কথা, যে ডিষ্ট্রিকট মেজেষ্ট্রেট যত্ন করিয়া ইহার দিগকে গ্রেপ্তার করিতেছেন। নোলান সাহেবের এটা কার্য্যের শিথিলতা কি অসাবধানতা তাহা তিনিই জানেন।

টেলর সাহেবের এইসকল কার্য্য দেখিয়া, এতদিনে নোলেন সাহেবের চৈতন্য উদয় হইয়াছে। শাকতোলার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইতে অস্বীকার হওয়ায় যে সকল বিদ্রোহী তাহাদিগদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল নোলেন সাহেব তাহাদের ৪ চারিজন প্রজাকে ৩ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাস, ৬০ টাকা জরিমানা, না দিলে আর ১ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, ১২ জন অপরাধী বিচারাধীনে আছে। শাকতোলার বিচার ঐ পর্য্যন্ত করিয়া তিনি পোতাজিয়া আসিয়া ছিলেন। ২০ আষাঢ় তারিখের পত্রিকায় যে পাতিয়াবেড়া লুঠের কথা প্রকাশ হইয়াছিল, সেই ঘটনার কষ্টভোগী নায়েব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার দয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পাতিয়াবেড়া লুঠের তদারকে যাইবেন বলিয়া পোতার্জিয়া হইতে জমিয়তার লুঠের তদারকে গিয়াছেন। টেলর সাহেবও ৭ই জুলাই তারিখে সাগরকান্দী গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের বাড়ি তদারক করিতে গমন করিবেন। এই অবকাশ নোলেন সাহেবের কাছারি দেখিয়া আসিয়া সবিশেষ লিখিতেছি।

গোপাল নগরের তদারকে পাবনার ডিস্ট্রিক্ট ডিপুটী মেজেস্টার অমর নাথ বাবু নিযুক্ত আছেন। পোগাল নগরের প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছিল শুনিলাম সেরূপ আর কোন স্থানে হয়নাই, অথচ এতদারকে যেরূপ লঘু হস্ততা দেখান আবশ্যক ছিল তাহা হইতেছে না। নানা স্থানের লোকে একত্রিত হইয়া লুঠ করিয়াছে। এক স্থানে বসিয়া মৃদুভাবে তদারক করাতে দৌরাত্ম্যকারিগণ সতর্ক হইয়া লুঠিত দ্রব্যাদি গোপন করিবার সময় পাইতেছে। বিলম্ব হইলে সমুদায় দ্রব্য পাওয়ার কোন সম্ভব নাই। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম বিদ্রোহি গণ লুঠ করিয়া যে সকল দ্রব্য লইত, গমনকালে তাহার কিছু গোপন করিত না। পেঁচাখোলার কালাচাঁদ লাহিড়ী উকীলের বাড়ী লুট করিয়া সোনার পাঁচলহরী মালা প্রভৃতি অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রকাশ্য ও নিঃশঙ্ক ভাবে গিয়াছিল গোপাল নগর হইতে, বান্ধান হুঁকা ও চাঁদির ফুরশী হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে, ছাতি মাথায় জুতাপায়, পিরাণ গায় দিয়া ধীরে২ গিয়াছিল। বিদ্রোহীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে বাটীতে লুঠের ফরাশে তাকিয়া লাগাইয়া বসিত। এ প্রদেশ জলে প্লাবিত হইয়াছে, সুতরাং লুঠের দ্রব্য গোপনকরা বিদ্রোহিদিগের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

আর শুনিলাম বিদ্রোহী রাজার নাম এত বিখ্যাত হইয়াছে যে, ফরিদপুর জেলা হইতে কয়েক জন প্রজা, বিদ্রোহী রাজার হুকুমনামা লওয়ার জন্য কিছু উপঢৌকন সহ আসিয়াছিল। রাজা হুকুমনামা দিতে অস্বীকার হওয়ায় তাহারা বলিয়া গিয়াছে "কর্ত্তা আমাদিগকে পায় ঠেলিলেন কিন্তু আমরা আপনার নাম লইয়াই বিদ্রোহী হইব।" রাজসাহী জেলা হইতেও কয়েকজন আসিয়াছিল। রাজা তাহাদিগকে বলেন "তোরা গর জেলার লোক, আমি হুকুম দিতে পারিনা। তোরা আপন জেলায় একটা রাজা করিয়া নে গিয়া। গত সংখ্যক পত্রিকায় গঙ্গাচরণ পাল প্রভৃতির ছয় মাস ফাটক ৫০ টাকা জরিমানা হওয়ার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে তাহাদের ফাটক হয় নাই, তাহারা ছয়মাসের মধ্যে কোন অত্যাচর করতে পারিবেন না। এই করারে ৫০/৫০... মুচলেকা দিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। অমৃতবাজার[১০]

অমৃতবাজার পত্রিকার নাম উল্লেখ ছিল গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত এই অংশটির নিচে। স্বভাবতই উপরিউক্ত ঘটনাটি অমৃতবাজার অনুসারে গ্রামবার্ত্তায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই মুদ্রিত অংশে বিদ্রোহী রাজসভার তালিকা প্রদত্ত ছিল এবং যা লেখা রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, প্রজাদের ক্ষিপ্ত পরিস্থিতি ও লুটতরাজের বর্ণনাও রয়েছে। গ্রামবার্ত্তায় এই অংশটি মুদ্রণ হয়েছিল ঠিকই, পরে গ্রামবার্ত্তার সাপ্তাহিক একটি সংখ্যায় অমৃতবাজারের প্রতি বিপক্ষ মত জানিয়ে গ্রামবার্ত্তা বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব যুক্তি তুলে ধরেছিল। গ্রামবার্ত্তার ১৮৭৩-এর সাপ্তাহিক সংখ্যাগুলোতে বিদ্রোহ সম্পর্কে অন্যান্য কাগজের থেকে প্রাপ্ত খবর মুদ্রণ দেখা গেছে। ক্রমশ যখন বিদ্রোহ তার নিজস্ব রূপধারণ করে, তখন গ্রামবার্ত্তা নিরপেক্ষ হয়ে বিদ্রোহ সম্পর্কে শুরু করেছিল প্রতিবেদন ও খবর রচনা। যেখানে প্রজাদের এই জেগে ওঠাকে গ্রামবার্ত্তা স্বাভাবিক মনে করেছিল। প্রজাপীড়নের ফলেই এই আগুনের উৎপত্তি।

অমৃতবাজারের খবর ছাড়াও পিপ্‌লস ফ্রেন্ডের খবর প্রসঙ্গে গ্রামবার্ত্তা বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরেছিল এভাবে–

> পাবনা ও সিরাজগঞ্জে প্রদেশীয় প্রজাগণ জমীদারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে। এই বিষয় কোথাও ভীষণাকার কোথাও অন্য প্রকার মুর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্বাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ও লোক পরম্পরায় আন্দোলিত হইতেছে। আমরা উক্ত বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনা না করিয়া পিপ্‌লস্‌ফ্রেণ্ড (প্রজাবন্ধু) যাহা লিখিয়াছেন, প্রজাবৎসল আমাদিগের লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর মহামতি কেম্বেল বাহাদুর যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ও পাবনা প্রদেশ হইতে আগত পত্র এস্থলে প্রকাশ করিলাম।
>
> পিপ্‌লস ফ্রেণ্ড লিখিয়াছেন "জমীদারেরা প্রজাগণকে দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতে এবং তাহার দিগের প্রতি সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুতঃ তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থের প্রতিই কেবল দৃষ্টি রাখেন। ধর্ম্মোপদেশরহিত কতকগুলি অশিক্ষিত জমীদার ন্যায় কিংবা অন্যায়াচরণ, যে কোন প্রকারেই হউক, আপনাদিগের কোষ পূর্ণ করিতে এবং আপনাদিগের ইচ্ছা অত্যাচার দ্বারা বলবতী রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা ভরসা করি যে, এই সমুদয় বিষয় যখন প্রকাশিত হইবে তখন কোন২ জমীদার নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইবেন। জমীদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায় প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গাম করিতেছে অতএব সাধারণ প্রজার শান্তি রক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐরূপে জমাইতবস্ত হইতে দেওয়া না হয়। এবং জমীদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্তভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমীদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার প্রজা, তাহা গ্রাহ্য যোগ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমীদার দিগের উপর গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমীদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সেজন্য বহু লোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইনসংগত নহে। গবর্ণমেন্ট আইনানুসারে জমীদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন।" এই বিদ্রোহিতায় আপাতত অনেক অনিষ্ট হইলেও ইহাদ্বারা একটী বিশেষ উপকার হইবে। অনিয়মিত অবৈধ কার্য্যকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রথমে প্রজাগণের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।[১১]

প্রজাবিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও গ্রামবার্ত্তার ভূমিকা

অন্যান্য কাগজের সূত্রে প্রাপ্ত খবর, প্রেরিত পত্র ইত্যাদি গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হয়েছে পাবনার বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। কিন্তু বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে গ্রামবার্ত্তা ওয়াকিবহাল হয়ে জানিয়েছিল যে জমিদারের অত্যাচার কতখানি ভয়ংকর হলে প্রজারা উপায় না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এটাই তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে প্রজাদের বিদ্রোহকে গ্রামবার্ত্তা সমর্থন করে এই প্রতিবেদনের এক জায়গায় লিখেছিল, 'যে সকল প্রজা গরুর মতো প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে।'

এক্ষেত্রেও সব জমিদার যে কর চাপিয়ে প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এমন নয়। গ্রামবার্ত্তা প্রকৃত অনুসন্ধান চেয়ে ভালো ও খারাপ উভয় জমিদারকেই চিহ্নিত করা উচিত মনে করেছিল।

'পাবনা প্রদেশীয় ক্ষিপ্ত প্রজাগণ, জমীদার এবং গবর্ণমেন্ট' প্রতিবেদনে জানিয়েছিল–

> প্রজাদিগের ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এতাবৎ এতদিষয়ক কোন কথা মুখদিয়া বাহির করি নাই। এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষ অবদান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে, লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, সেস্থলে, মানুস ক্ষেপিলে যে অত্যাচার করিবে, ইহা কি আর আশ্চর্য? প্রজালোকের ক্ষিপ্ততার কারণানুসন্ধান করা, কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষ যদি আশ্বাস বাক্যে সান্তনা না করিয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাগণের প্রতি দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, ইহারা শান্তি লাভ দূরে থাকুক বরং অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। অতএব ... ন্যায় শোচনীয় ঘটনাও ঘটিতে পারে। আমাদিগের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ... শান্তিস্থাপন হইবে। কিন্তু তাহা প্রজা ও জমীদারের পক্ষে কত দূর ফলোপদায়ি, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আদেশটী ফিরাইলে"... উল্টাইলে, লাঠি এই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। কিছুই স্পট নহে। যাহা হউক আমাদিগের লেপটেনান্ট গবর্ণর ... যেমন প্রজাবন্ধু তাঁহার আদেশ তদ্রুপ ... হইয়া প্রজা জমীদারদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিলেই আমরা যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ লাভ করি। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেছেন, "আপনাদিগের হস্তে কর বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকাতে, অপরিণামদর্শী কুৎক্ষামোদর অনেক জমীদার, দেশ কালপাত্র বিচার না করিয়া অসম্ভব করবৃদ্ধি করেন। যত দিন উদরান্নে কষ্ট উপস্থিত না হয়, প্রজারা তত দিন সহ্য করে, অন্নের অভাব দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যার তার প্রতি, অত্যাচার করিয়া থাকে। আমরা এই বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, সকল জমীদার ও সকল প্রজা দুষ্ট নহে, প্রজা ও জমীদারের মধ্যে ভাল মন্দ লোক আছে। গবর্ণমেন্ট, কমিশানর নিযুক্ত করিয়া, নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, ভাল জমীদার ও ভাল প্রজা পৃথক এবং দুষ্ট জমীদার ও দুষ্ট প্রজাশাসন করুন। সকল গোলযোগ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, অন্যথা গোলযোগে শাসন করিলে, সৎ জমীদার ও সৎ প্রজাও কখন দণ্ডিত হইবে এবং অসৎ জমীদার ও অসৎ প্রজাও বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইবে। বস্তুতঃ গবর্ণমেন্টের সহিত জমীদারদিগের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, প্রজার সহিত জমীদারদিগের তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে গোলযোগ একবারে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।
>
> দশ আইনের সৃষ্টি অবধি, প্রজা ও জমীদারের সহিত, এরূপ গোল যোগের কথা কখন শুনা যায় নাই। আমরা রথ্যাকরের সূত্রপাত হইতে বলিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেন্ট জমীদারের নিকট যে রথ্যাকর গ্রহণ করিবেন, অনেক জমীদার ছল বল কৌশলে এবং নানা অবৈধ উপায়ে, তাহা প্রজার নিকটেই আদায় করিবেন, নিজ তহবিল হইতে দিবেন না। বোধ হয় অনেক জমিদার রথ্যাকর প্রদানের পূর্ব্বে সংস্থনার্থ কিংবা বাজে জমা .... থাকিবেন। .... প্রজাদিগের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের যে প্রকার বিশ্বাস আছে, তাহাতে যদি কর্ত্তৃপক্ষ ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মেঃ ওয়েলস সাহেবকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে, তিনি অবশ্য, এই গোলের কারণ আবিষ্কার করিতে পারিবেন এবং গবর্ণমেন্টেরও এই গোলযোগ নিবারণ অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠিবে। মহাকবি কালিদাস ও গুরূপদেশে

অন্যান্য কাগজের সূত্রে প্রাপ্ত খবর, প্রেরিত পত্র ইত্যাদি গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হয়েছে পাবনার বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। কিন্তু বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে গ্রামবার্ত্তা ওয়াকিবহাল হয়ে জানিয়েছিল যে জমিদারের অত্যাচার কতখানি ভয়ংকর হলে প্রজারা উপায় না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এটাই তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে প্রজাদের বিদ্রোহকে গ্রামবার্ত্তা সমর্থন করে এই প্রতিবেদনের এক জায়গায় লিখেছিল, 'যে সকল প্রজা গরুর মতো প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে'

> বিশ্বাস করিয়া ছিলেন, মনুষ্যের শৃঙ্গ এবং আকাশে পুষ্প হয়না আমাদিগেরও তদ্রুপ বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালী প্রজা কখন বিদ্রোহী হয় নাই' এবং হইবে না। গবর্ণমেন্ট এবং জমীদার, লেবু চট্‌কাইয়া নিরীহ বঙ্গবাসিদিগকেও তিক্ত ও বিরক্ত করিয়া, ক্রমে বিদ্রোহী করিলেন। যে সকল প্রজা গরুর মত প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহার হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে। প্রজারা মর্ম্মাঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে, কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।[১২]

১৮৭৩-এর জুনের সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তায় উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি থেকে বোঝা যায়, গ্রামবার্ত্তা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যুক্তিসংগতভাবে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। গ্রামবাংলার জমিদাররা যে অত্যাচারী এবং তাদের অত্যাচারের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেই যে প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়েছে, এই কথা স্পষ্ট করে গ্রামবার্ত্তাই জানিয়েছিল। কোনো জমিদারের মুখ রক্ষার দায় ছিল না গ্রামবার্ত্তার। জমিদারদের যে চরিত্র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শহর কলকাতার অন্য অনেক পত্রিকার সম্পাদকই তা প্রত্যক্ষ করেননি। ফলে জমিদারদের অত্যাচারের সীমা কতদূর গেলে নিরীহ প্রজা রুখে দাঁড়ায়, পাবনার বিদ্রোহেই তা স্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য সব জমিদার খারাপ নয়। সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে গ্রামবার্ত্তা যথার্থ অনুসন্ধানের অনুরোধ জানিয়েছে। এক্ষেত্রে দুষ্ট প্রজার অন্যায় কাজকে গ্রামবার্ত্তা প্রশ্রয় দেয়নি। যদিও গ্রামবার্ত্তা এই বিদ্রোহের কারণকে অল্প অত্যাচারের ফল নয় বলেই ঘোষণা করেছে সংশয়হীনভাবে।

গ্রামবার্ত্তার দপ্তরে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ চলাকালীন বিভিন্ন ধরনের চিঠি এসেছে। প্রজাবিদ্রোহ সম্পর্কিত চিঠি মুদ্রণ করে গ্রামবার্ত্তা সাহসী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। প্রজারা অত্যাচারে ভুক্তভোগী। প্রজারা প্রত্যক্ষভাবে জমিদারের নিপীড়ন সহ্য করে, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য যে সংবাদদাতার চেয়েও বেশি গ্রাহ্য, তা গ্রামবার্ত্তা বুঝেছিল বলেই পাবনার প্রজাবিদ্রোহ সম্পর্কিত একাধিক পত্র মুদ্রিত করেছিল। সেসব চিঠির সূত্র ধরেই বিদ্রোহের সূচনা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

গ্রামবার্ত্তায় সেই সময় বিভিন্ন পত্রদাতা বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখে পাঠাতেন। সেই রকমই একটি চিঠি থেকে বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে জানা যাবে– এমন কথাই জানাল গ্রামবার্ত্তা। পত্রদাতার নাম প্রকাশ হয়নি। পত্র শেষে লেখা, 'আমি একজন'। এই ধরনের চিঠিপত্র প্রকাশ করে গ্রামবার্ত্তা জানিয়ে দিয়েছিল যে, প্রেরিত পত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষরূপ জানা যাচ্ছে। এই চিঠিতে জমিদারের অত্যাচার যে সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল, সে কথাই স্মরণ করে দিয়েছে আবার।

প্রেরিত পত্র

পাবনা জেলাার অধীন সাহাজাতপুর

> স্টেশনের নিকটস্থ প্রায় ৩০০ গ্রামের প্রজা জমীদারদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল প্রজা এক বিঘা জমীতে এক টাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছিল; কিন্তু জমীদার মহাশয়গণ তাহাদের নিকট নানা প্রকার বাজে জমায় ১৷৷ টাকা হারে কর আদায় করায় ও তাঁহা দিগের অন্যায্য উৎপাতে প্রজারা বিরক্ত হইয়া "জমীদারকে খাজানা দিব না" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিলাম তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে যাইয়া অনান্য প্রজাদিগকে প্রলোভন দ্বারা দল বৃদ্ধি করিতেছে। জমীদার মহাশয়গণ এখন মস্তকে হস্ত দিয়া "কত ধানের কত চাউল" গণনা করিতেছেন। অনেকে কাকুতি, মিনতি করিয়াও প্রজাদিগকে বশ করিতে পারিতেছেন না। শুনিলাম প্রজাগণ কালেক্‌টরিতে নিয়মিত খাজানা দাখিল করিতে চাহে। বাস্তবিক মফস্বলের অনেক জমীদার আজ কাল যে প্রকার প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপায়হীন প্রজাগণ সহজেই ক্ষেপিয়া উঠে। যেদিন তাঁতি বন্দের জমীদারগণ প্রজা পীড়ন করিয়া বাজে জমা আদায় করিতে চারিদিকে অন্ধকার আর তাহার মধ্যে জোনাকী পোকা দেখিতে ছিলেন। পরে বহু অর্থ ব্যয়ে বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া অনেক ক্লেশে একরূপ অব্যাহতি পাইয়াছেন। কিন্তু শুনিলাম, এতেও তাঁহাদের লোভের শেষ হয় নাই। আমরা তাঁহা দিগকে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"[১৩]

পাবনার বিদ্রোহের নিমিত্ত কমিশন নিযুক্ত করা উচিত। এই কমিশনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং কমিশন কাদের নিয়ে গঠিত হবে, সেই খবর জানিয়ে গ্রামবার্ত্তা ১৮৭৩-এর জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই প্রথম পাতায় তা প্রকাশ করে। এই দীর্ঘ প্রতিবেদনে বারবার গ্রামবার্ত্তা প্রজাদের অসহায়তাকে দেখাতে চেয়েছে। এবং জমিদারেরা তাদের অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাও গ্রামবার্ত্তা স্পষ্ট করে জানাতে ভোলেনি। করের পিঠে কর চাপিয়ে প্রজাদের ক্রমশ বিপর্যস্ত করে তোলা, জমি জরিপের নামে অন্যায়ভাবে তাদের টাকা আত্মসাৎ করা এসব তো ছিলই। এই কমিশন নিরপেক্ষভাবে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করুক, এটাই ছিল কাম্য।

গ্রামবার্ত্তা কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে জানাল–

> পাবনা প্রদেশের গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানার্থ একটি কমিসন নিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কারণ তাহা হইলে প্রজা এবং জমীদার উভয়ের পক্ষেই যে মঙ্গল হইবে এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ, দয়াবান গবর্ণমেন্ট যদি একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে যে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে? বিশেষতঃ মহামান্য ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ প্রজাবৎসল, তাহাতে প্রজাদিগের প্রতি যে সুবিচার হইবে এবং প্রজাগণ এত দিন পরে যে অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, ইহা অসম্ভব নহে। কে না জানে যে প্রজাগণ-কৃষকগণ– চির অত্যাচারিত; কে না জানে, অনেক সময়ে তাহারা যথা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া মুক্তি পায় না। কে অত্যাচার করেন? গবর্ণমেন্ট না বড় লোক? গবর্ণমেন্ট যে প্রজারক্ষক হইয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিবেন তাহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে; তাহা হইলে প্রজা কি এতদিন রক্ষাপাইত? এবং তাহা হইলে সভ্যতম গবর্ণমেন্টে কি কলঙ্ক স্পর্শ করিত না? তবে বড় লোক ইহারা কে? হয় জমীদার না হয় ব্যবসায়ী। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণ অতি নিরীহ, তাহারা প্রায় কাহারও প্রতি অত্যাচার করেনা। কিন্তু আমরা শুনিতে পাই যে প্রায়ই জমিদারগণ প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। এমন কি শিক্ষিত জমিদারগণেরও দুর্নাম আমরা সময়ে২ শুনিতে পাই। তবে যে শিক্ষিত মান্য জমীদারগণ স্বয়ংই অত্যাচার করেন এমন কথা আমরা বলি না। তাঁহাদের কর্ম্মকারক সেই অত্যাচারের মধ্যে থাকিলে, আমরা জমীদারকেই সেই দোষে লিপ্ত করিব। আমাদের কোন মান্যবর সহযোগী বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত কমিসন নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাতে একজন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারজজ সভাপতি হইবেন এবং তাহাতে গবর্ণমেন্ট, জমীদার ও প্রজাগণের প্রতিনিধি থাকিবেন তাহা হইলে নিয়মিত মত উচিত অনুসন্ধান হইবে। আমরাও এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করি। কিন্তু প্রজাগণ মুর্খ ও দরিদ্র। তাহাদের মনোগত ভাব এবং দুঃখ অবগত হইবার নিমিত্ত একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। গবর্ণমেন্টকেই কোন নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী লোক দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। নতুবা শুদ্ধ তাহাদের প্রতিনিধির উপর নির্ভর করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। প্রতিনিধি কাহাকে বলে, মুর্খ প্রজারা তাহা অবগত নহে। যে ভাল মুখে দুটী মিষ্টকথা বলে, তাহাকেই তাহারা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করে। এবং সেই জন্যই অনেক গোলযোগে ও বিপদে পতিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়াই যে প্রজারা অসরল এবং অবাধ্য ইহা কেহই বলিতে পারেবে না। প্রত্যুতঃ বঙ্গীয় প্রজাগণের ন্যায় শান্ত, প্রভুভক্ত আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগের লেঃ গবর্ণর বাহাদুর প্রজাবৎসল। ইহাতেই যে তিনি প্রজাগণের পক্ষে, জমীদারের পক্ষে নহেন, ইহা কে বলিবে? তিনি ন্যায়ের দিকে। পিতা, দুঃখী পুত্রের দুঃখে দয়ার্দ্র হইলে অন্য পুত্রগণকে স্নেহ করেন না, ইহা কি কখন বলা যাইতে পারে? একারণে কেহ তাঁহাকে পক্ষপাতী মনে করিতে পারেন না। পাবনার গোলযোগের সময় লেঃ গবর্ণর যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তন্মধ্যে প্রজাগণের উপদেশস্বরূপ একটী বাক্য ছিল যে, জমীদারকৃত রাজবিধিবহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ জন্য সকলে শান্তভাবে একত্রিত হওয়ায় কোন নিষেধ নাই" অর্থাৎ তাহা আইন বিরুদ্ধ নহে। এই কথাতে আমাদিগের প্রধান সহযোগী তাঁহার উপর অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছেন। তিনি ইহাতে যাহা আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। তিনি কি এদেশীয় প্রজাগণের ভাব জানেন না। "ছেড়েদেমা কেঁদে বাঁচি" স্কুলে ইহাদের শিক্ষা। মারিয়া ছেড়ে দিলেই ইহারা মহোপকার জ্ঞান করে। ইহারা এপ্রকার মুর্খ যে কি প্রকারে দুঃখের প্রতিবিধান করিতে হয়, তাহার কিছুই অবগত নহে। এমত অবস্থায় তাহাদিগকে অত্যচার হইতে মুক্তির উপায় প্রদর্শন না করিয়া চিরকাল দুঃখসাগরে নিমগ্ন রাখা কি দয়াবান গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য? উক্ত বাক্যে ক্যাম্বেল সাহেব যথার্থ প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সহযোগী বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে শ্রমজীবি দলের মধ্যে সময়ে২ গোলযোগ হয়। সেদিন কুইনের ফারমের শ্রমজীবিগণ বেতন বৃদ্ধি এবং অল্প পরিশ্রমের জন্য ধর্ম্মঘট করে, তাই বলিয়া কি গ্ল্যাডস্টোন সাহেবের এরূপ বলা উচিত যে, বেতন বৃদ্ধি এবং অল্প পরিশ্রমের জন্য মহারাণীর ফারমের শ্রমজীবিগণের শান্তভাবে একত্রিত হওয়া আইন বিরূদ্ধ নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের প্রজাগণ কি সমান? ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সাহস, জ্ঞান এবং বীর্য্য ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের ন্যায়? ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ যখন আপনাদের অবস্থা সম্যক অবগত হইবে এবং বুঝিতে

পারিবে তখন কি এরূপ অত্যাচার তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে? তখন ভারতবর্ষের আর একদিন উপস্থিত হইবে। দারগার লোক বলিলে যাহাদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা যে মহারাণীর ফারমের শ্রমজীবিগণের স্বরূপ, ইহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। জমীদারগণ যে অতিরিক্ত কর আদায় করেন, তাহা আইন বিরূদ্ধ, হয়ত অনেক প্রজাই জানে না। এমত স্থলে তাহাদের সত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য তাহা, কে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহারা যদি জমীদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে, আমরা কেবল মহারাণীবিকটোরিয়ার প্রজা তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এসম্বন্ধে জমীদারদিগের প্রতি গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমীদারগণের উপরেও যে ক্যাম্বেল সাহেবের দয়া আছে, তাহার কি উক্ত কথাতে প্রকাশ পায়না? সুতরাং আমরা বলি ক্যাম্বেল সাহেব কাহারও পক্ষে নহেন, ন্যায়ের পক্ষে। এই নিমিত্তই আমরা জ্যৈষ্ঠের ৪র্থ সপ্তাহের গ্রামবার্ত্তায় বলিয়া ছিলাম, ক্যাম্বেল সাহেবের আদেশ ফিরাইলে লাঠী উল্টাইলে কোতকা,, ইহার তাৎপর্যও এই যে, জমীদার ও প্রজা যিনি কেন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য না করেন তাঁহার পক্ষেই উক্ত আদেশ কোতকা স্বরূপ, যিনি সৎ হইবেন, তাঁহার পক্ষে লাঠী অর্থাৎ আশ্রয় হইবে।'[১৪]

বিদ্রোহ চলাকালীন লুটপাট, ঘরদোর জ্বালানো ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর রেখে গ্রামবার্ত্তায় জনৈক প্রজাহিতৈষীর একটি চিঠি ছাপা হলো। তাতে প্রজাদের অহেতুক বা আইন লঙ্ঘিত বাড়াবাড়ি না করাই শ্রেয়, এমন কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। গ্রামবার্ত্তায় সেই চিঠিতে গভর্নমেন্টের প্রতি ভরসা রাখার ইঙ্গিতও পাওয়া গেল। চিঠিটি নিম্নরূপ–

ভাই প্রজা সকল। তোমরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ, এটী কিন্তু উচিত নহে। এত বাড়াবাড়ি তোমরা কোন মতেই ভাল করিতেছ না। তোমাদিগের পাবনা জেলার প্রজাগণ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়াছ, বোধ করি না। তবে শুন।

তোমরা যে ভাবিয়াছ মহারাণীর খাস প্রজা হইবে, সে আশা একেবারেই পরিত্যাগ কর। গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, আইন মত যাহার যাহাতে স্বত্ব আছে আমরা তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবনা এবং করিবও না। তোমাদিগের জমীদারের তোমাদিগের নিকট উচিত খাজানা লইতে (বেসি খাজানা নহে, বরাবর যাহা দিয়া আসিতেছ এবং যাহা সেই জমীদার ডিগ্রি করিয়াছে বা আদালতে গেলে ডিক্রি করিতে পারে) অধিকার আছে। অতএব গবর্ণমেন্ট যে জমিদারকে বঞ্চিত করিয়া সেই ক্ষমতা স্বয়ং লইবেন না, তাহা তাঁহারা গেজেট প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট আরও বলিয়াছেন "আইন মত যে যাহার নিকট যাহা দায়িক আছে, তাহার তাহা পরিশোধ করা উচিত" জমীদার তোমাদিগের যাহার নিকট যাহার ন্যায্য মত পাইবে, তাহা সে আইন মতে পাইতে পারে, জমীদার বরাবর তোমাদিগের যাহার নিকট যে খাজানা পাইয়া আসিতেছেন, আদালতে গিয়া দাঁড়াইলে অবশ্যই তিনি তাহার ডিক্রি পাইবেন। এবং তখন গবর্ণমেন্টেকে বাধ্য হইয়া তোমাদিগের ঘর বাড়ি, ঘটি বাটী বেচিয়া জমিদারের টাকা দেওয়াইতে হইবে। অতএব গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, যে জমীদার যাহার নিকট যাহা পাইবে, প্রজার কর্ত্তব্য, এখনই তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করুক। অথবা তিনি না লয়েন পাবনার আদালতে তাহার আমানত করিয়া দিউক। নচেৎ (সাবেক ১০ আইন) নুতন ৮ আইনানুসারে সুদ ও খরচাতেই তোমরা মারা পড়িবে। জমীদার একেবারে কিছুতেই যাইবে না এবং তোমাদিগকে তাহার খাজানাও তাহাকে দিতে হইবে। তবে গবর্ণমেন্ট এইমাত্র বলিতেছেন, তোমরা বেশি খাজানা দিওনা। সদর গবর্ণমেন্ট আরও বলিতেছেন, তোমরা পরামর্শ করিবার নিমিত্ত বা অন্য কোন ভাল কর্ম্মের নিমিত্ত জোটবন্দি হইতে পার কিন্তু জোট বন্দী হইয়া অত্যাচার ও কাহারও প্রতি পীড়া জন্মাইলে পুলিষ তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া জেলখানায় দিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বাধ্য হইয়া তোমাদিগকে ফাটকে দিতে হইবে। যদিও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে থাকে তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন কিন্তু, বাপু সকল! তখন তিনি কার্য্যে কিছুই করিতে পারিবেন না। কারণ, তিনি আইনের বাধ্য। আইন তাঁহাকে যাহা বলিবে, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের নিকট আমরা অনুরোধ করিতেছি, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তোমরা আবার ক্ষেপিয়া উঠিয়া দেশ সুদ্ধকে বিপদে ফেলিও না। তোমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার হইয়াছে তোমরা শান্ত হইয়া গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত কর। প্রতিকার লাভ করিবে। আমরা জানি, ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মেঃ ওয়েল্‌স সাহেব বড় প্রজা হিতৈষী। তোমরা গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়া তাঁহাকে পাবনায় আন। কারণ, আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি, তাঁহাকে আনিতে পারিলে, তোমাদিগের সকল দুঃখই দূর হইবে। আমরা পুনরায় কহিতেছি, যে ব্যক্তি উচিত মত যাহা পাইবে, তাহার তাহা ফেলিয়া দাও এবং যে২ বিষয়ে তোমাদিগের নালিশের কারণ আছে, তাহা গবর্ণমেন্টকে জানাও। নিতান্ত একগুঁয়ার মত কাটাকাটি করিয়া আপনিও মরিও না এবং অন্যকেও মারিওনা। যদি ফের লুঠ পাট্ কর, ঘরাদি জ্বালাইয়া দেও, গোরা আসিয়া তোমাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে।

জনৈক প্রজা হিতৈষী।[১৫]

প্রজাপক্ষের হয়ে কেউ কেউ চিঠি পাঠাতেন। গ্রামবার্ত্তায় তা ছাপা হয়েছে। তেমনি জমিদারদের পক্ষ থেকেও চিঠি পেয়েছিল গ্রামবার্ত্তা পাবনার বিদ্রোহ বিষয়ে। সেই চিঠিও মুদ্রিত হয়েছে যত্ন সহকারে। সাপ্তাহিক সংবাদের সেই চিঠিটি এখানে তুলে ধরা হলো–

পাবনা জেলার গোলযোগ।

আমাদের একজন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় জমীদারদিগের পক্ষ হইতে উপরোক্ত গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা সমাদরে তাহা এইস্থানেই গ্রহণ করিলাম।

জমীদারদিগের প্রতি প্রচলিত ১৮ ইঞ্চের হাত ন্যূন করিয়া, অল্প পরিমাণের হাত ব্যবহার করা অভিযোগ হইয়াছে। এইটী নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব্বে কি প্রকারের হাত পরগণায় প্রচলিত ছিল তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। জমীদারেরা ন্যূনকরিয়া কি পরিমাণের হাত স্থিরীকৃত রাখিয়াছে ও কতদিন হইতে ঐ হাত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাও দেখা অনুচিত নহে। তদ্বিপরীতে মেঃ নোলান সাহেবের রিপোর্ট ও আদালতেও প্রচুর প্রমাণ আছে, এরূপ চিহ্ন দেখা যায় যে প্রায় গত ৪০ চল্লিশ বৎসর হইতে অতিন্যূন হইলে উপরোক্ত ১৮ ইঞ্চের হাতই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ঠাকুর বাবুদিগের জমীদারিতে গবর্ণমেন্টের কৃত পরিমাণই স্থিতীকৃত আছে।

আরও বলা হইয়াছে জমিদারেরা অসম্ভব কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি অন্ততঃ গত ২২ বাইশ বৎসর হইতে এই সমুদয় অতিরিক্ত খাজানা আদায় হইয়া আসিতেছে। নূতন কিছুই লওয়া বা দাবিকরা হয় নাই। এতকাল প্রজাগণ নির্ব্বিবাদে দিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহাতে আপত্তি কেন করে? মেঃ নোলান সাহেব একথা আংশিক রূপে স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বিষয় ২টী প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অত্যুত্তম আইন সিদ্ধ দলিল আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ প্রমাণের বিষয় কমিসনার মেঃ মলোনি এবং নোলোনি সাহেবও অবগত আছেন।

গবর্ণমেন্টের বিষয় আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি বন্ধ করার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষেরা কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন না। আবার এই অতিরিক্ত কর বৃদ্ধির জন্য যখন প্রজাগণ আপন২ ভিটামাটী ছাড়িয়া যাইবে তখনও কর্ত্তৃপক্ষ হস্তোত্তলন করিবেন না। যদি ইহার কোন পক্ষ হইতে বল প্রয়োগ করা হয়, তখনই গবর্ণমেন্টের উচিত যে খড়্গহস্ত হইয়া মধ্যবর্ত্তী হয়েন।

উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা আমরা পরে বলিব। কিন্তু আমরা প্রদেশীয় প্রজাহিতৈষী মহাশয় দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এসম্বন্ধে তাঁহাদিগের যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাঁহারা অগৌণে তাহা আমারদিগকে জানান। এ বিষয়ে শৈথিল্য করিলে প্রজাগণের পক্ষে বড়ই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রজাবান্ধব কি পাবনা জেলায় কেহই নাই?[১৬]

পাবনার প্রজাবিদ্রোহে ঈশান রায়ের নেতৃত্বের কথা উঠে এসেছে। এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজনের নাম। কিন্তু এই ঈশান রায় কে? গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন খবর ছাপা হয়েছিল। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরের নির্যাস নিয়েও গ্রামবার্ত্তা খবর করেছিল। আগত পত্রের মুদ্রণ হয়েছিল। বিদ্রোহ কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কীভাবে পুলিশ মোতায়েন ছিল, কতদিনে বিদ্রোহ স্তিমিত হতে পারে– এই রকম অজস্র খবর, প্রতিবেদন, চিঠিপত্র থেকে বিদ্রোহ সম্পর্কে জানা যায়। গ্রামবার্ত্তা-র নিজস্ব মতামত অবশ্য প্রজার সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার দিকেই ছিল। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ উনিশ শতকের গণআন্দোলনের অন্যতম একটি অধ্যায়। কৃষকদের বা নিম্ন প্রজাদের শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে না গিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহের নির্দিষ্ট রূপরেখা বা বিদ্রোহের ধারাবাহিক কর্মসূচি, এই রকম কোনো রূপরেখা পাওয়া যায়নি। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের দাবীটুকু স্পষ্ট ছিল, স্পষ্ট ছিল কেন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সরকার এই শান্তিপূর্ণ জমায়েত বা প্রতিবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লুঠতরাজ বা দখল ইত্যাদি গ্রাহ্য হয় নি। অসৎ প্রকৃতির মানুষ বিদ্রোহীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ চালিয়েছে– এ উদাহরণ তৎকালীন পত্রপত্রিকার খবরে পাওয়া যায়। বিশেষত, যেহেতু প্রকৃত নেতৃত্ব

বা বিদ্রোহের নির্দিষ্ট রূপরেখা ছিল না, তাই বিদ্রোহ সঠিক পথে পরিচালিত না হয়ে অসাধু লোকের অসৎ কাজকর্মে পরিণত হতে সময় লাগেনি। বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হয়েছিল। আর গ্রামবার্ত্তা বারবারই সরকারকে অবহিত করেছিল যে, সব জমিদার যেমন খারাপ নয়, তেমন সব প্রজাই যে মারমুখো ও লুঠতরাজে অংশগ্রহণ করেছিল এমন নয়। তাদের চিহ্নিত করা দরকার। সাপ্তাহিক সংবাদ-এ গ্রামবার্ত্তা পাবনার বিদ্রোহ সম্পর্কে জানাল যে, 'আমরা প্রার্থনা করিতেছি, বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রজারা দন্ডভোগ করুক, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত যেন কেহ নির্যাতন সহ্য না করে, সে বিষয়ে তিনি মনোযোগ বিধান করুন।' (গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩ জুলাই) সেই সূত্রেই বিদ্রোহ সঠিক পথে চলতে পারে। প্রজারা অভিযোগ জানাতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় বিদ্রোহ চলাকালীন আর যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকেই ঈশান রায় ও বিদ্রোহীদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ঈশান রায় পাবনার কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম Pabna District Gazetters-এ বিবৃত রয়েছে। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় এবং গ্রামবার্ত্তায় ঈশান রায়ের কার্যকলাপের খবর পাওয়া গিয়েছে। গ্রামবার্ত্তা বিদ্রোহ চলাকালীন এক জায়গায় নির্ভীকভাবে জানিয়ে দিল যে, 'আমরা দেখিতেছি, ঈশান রায়ের ক্ষিপ্ততা ও প্রজা কর্ত্তৃক যে সকল অত্যাচার ঘটিয়াছে জমীদার বিশেষের অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারতাই তাহার কারণ।' (গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩ আগস্ট)।

এখানে গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত কয়েকটি খবর দেওয়া হলো, যা থেকে বোঝা যাবে বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র।

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ

রাজসাহীর কমিশনার সাহেব গবর্ণমেন্ট যে রিপোর্ট করেন, তাহার পরিশিষ্ট, এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্বৃত।

বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের জমিদারিতে ঈশানচন্দ্র রায় নামক একজন সামান্য ... জমিদার-বিপক্ষ দলের প্রথম প্রবর্ত্তক হন। এই ব্যাক্তি স্বয়ং উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের হস্তে অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এবং একখানি তালুকের অংশ সম্বন্ধে ঐ জমিদারদিগের সহিত ঈশান রায়ের এখনও মোকর্দ্দমা চলিতেছে। ফলত: ঈশান রায় এতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সকলে রাজা বলিয়া মানিয়াছিল। কিন্তু তিনি এবং তাঁহার সহকারী শম্ভুনাথ পাল, উভয়ে কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ের এখনও অনুসন্ধান হইতেছে। এবং উভয়েই এক্ষণে টেলর সাহেবের নিকটে অবরুদ্ধ আছেন।

জমিদার-দ্রোহী প্রজাদিগের দ্বারা কত স্থানে কত উপদ্রব হইয়াছে, তাহার এখনও সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় নাই। থানা চাটমোহরের অন্তর্গত গোপালনগর থানা মধুরার অন্তর্গত নাকালিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ দুলাই থানার অন্তর্গত সাগরকান্দী এই স্থানগুলিতেই উপদ্রব্যের আতিশয্য ঘটিয়াছিল, এই সকল স্থানে সম্পত্তির অনেক হানি হইয়াছে।

১৩৪ জন অপরাধী ইতঃপূর্ব্বে ধৃত হইয়াছে, এবং এখনও অনেক হইতেছে। প্রধান প্রধান উপদ্রবীদিগকে ধৃত করন পক্ষে চেষ্টার ত্রুটী হইতেছে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা নানা স্থানে বিশেষ পুলিষ নিয়োজিত করিয়াছেন। কোন স্থানে বা গ্রামবাসীদিগের ব্যয়ে, তথায় পুরাতন বিবাদ আর না উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে পুলিষ নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, এবং ফরিদপুর হইতে অতিরিক্ত পুলিষ যায়, তন্মধ্যে ফরিদপুরের পুলিশের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। অপরাপর পুলিষের লোকেরাও শীঘ্র যাইবে।

ফলতঃ জমিদারও প্রজাগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ ছয় মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত পুলিষের বন্দোবস্ত করিয়া না রাখিলে নিঃশঙ্কতার বিষয় নহে। অতএব প্রত্যেক থানার অধীনে দশ জন অতিরিক্ত কনেষ্টেবল এবং দুইজন হেড কনেষ্টেবল দিয়া যেখনে যেখানে আবশ্যক আউট-পোষ্টের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। এই সকল লোকের বেতন দেশস্থ লোককে সকল স্থলে দিতে হইবে না। যে যে স্থলে বিশেষ আবশ্যক হইবে, সেই সেই, স্থানে দিতে হইবে।

এই বিবাদ উপলক্ষে প্রজাদিগের সঙ্গে জমিদারদিগের দেওয়ানি মোকর্দ্দমারও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, এতদর্থ স্থানে২ অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগেরও আবশ্যকতা হইবে। এবং কোন কোন স্থানে মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অবস্থা দেখিয়া তাহা হইবে।

প্রজারা উদ্দেশ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আইন বিরুদ্ধ পথে যে পদার্পণ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নোলেন সাহেব বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ প্রজাই এমন কথা বলে যে, তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান ওজর পরিত্যাগ করিবে, এবং জমিদারদের সঙ্গে একটা ন্যায্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছে।

বর্ত্তমানে প্রজার দেয় খাজানার হারের সামঞ্জস্য নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে হার আদালতে ডিক্রী হইয়াছে, তাহার অত্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয়। যাহাই হউক, যে হারে প্রজারা কর দিয়া আসিতেছে, সেই হারেই তাহারা দিতে বাধ্য। জমিদারেরা তাহার অতিরিক্ত আদায় করিতে এবং প্রজারা তাহার কম দিবার জন্য ওজর করিতে পারে না। তবে বেশি লওয়া বা কম দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে, জমিদার প্রজার হারের তারতম্য স্ব স্ব প্রধান হইয়া করিতে ক্ষমতাবান নহে। তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।[১৭]

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের মূল কারণ ভূমি পরিমাপের গজ ও খাজনার হার। ঈশান রায়ের নেতৃত্বে প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। এই দলগত হওয়ার কারণই ছিল জমি পরিমাপের সঠিক একক নিয়ে সংশয় এবং বিধিবহির্ভূত করের চাপ। গ্রামবার্ত্তা সহজ ও সোজা ভাষায় বিদ্রোহের মূল কারণটিকে ধরতে চেয়েছে। বোঝাতে চেয়েছে যে, সরকারের উচিত অবিলম্বে এই ভূমি পরিমাপের একক সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা, তবেই বিদ্রোহের মূল কারণটি নির্বাপিত হবে, না হলে আপাতভাবে বিদ্রোহ দমন করা হলেও তা

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের মূল কারণ ভূমি পরিমাপের গজ ও খাজনার হার। ঈশান রায়ের নেতৃত্বে প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। এই দলগত হওয়ার কারণই ছিল জমি পরিমাপের সঠিক একক নিয়ে সংশয় এবং বিধিবহির্ভূত করের চাপ। গ্রামবার্ত্তা সহজ ও সোজা ভাষায় বিদ্রোহের মূল কারণটিকে ধরতে চেয়েছে। বোঝাতে চেয়েছে যে, সরকারের উচিত অবিলম্বে এই ভূমি পরিমাপের একক সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা, তবেই বিদ্রোহের মূল কারণটি নির্বাপিত হবে

আবার কোনোদিন জেগে উঠবে স্বাভাবিকভাবেই। গজের পরিমাপ ঠিক করা ও খাজনার হার নির্দিষ্ট করার প্রসঙ্গে গ্রামবার্ত্তা জমিদারের লাভের দিকটি তুলে ধরেছে। এবং প্রজারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে বিষয়টিও বিশ্লেষণ করেছে।

জমিদারের সঙ্গে প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রামবার্ত্তা প্রায় এককভাবেই সরব হয়েছে কয়েক দশক ধরে। সেই সূত্রেই গ্রামবার্ত্তা দশ আইনের সুবিধা ভোগের বিষয়টি জানিয়ে বলেছিল যে, ভূমিতে ফসল বেশি হলে জমিদার তার ভাগ নেবে, কিন্তু অনাবৃষ্টি ও খরায় ফসল ভালো না হলে তার দায় থাকবে শুধু প্রজার। এই নিয়মে প্রজার ক্ষতি। তাই দীর্ঘদিন এইভাবে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায্য বিষয়ই প্রজাদের ক্ষোভের উৎস।

বল প্রয়োগে তাই পাবনার প্রজাবিদ্রোহ দমন ফলপ্রসূ হতে পারে না। চাই আলোচনাভিত্তিক সুবন্দোবস্ত। এই প্রাথমিক কারণগুলো উল্লেখ করে গ্রামবার্ত্তা বিদ্রোহ চলাকালীন প্রতিবেদন জানাল যে–

গ্রামবার্ত্তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, হিন্দু রাজত্বের সময় শস্যাদির অংশ করস্বরূপ গৃহীত হতো। ওই নিয়মে রাজা, প্রজার সঙ্গে তুল্যাংশে সুখ-দুঃখ ভোগ করতেন। প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হলে রাজার ধনাগার পূর্ণ এবং প্রজাও সুখী হতো। উৎপন্ন না হইলে প্রজার মতো রাজাও ক্ষতি স্বীকার করতেন। এখন উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত। ভূমি উর্বর হয়ে অধিক শস্য প্রদান করলে দশ আইনানুসারে জমিদার তার অংশ ভোগ করেন, অনাবৃষ্টিতে শস্য দগ্ধ এবং অতিবৃষ্টিও বন্যায় ধৌত হলে কেবল প্রজাই সেই

ক্ষতি স্বীকার করে। এর সরল কথা এই, লাভ জমিদারের, ক্ষতি প্রজার। যারা ক্ষতির ভাগী, ক্রোড়ে কিছু লাভ না থাকলে তারা কোথা হইতে সেই ক্ষতি পূর্ণ করবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সহজ কথা অনেকেই বুঝতে পারে না। মুসলমান ভূপতিরা দুর্দান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাকে চব্বিত চর্বণ করেনি।

কেবল পাবনা ও সিরাজগঞ্জ প্রদেশের নহে, অনেক প্রদেশের প্রজাগণই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রেণ্ডঅবইণ্ডিয়া সম্বাদ পাইয়াছেন, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায়ও পাবনা প্রদেশের ন্যায় গোলযোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার বলেন, কোন জমীদারের অত্যাচার নিবন্ধন, হুগলি জেলাতেও অগৌণে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। প্রজার মনের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, কেবল দৃঢ় শাসনে তাহারা নিরস্ত হইয়া থাকিবেন না। জমীদারের সহিত তাহাদিগের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ এই তিন রাজাদিগের রাজত্ব কালের ভূমির অবস্থা ও হার, সবিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক জমীদারের সহিত প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে, গবর্ণমেন্ট আইন কৌশল ও বল প্রয়োগে এখন চিরশান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কুকুর সোহাগ পাইলে ক্রমে কর্ত্তার মুখ চাটে।

পুলিষ বিভাগে ভাল লোক নাই, আমরা একথা বলি না, অনেক অসচ্চরিত্রের লোক ঐ বিভাগে প্রবেশ করিয়া তাহার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সচ্চরিত্র ও কর্ম্মঠ কর্ম্মচারিদিগকে উন্নত এবং অসচ্চরিত্রদিগকে দূরীকৃত না করিলে, পুলিষ বিভাগ কখন সংশোধিত হইবে না। দেশের ওঁছা ও বদমাইস যে সকল ব্যক্তি পুলিষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বে কেবল প্রজারই রক্ত পান ও সর্ব্বনাশ করিত, অশাসনে ক্রমে২ গবর্ণমেন্টের গাত্রেও হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা তাহার একটী ঘটনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। গবর্ণমেন্ট যদি অনুসন্ধান করেন, এবং মফস্বলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের, পুলিশের মায়াবৃতচক্ষুঃ মুক্ত হয়, তবে ঐরূপ অনেক বিষয় প্রকাশ হইতে পারে সন্দেহ নাই।[১৮]

জমিদার ও প্রজা

আমরা, জমীদারদিগের সহিত প্রজাদিগের যে সচরাচর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং উক্ত বিবাদ নিবারণের উপায়, যাহাতে প্রজাগণ জমীদারকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও জমীদার প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, উভয়ই লাভবান্ হইয়া সুখী হইতে পারেন, যথাসাধ্য ইহার সবিশেষ পাঠকদিগকে ক্রমান্বয়ে অবগত করিব। এত দিনের পর পাবনা প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে যে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সাদরে তাহা, অদ্য এইস্থলে প্রকাশ করিলাম। অনন্তর আমাদিগের অভিপ্রায় ক্রমশঃ প্রকাশ্য করিব।

আগত পত্র
পাবনা প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ।

ইসাবসাহী পরগণা, পূর্ব্বে মাহমান্য নাটোরের রাজাদিগের অধীন ছিল। উক্ত রাজপরিবারের দুরবস্থায়, নিলামে বিক্রীত হইয়া পাঁচজন জমীদারের হস্তগত হয়। যথা কলিকাতা নগরীর ঠাকুর, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়, সলপের সান্ন্যাল, ... পাকড়াশী এবং পোরজানার ভাদুড়ী পরিবার।

নটোরাজের রাজত্ব সময় ভূমির কর অতি সামান্য ছিল। প্রতি বিঘায় খাজানা .... আনা হইতে। .... আনা। নুতন জমীদারেরা, ক্রমান্বয়ে কর বৃদ্ধি করিতে মনোস্থ করেন। তাঁহাদিগের সেই আশা আমরা দুরাশা বলিতে পারি না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। জমীদারগণ, কর বৃদ্ধির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে কোনপ্রকার গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা, ব্যয় বাহুল্য এবং আদালতের মোকদ্দমার ফল অনিশ্চিত, ইত্যাদি বিবেচনায় দুই এক আনা আবাওয়ার খরচা স্বরূপ বৃদ্ধি করলেন। প্রজাগণও জমীদারের দায় এবং এক আনা আধআনার নিমিত্ত বিবাদ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি প্রদান করিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে জমির খাজানা ১ এক টাকা ছিল, সেই জমীর ১০ আনা বৃদ্ধি হইয়া ১৷৷ ০ টাকা হইল। এই নিয়মে সাত বৎসর গত হয়। একদা জমীদারেরা জমী বিশেষের খাজানা আরও চারি আনা বৃদ্ধি করেন। তাহা আদায়ও হয়। পরিশেষে ১৮৭০ সালে খাজানা আরও চারি আনা বৃদ্ধি করা হইলে, কোন২ প্রজা তাহা এক বৎসর প্রদান করে কিন্তু অধিকাংশ প্রজাই জমীদারের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে।

একটি বিশেষ স্থল ভিন্ন অধিকাংশ প্রজাই নির্ব্বিবাদে অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে ছিল। যে অল্প সংখ্যক প্রজা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, জমীদার তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে যথাসাধ্য ত্রুটি করেন নাই। এবং তজ্জন স্থানে২ বিলক্ষণ অত্যাচার ও প্রজা পীড়নও হইয়াছে। ইতি মধ্যে উড়িষ্যার জমীদারগণ, বেআইনি কর গ্রহণ করিয়া যে রূপ বিপদ গ্রস্ত হন, সেই দৃষ্টান্তে ভয় প্রাপ্ত হইয়া সলপের সান্ন্যাল জমীদারগণ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে কবুলিয়ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা পূর্ব্বে যে সকল আবওয়াব ও কর বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি, এই সমুদয় কবুলিয়তে তদতিরিক্ত আরও অনেকগুলি অন্যায্য খরচা বার করিয়া, সমুদায়কে খাজানা বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন২ গ্রামের লোক ঐরূপ কবুলিয়ত লিখিয়া দেয়, এবং কতকগুলি গ্রামের লোক তাহা দিতে অগ্রসর ইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ গ্রামের লোকই তাহা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। জমীদারগণ বাধ্য হইয়া সাহাজাতপূরের মুন্‌সেফিতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রজাগণ, পূর্ব্ব হিসাবে খাজানা আমানত করিয়া মোকদ্দমার জবাব দেয়। মুন্‌সেফ জমীদারের দাবি ডিক্রী দেন। আপিল হওয়াতে জজসাহেব, মুন্‌সেফের হুকুম রদ করিয়া প্রজাদিগের স্বীকৃত জমা ডিক্রী দেন। যে সকল প্রজা পূর্ব্বে বৃদ্ধি দিয়াছিল তদ্দৃষ্টে তাহারাও বক্র হইয়া উঠে। এই সময়ে ঈশানচন্দ্র রায় নামক এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার বাবুরা, আপন কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যান ও যারপরনাই অপমান এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেকগুলি টাকাও আদায় করেন, ঈশানচন্দ্র রায়, প্রজাদিগের ভাব গতি দেখিয়া দাদ তুলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার গোমস্তা শম্ভুনাথ পাল, অসহ্য অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া প্রজাদিগকে ক্রমে জোট বন্দী করিলেন। প্রজাগণও ক্ষিপ্ত হইয়া খাজানা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল। ঈশান মহারাণীর প্রতিনিধি সদৃশ পাবনা জেলার প্রজাবর্গের রাজা স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। প্রজারাও আপনাদিগকে মহারাণী খাস প্রজা মনে করিতে লাগিল। ঈশান প্রজাদিগকে বলিলেন, অতিপূর্ব্বে খাজানার যে হার ছিল, তাহাই তোমাদিগকে দিতে হইবে। মুকদম সাহেব ৪১ ইঞ্চি হাতে জমি মাপ হইবে, এবং সমুদায় বেআইনী কর বন্ধ হইয়া যাইবে। জোটবন্দী প্রজারা, খাজানা দিবে না, প্রথমতঃ এই কল্পনা করিয়া ছিল কিন্তু শেষে তাহা অন্যায় বিবেচনা করিয়া, যাহাতে মুকদম সাহেব হাত প্রচলিত এবং সাবেক হারে তাহাদিগের জমাবন্দী হয়, তাহারা সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। এই সময় দুই এক জমীদারের প্রতি অত্যাচার, ঘর জ্বালানী ও লুঠ-পাট প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ কার্য্য আরম্ভ হইল। জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ, এতদূর হইবে অগ্রে বিশ্বাস করেন নাই, পরে ম্যাজিস্ট্রেট, কমিসনর প্রভৃতি প্রধান২ রাজকর্ম্ম চারী ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা পান। প্রজাগণ, তখন তাহাদিগের প্রতি সুবিচার হইবে মনে করিয়া, জোটভঙ্গ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করে। অনেকগুলি প্রজা, ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক বন্দীভূত ইশান রায় ও তাঁহার গোমস্তা ধৃত হয়। বর্ষার জল নিঃশেষের ন্যায় সমুদয় গোলযোগ নিঃসারিত হয়।

পাঠকগণ! আগত পত্রখানি এতক্ষণ পাঠ করিলেন, ইহার পূর্ব্বে আরও দুই এক খানি পত্র ও রাজসাহী বিভাগের কমিশনার সাহেবের রিপোর্ট গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেরই এক ভাব ও এক তাৎপর্য্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যাহা বলিয়াছেন ও কমিশনার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, পত্র প্রেরকগণও সেই কথা বলিতেছেন। সকলের সার সংগ্রহ করিলে ইহাই প্রতীতি হয়, বিনাবাতাসে নদীতে ঢেউ উঠে নাই। যে জমীদার অগ্রে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি পরে অত্যাচারিত হইয়াছেন। সুতরাং জমীদার ও প্রজা কেহই রাজনিয়ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই দোষ যাহ-ারা কেবল প্রজা কি জমীদারের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া এক সম্প্রদায়কে তুলসী পত্রের ন্যায় নির্দ্দোষ এবং অপর সম্প্রদায়কে সমস্ত দোষে .... করিতে চাহেন, তাঁহারা ন্যায়ের মস্তকে পদার্পণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং অদ্যও বলিতেছে, সকল প্রজা কি সকল জমীদার দুষ্ট নহেন। নির্ব্বাচন পূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্য মাত্রই আপন২ লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। জমীদারগণ যে এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় রূপ অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অত্যাচার, অন্যায়ের সহোদর। যেখানে অন্যায় সেই খানেই অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। "অত্যন্ত বাড়িলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়" একথা চির প্রসিদ্ধ। জমীদার ও প্রজাগণ উভয়ই আমাদিগের এই প্রাচীন বাক্যের প্রচুর প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। প্রথম অত্যাচারকারী জমীদার। ইহারা বল বা কৌশল পূর্ব্বক কর বৃদ্ধি করেন, সেই সঙ্গে যে অত্যাচারের পথও পরিষ্কার করিয়া ছিলেন, তাহাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রজাগণ, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তনুযায়ী সেই পথে গমন করিয়া অত্যাচার পূর্ব্বক অপরাধী হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা তজ্জন্য কোন কওথাই বলিতে চাহিনা। যিনি যেমন কর্ম্ম করিয়াছেন, তদনুসারে ফল ভোগ করিতেছেন ও করিবেন, কখনই বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইবেন না। জমীদার এ দেশের রাজা, ইহা অত্যুক্তি নহে। পিতার ন্যায় প্রজার সর্ব্ব প্রকার ভরসার স্থল। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জমীদার স্বর্থানুরোধে পুত্রবৎ, নিরীহ প্রজাগণের প্রতি এইরূপ বিসদৃশ, ধর্ম্ম ও ন্যায় বিগর্হিত আচরণ করিতে পারেন, তাঁহাদ্বারা কি না সম্ভব? এমন ব্যক্তির হস্তে (সদসৎ নির্ব্বাচন নাকরিয়া) দশ আইন ব্রহ্মাস্ত্র অর্পণ করা কি কর্ত্তৃপক্ষের

> কর্ত্তব্য হইয়াছে? সে যাহা হউক, যেখানে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, সেস্থলে আদালত ও আইনের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, যদি কেহ অর্থও ও বলের সাহায্য গ্রহণ করে, তবে তাহাকে কি বলা যাইতে পারে? আমরা দেখিতেছি, ঈশান রায়ের ক্ষিপ্ততা ও প্রজা কর্ত্তৃক যে সকল অত্যাচার ঘটিয়াছে, জমীদার বিশেষের অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও অবিমুষ্যকারতাই তাহার কারণ। এক জমীদারের নিমিত্ত সকলের অযশঃ ও বিড়ম্বনা নিতান্ত দুঃখের সন্দেহ নাই। আমরা তন্নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, কমিসন নিযুক্ত করিয়া কোন জমীদার সৎ ও কোন জমীদার অসৎ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক দুষ্টকে শাসন ও শিষ্টকে পালন করুন। এ বিষয়ে বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নহে।[১৯]

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের আঁচ বঙ্গের অন্যান্য অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, সে কথা গ্রামবার্ত্তা থেকে জানা যায়। কীভাবে জমিদাররা কৃষকদের বা প্রজাদের অত্যাচারিত করেছিল, তার নিদর্শন গ্রামবার্ত্তার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ঈশান রায়ের উদ্ভব যে যথেষ্ট কারণসংগত, তা পরিষ্কার হয়েছে গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত উপরিউক্ত প্রেরিত পত্রের বিষয় থেকে। সেখানে ঈশান রায়ের উত্থান এবং যে লুটপাটের খবর রয়েছে, সে প্রসঙ্গে যে দোষী সে শাস্তি পাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেরিত পত্র প্রসঙ্গে গ্রামবার্ত্তা অভিমতে জানিয়েছিল যে, পত্রদাতার লেখনীর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনের কথার মিল রয়েছে। অর্থাৎ পত্রদাতার যুক্তি অবাস্তব নয়। এই প্রসঙ্গেই গ্রামবার্ত্তা কিন্তু ভয়ংকর একটি বাক্য জানিয়েছিল– 'বিনা বাতাসে নদীতে ঢেউ ওঠে না। আগে জমিদার অত্যাচার শুরু করেছেন। এখন তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন। ফলে কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নয়।' প্রজাদের বিদ্রোহ শুরু হলে জমিদারদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ঈশান রায়ের ও তার একত্রীভূত দলের কার্যকলাপ নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন গ্রামবার্ত্তা নীরব না থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ঈশান রায়ের ক্ষিপ্ততা ও প্রজাদের অত্যাচারের কারণ হলো কয়েকজন জমিদারের স্বার্থপর আচরণ ও অবিমৃষ্যকারিতা।

১৮৭৩ সনের ভাদ্র মাসের একটি সাপ্তাহিক সংখ্যায় 'প্রাপ্ত-পাবনা' শীর্ষক অংশে গ্রামবার্ত্তায় ঈশান রায় সম্পর্কে মুদ্রিত হয়েছিল যে তিনি বুদ্ধিমান, শান্তপ্রকৃতি এবং আইন জানা মানুষ। তাঁর দ্বারা অত্যাচার হওয়া সম্ভব নয়। অত্যাচারকারী জমিদারদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করার প্রচেষ্টায় সব জমিদারের তিনি চোখের বালি হয়ে উঠেছেন। ঈশান রায়ের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি, এই সংখ্যায় তা লেখা ছিল।

তৎকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যসূচক রচনা গ্রামবার্ত্তায় প্রায় প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, দাসুড়ের লুটের প্রসঙ্গ গ্রামবার্ত্তায় মুদ্রিত হয়েছে। প্রজাবিদ্রোহের প্রথমদিকে বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের তালিকা নিয়ে যে অংশটি গ্রামবার্ত্তায় মুদ্রিত হয়েছিল, তার নিচে অমৃতবাজার লেখা ছিল। ভাদ্র সংখ্যায় দাসুদের লুটের প্রসঙ্গে অমৃতবাজারের মন্তব্যকে সরাসরি গ্রামবার্ত্তা আক্রমণ করে জানিয়েছিল যে, দাসুড়ের ঘটনা অমৃতবাজার প্রজার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরিত চিঠিগুলো অমৃতবাজার মুদ্রণ করেনি। গ্রামবার্ত্তার এই বিষয়ের মন্তব্য ছিল যে, অমৃতবাজার যখন ছোট জায়গায় ছিল, তখন ছোট লোকের সমর্থনে কথা বলত। এখন বড় জায়গায় গিয়ে বড় লোকদের মুখের ভাষ্য হতে চাইছে। তাই দাসুড়ের ঘটনাটিকে প্রজার ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে অমৃতবাজার।

শুধু দাসুড়ের লুটতরাজের ঘটনায় নয়, গ্রামবার্ত্তা অমৃতবাজারের আরেকটি মন্তব্যের বিপরীতেও দাঁড়িয়েছিল। যেখানেও গ্রামবার্ত্তা হতাশার সুরে জানিয়েছিল যে, 'আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার, পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষতঃ রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখি প্রজাদিগের দুঃখির দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন?'

এখানে গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত আরও কিছু প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ, চিঠিপত্র ইত্যাদি তুলে ধরা হলো, যেগুলো পাঠ করলেই বিদ্রোহ সম্পর্কে গ্রামবার্ত্তার অবস্থান আরও স্পষ্ট হতে পারে।

> প্রজাবিদ্রোহের মকদ্দমা প্রায় শেষ হইল বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত রাজসাহীর সুযোগ্য ডিপুটী মেজেন্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ বসু এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যসমাধা করিয়া অদ্য তিনি পুনরায় রাজসাহী যাইবেন, প্রজাদিগকে কঠিন শাস্তি না দেওয়াতে এবং নিরপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াতে জমীদার মহাশয়েরা এবং তাঁহাদের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক প্রকার কথা বলিতেছেন, অপরাধ থাকুক বা, না থাকুক প্রজাদি....
>
> মহারাজা ঈশান চন্দ্র রায় এপর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধই প্রমাণ হয় নাই, তবে কেন যে তাঁহাকে নিরর্থক কষ্ট দেওয়া হইতেছে বুঝিতে পারি না, বোধ হয় পুলিষের চক্রে তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা আলাপ করিয়াছি, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, শান্তপ্রকৃতি ও বহুদর্শী লোক, আইনাদিও বেস জানেন, তাঁহাদ্বারা কোন অচ্যাচার হওয়ার সম্ভব নয়। বোধ হয়, দৌরাত্ম্যকারী জমীদারদিগের অত্যাচার নিবারণকরার চেষ্টাতেই তিনি সকল জমীদারের চক্ষের বালী হইয়াছেন। বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা প্রমথনাথ রায় রায়বাহাদুরে লোক কর্ত্তৃক .... চৌধুরীর জমীদারী স্থিত বিখ্যাত দাসুড়ার হাট ও তন্নিকটবর্ত্তী মানিকড় ইত্যাদি কয়েক খানি গ্রাম লুঠ হয়। সেই লুঠের মুকদ্দমার বিচার এবারকার দওরাতে হইতেছে। মকদ্দমার ফল কি হয় মহাশয়কে পরে জানাইব। এবার দীঘাপতিয়ারারাজার পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টর কিম্বা হাইকোর্টের উকীল কিছুই আনা হয় নাই, কেবল রাজসাহীর দুইজন উকীল আসিয়া রাজার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। মেজেষ্ট্রিতে ব্যারিস্টার আনিয়া ধুম্ ধাম্ করিয়া এবার এত তাচ্ছল্যের কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিনা। বোধ হয় রাজার পক্ষীয় লোকেরা মনে করিয়াছিলেন যে ব্যারিষ্টার আনিয়া ভয় দেখাইয়া মৌলিবী সাহেবের নিকট মকর্দ্দমা জয়ী হইবেন।
>
> দাসুড়ের লুঠ সম্বন্ধে অমৃতবাজার সম্পাদকের ব্যবহার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি, তিনি এই ঘটনাটিও নির্দ্দোষী প্রজার ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এটি যে জমীদারের কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে তাহা তিনি কোন প্রকারে যে এসম্বন্ধে তাঁহাকে যে পত্রগুলি লেখা হয় সেগুলো তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেন নাই অমৃতবাজার যখন ছোট জায়গায় ছিল, তখন ছোট লোকের পক্ষ সমর্থন করিত, এখন বড় জায়গায় গিয়া বড় লোকের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। বোধ হয়, বড় দলে মিসিবার ইচ্ছা অমৃতবাজার সম্পাদকের রাজনীতি বিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক মত পরিবর্ত্তনের কারণ।
>
> এখানকার বর্ত্তমান মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিশ্রমী নিরপেক্ষ ও বুদ্ধিমান বিচারক এবং ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও নির্ম্মল স্বভাব। ইংরাজী এবং বাঙ্গলা উত্তম রূপ জানেন, বক্তৃতাশক্তিও বেস আছে, ইনি কিছু দিবস হইল পাবনা এসসিয়েসনে যে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেরূপ বক্তৃতা এখানে আর কখন কাহারও মুখে শুনা যায় নাই।[২০]
>
> পাবনার প্রজাবিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইতে না হইতেই আবার বগুড়া অঞ্চলে ভয়ানক ধূম উত্থিত হইতেছে। যদিও শেষোক্ত অঞ্চলের ধূম এ পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ধূম সূত্রপাতেই সকলকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। দিঘাপতিয়া রাজার এলাকাস্থ .... প্রার্থনায় তত্রত্য নায়েবের বিরুদ্ধে কৌশলে হস্তোত্তোলন করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই সময় সতর্ক হউন নতুবা ঐ ধূম অতঃপর গগণস্পর্শ করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠিবে। আমরা প্রজাগণকেও বলিতেছি, তাহারা শান্তভাবে কার্য্য না করিলে, তাহাদিগের দুর্গতির এক শেষ হইবে। পাবনার বিদ্রোহী প্রজাগণের দিকে কি তাহাদিগের দৃষ্টি হইতেছে না?[২১]

প্রেরিত পত্র

> প্রজাবিদ্রোহানল এতকাল পদ্মার উত্তর পার্শ্বেই ছিল। কিন্তু বাপু। এই যে বর্ষাকাল, প্রবলবেগবতী পদ্মানদী, এই যে তাহার আনুসঙ্গিক সাময়িক বার্ত্তা ও তৎসম্ভূত ভয়ঙ্করী তরঙ্গমালা, ইহার কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। তাহার প্রবল স্রোত উপরোক্ত সমুদয় বাধাগুলিকে অতিক্রম করিয়াও শনৈঃ২ নদীয়া জেলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে যে একটী জেলা আছে তন্মধ্যে নদীয়াই সর্ব্ব প্রধান। এই জেলাটী বিস্তর ধনী ও জমীদার লোকের বাস বলিয়া যেমন বিখ্যাত, ইহার অধিবাসী দিগের বিদ্যা, প্রগাঢ়বুদ্ধি ও সভ্যতার নিমিত্তও ইহা তেমনি প্রসিদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস ছিল, ইহার সাধারণ প্রজাগুলিও অপেক্ষাকৃত পরিমাণানুসারে বুদ্ধি ও গুণ সম্পন্ন বটে, কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের সেই আশা সমূহ প্রবল বর্ষা স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। আপনিও পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বোত্তর দিকস্থ আমবাড়ীয়া প্রভৃতি গ্রামের নির্ম্মল আকাশ খণ্ডে ক্ষুদ্র একখানি মেঘ দেখা যাইতেছে সূর্য্যের প্রখর কিরণ এবং প্রবল বাত্যাযোগে উহাতে যে ফল ফলিবে, তাহা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনি জানি। ....
>
> কিন্তু কি আশ্চর্য এতগুলি নিজের কষ্ট সত্ত্বেও প্রজা সাধারণের নামে আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মনের গতি এরূপ হয় কেন বলিতে পার এ রোগের কি কোন ঔষধ আছে? আমি এই অতিরিক্ত ভার আর বহন করিতে পারি না। ক্রমে২ সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল।
>
> যদি তোমরা কেহ, সময়ে আমার সাহায্য না কর, তবে দেখিবে, অচিরাৎ আমি ভাঙ্গিয়া যাইব। আমাদের বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাস বলিয়াছেন।

"দুঃখ ভাণ্ড অল্প হল দুঃখ তাহে ভারি। তথাপি স্থাপিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি॥ নিষেধ করিগো তাই যদি ভেঙ্গে যায়। এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়॥ বাপু! মনে আছে? অযোধ্যাপতি শ্রীরাম চন্দ্র বারণের রথে বগবতী কাত্যায়নীকে দেখে এবং সীতার উদ্ধার বিষয়ে একান্ত নিরাশ হয়ে দেবীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনার দুঃখ প্রকাশক এই শ্রবণমধুর বাক্যগুলির দ্বারা সমুদয় দুরবস্থা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যখন যে অবস্থায় থাকি উপরোক্ত বাক্যগুলি সর্ব্বদাই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাই। নরসিংহ রামচন্দ্র যে অবস্থায় যেভাবে যে২ সময়ে যে কষ্ট পাইয়াছেন, পর্য্যায়ক্রমে আমাকেও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ তাহাই ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু বাপু! বলিতে পার তাঁহার ন্যায় সুখী এবং ঐশ্বর্য্যশালী আমি কেন হইতে পারি না? কিন্তু সে যাহা হউক, বাজে কথায় আর কাজ নাই আসল কথাগুলি বলি শুন (মূল কথা এই যে, যে যেমন দিয়াছে সে তেম্নি পাবে) শুনিতে পাই পূর্ব্বোক্ত গ্রাম সমূহের প্রজাগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমীদারের সঙ্গে গবর্ণমেন্টের পরগণার নিয়মানুসারে যে খাজানা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবল তাহাই মাত্র জমীদারকে দিতে রাজি আছে। আমরা জানি জমীদার উর্দ্ধ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত যে এক হারে খাজানা আদায় করিতে পারিয়াছেন প্রমাণ দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে পারিবেন (তদূর্দ্ধ কাল হইতে যে খাজানা নিয়া আসিতেছে তাহার কোন কথাই নাই) এরূপ স্থলে প্রায় শত বৎসরাবধি যাহা দেওয়া হইয়া আসিতেছে তাহা পূর্ব্বে যেন জানিতে পারিতাম না, সুতরাং দিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখন জানিতে পারিলাম অতএব দিব না, বলিয়া আপত্তি করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। কেবল লাভের মধ্যে এই হইবে দুটি চারটী কু লোকের কুমন্ত্রণায় গরিব প্রজাদিগের ভিঁটা মাটি উৎখাত যাইবে। বাপু। একে এবারকার দূর্ব্বৎসর, আউস ধান্য প্রায় ছয় .... আন্দাজ জন্মিয়াছে। এবং বর্ষার .... হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায় আমন ধান্যেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ....

সকলেরই মনে আছে পাবনার বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেন্ট প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন "তোমরা ন্যায্য মতে যাহা যাহার নিকট দায়ী আছ, বুঝিয়া দেও" আমরাও তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা উপরোক্ত মতে দেয় ন্যায্য যাহার যে খাজানা তাহা গিয়া সমুদায় পরিহার করিয়া ফেল। যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন এবং তোমরা নিজের .... চেষ্টা নিজে না কর, দেখিতে পাই তোমরা নিজেই অচিরাৎ ....[২২]

পাবনায় নিকটবর্ত্তী দাসুড়িয়া গ্রাম লুঠসম্বন্ধে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, গ্রামবার্ত্তার পাঠকগণ তাহার সবিশেষ অবগত আছেন। নাটোরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রমনথনাথ রায়-বারবাহাদুরের বিনানুমতিতে উক্ত ঘটনা সংগঠিত হয় নাই, পাবনার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুলকরিম সাহেব সেই সন্দেহ ক্রমে রাজা বাহাদুরকে এজলাসে হাজির করিতে ওয়ারেন্ট বাহির করেন। রাজা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোসন করিয়া পাবনাতে উপস্থিত হন এবং শুনিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ঘরে দেখা করিয়াছিলেন, এখন মোক্তারের দ্বারা জবাব প্রদানের আদেশ হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন, তিনি ১০০০ টাকা জরিমানা দিয়াছেন। যাহা হউক, রাজাবাহাদুর, অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই গর্হিত কার্য্য সংঘটিত হয়, তিনি অবিলম্বে দুশ্চরিত্র কর্ম্মচারিদিগকে দূর করিয়া দিবেন। জমীদার ফয়েজবক্স চৌধুরীর প্রতি অনুগ্রহ করিবেন ও প্রতিদ্বন্দ্বি যে সকল হাট স্থাপিত হয়, তাহাও উঠাইয়া দিবেন। এরূপ সদাশয়তা রাজোচিত কার্য্য সন্দেহ নাই, তন্নিমিত আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেছি, ".... যুদ্ধ করে, নলখাগরা প্রাণে মরে" বিনাপরাধে যে সকল প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, তাহাদিগের ক্ষতি কে পূরণ করিবে? রাজা না জমীদার চৌধুরী সাহেব? শুনিতেছি এই উপলক্ষে রাজাবাহাদুরের ৫০/৬০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বোঝার উপর শাকের আটিও সহিতে পারে, অতএব তিনি দয়া করিয়া আর ২০/২৫ হাজার টাকা প্রদান পূর্ব্বক দুঃখি প্রজাদিগের অপহৃত দ্রব্যাদির ক্ষতি পূরণ করুন। ইহাতে যশ্ ও ধর্ম্ম উভয়ই লাভ করিতে পারিবেন। যে সকল মহাত্মা দাসুড়িয়ার লুঠ নির্দ্দোষ প্রজাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া ধনী দিগের প্রিয়পাত্র হইতেও প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপন মুখ আপনি দর্পণে দৃষ্টি করুন।[২৩]

সিরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ।

জমীদারের দৌরাত্ম্যে উক্ত প্রদেশে যে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশীয় সকল জমীদার অত্যাচারী এবং তাঁহাদিগের দোষেই সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলি নাই এবং এখনও স্বীকার করিতেছি না। দুই একজন প্রধান জমীদারের অন্যায় করবৃদ্ধি হইতে ঐ ভয়ানক অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয়। যেমন কোন গৃহস্থের অনবধানতায় তাহার গৃহে আগুণ লাগিলে সেই সঙ্গে গ্রামবাসী অপরাপর অনেক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, শিরাজগঞ্জ প্রদেশের অবস্থাও যে তদ্রুপ হইয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রজারা পূর্ব্ববৎ সহজে খাজানা প্রদান না করায়, অনেক ক্ষুদ্র জমীদারের বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা উর্দ্ধতন ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, প্রজারা যাহাতে সহজে রাজস্ব প্রদান করে, তদ্রুপ উপায় বিধান করুন। অত্যাচারী জমীদারদিগের প্রতি তাঁহাদিগের যেমন দৃষ্টি আছে, নির্দ্দোষ জমীদারদিগের প্রতিও যেন তদ্রুপ দৃষ্টি থাকে। অন্যথা অনেকের উচ্ছিন্ন যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই উপলক্ষে আমাদিগের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আক্ষেপ পূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। পাঠকরিলেই কর্ত্তৃপক্ষ সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

মহাশয়! আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জমীদারের দুরবস্থা আর কি লিখিয়া জানাইব। প্রজাগণ কর আদায় করিতেছে না। তাহারা ইত্যগ্রে বাড়ী লুঠ করিতে চেষ্টা করিত, এখন কেবল তাহা হইতে ক্ষান্ত আছে। আমাদিগের আহার বন্ধপ্রায়। অত্যাচারী জমীদারদিগের প্রজারা বিদ্রোহী হউক বা খাজানা বন্ধ করুক, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি। কারণ সকলেই আপন সত্ব .... করিতে যত্ন করিয়া থাকে। আমরা অত্যাচারী নহি, একথা আমি

শুধু দাসুড়ের লুটতরাজের ঘটনায় নয়, গ্রামবার্ত্তা অমৃতবাজারের আরেকটি মন্তব্যের বিপরীতেও দাঁড়িয়েছিল। যেখানেও গ্রামবার্ত্তা হতাশার সুরে জানিয়েছিল যে, 'আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার, পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষতঃ রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখি প্রজাদিগের দুঃখির দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন?'

বলিতেছি আপনি অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি, আমরা প্রজার প্রতি কখন অত্যাচার করি না। দুঃখের কথা বলিতে অশ্রুপাত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় সলপের শান্যাল ও পোরজানায় ভাদুড়ি জমীদারদিগের .... আনা নিরিখের ভূমি, আমাদিগের জমীদারী সংগল্ল আছে, আমরা সেই স্থলে, ... আনা নিরীখে খাজানা আদায় করি। উপরি নিরীখের মধ্যে বহুদিন প্রচলিত কোম্পানী বাট্টা প্রতি টাকায় ১০ আধ আনা মাত্র। ইহাতেও প্রজাবিদ্রোহী। আমরা মনে করিলে পার্শ্ববর্ত্তী নিয়মানুসারে অনায়াসে খাজানা আদায় করিতে পারি, কিন্তু প্রজার কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করি না ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছাও করি না। আমাদিগের প্রদেশীয় প্রজাগণ যে কি নিমিত্ত খাজানা বন্ধ করিয়াছে ও বড়াই করিতেছে, বলিতে পারি না। ইহাদের পাট্টাদি কিছুই নাই। জমীদার ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইলে যে অনায়াসে কর বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাশয়! দুঃখের কথা বলিতে এই কথা মনে হইল। আমি বিদ্রোহীতা নিবারণ করিতে একদিন চাকলা নামে এক মহলে গিয়াছিলাম। প্রজারা আমার জীবন নাশের অভিসন্ধিতে নৌকা জল মগ্ন করে। সৌভাগ্য ক্রমে আমি নৌকায় ছিলাম না। আমি যে তাহাদিগের নিকট কিসে অপরাধী তাহা তাহারাই জানে। ইতি

প্রজাপীড়িত
জনৈক ক্ষুদ্রজমীদার
চাটমোহর রামনগর।[২৪]

প্রজাবিদ্রোহ, লেপ্টন্যান্ট গবর্ণর ও নোলেন সাহেব

পাবনা অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম ফল অতি আশ্চর্য্য। একদিকে যেমন ইহার প্রভাবে ভূয়ঃ অনিষ্ট ঘটিয়া মানুষ্য সমাজকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, অন্যদিকে স্থিরচিত্রে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীক হইবে, ইহার দ্বারা ভাবী মঙ্গল সাধনের একটি সুন্দর পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ... পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন কি সামাজিক কি নৈসর্গিক সর্ব্বপ্রকার ঘটনাই কোন না কোন কারণ লইয়া সংগঠিত হয়, এবং সময়ে তাহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকারে অনুভব করা যায়। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, বিগত ফাল-পুসিয় যুদ্ধের অবসানে কি মঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে? আমরা ইহার উত্তরে এই বলি, অতিশয় বাড়াবাড়ী ভাল নয়, গর্ব্বক্ষয়, ইহাই মনুষ্যগণের উপদেশ আদর্শভাবী মঙ্গল সাধক। অনেকে নেলেন সাহেবের অভিজ্ঞতা, পক্ষপাত ব্যবহার উল্লেখ করিয়া বিস্তৃতরূপে লেখনী সঞ্চালন করিয়া স্বীয়২ বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন, ক্যাম্বেল সাহেবের দৃঢ়তর আদেশের প্রতিবাদ করিয়াও অনেক স্থলে বাচালতাও প্রকাশ করিয়াছেন। নোলেন সাহেব সিরাজগঞ্জে না থাকিলে এবং উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্যাম্বেল সাহেব আদেশ প্রদান না করিলে, এত দিবস হয় জমীদার না হয় প্রজাকুল নিস্ফল প্রায় হইত। সম্প্রতি প্রজাগণের মধ্যে অনেকের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের প্রতি সদয় ও মঙ্গল লিপসু। তজ্জন্য তাহারা গবর্ণমেন্টের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইতেছে। নোলেন সাহেবকে ধন্যবাদ, আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতেছে। আমরা জমীদার মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, প্রজাদিগের গবর্ণমেন্টের প্রতি এই ভক্তিভাব দেখিয়া উপদিষ্ট হউন, ইহাই আমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য ও সীমা। কোন বহুদর্শী ভদ্র ব্যক্তির প্রমুখ খাৎ আমরা প্রজাগণের এই রাজভক্তির পরিচয় ব্যক্ত হইতে শুনিয়াছি, বস্তুতঃ এই রাজভক্তি প্রজাগণের দুর্ব্বল মন সরল করিয়া তুলিবে। সময়ে তাহারা ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের ইষ্টানিষ্ট গণনা করিতে পারিবে। ভয়, ক্রোধ ঔদ্ধত প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে যতই দূর্বীকৃত হইবে ততই মঙ্গল।[২৫]

আমরা জানি, সভ্যতম ইংলিশ গবর্ণমেন্টের রাজনীতি এই যে, লোকে যতক্ষণ অপরাধী বলিয়া গণ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহ তাহাদিগের প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না, অপরাধীও ব্যবস্থানুসারে দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। নবাবি সময়ের ন্যায় স্বেচ্ছা-ব্যবস্থায় দণ্ডিত হয় না। পাবনা হইতে কোন প্রধান ব্যক্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা বিস্মিত হইলাম। সিরাজগঞ্জ প্রদেশীয় যে সকল প্রজা, বিদ্রোহী সন্দেহক্রমে বৃত হইয়াছে, পাবনার প্রকাশ্য পথে পশুর ন্যায় দাঁড় করাইয়া, কনষ্টেবলেরা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া থাকে। এই সম্বাদ যদি সত্য হয়, তবে বিধিবহির্ভূত প্রদেশ আর কাহাকে বলে? কোকাহত্যাকারী কোয়ান সাহেবের ন্যায় প্রজাদিগকে যে এতদিন তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, সেই আশ্চর্য! বোধ করি, আমাদিগের লেপটেনেন্ট গবর্ণর কেম্বেল বাহাদুর, তাড়াতাড়ি ঘোষণাপত্র প্রকাশ না করিলে, জঙ্গল গ্রামবাসী প্রজাদিগের ন্যায় পাবনা অঞ্চলের প্রজাদিগেরও দুর্দ্দশা হইত এবং কোকাদিগের ন্যায় এই দুঃখিলোকেরা তোপের মুখে সপরিবারে জীবনে আহুতি দিত। লেপটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর যে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে এই দুর্ব্বল লোক দিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে, তাঁহার এই যশঃ উজ্জ্বল বুধ নক্ষত্রের ন্যায় বঙ্গদেশে চিরকাল প্রকাশিত থাকিবে। আমরা প্রার্থনা করিতেছি, বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রজারা দণ্ডভোগ করব, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সেপর্য্যন্ত যেন কেহ নির্যাতন সহ্য না করে, সে বিষয়ে তিনি মনোযোগ বিধান করুন।[২৬]

.... বাস্তবিক নগরবাসিরা যেমন নগরাদির অবস্থা পর্য্যাপ্তরূপ অবগত হইতে পারেন, মফস্বলবাসিরা ও তদ্রুপ মফস্বলের অবস্থাদি সম্যক অবগত হইতে পারেন। আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার, পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষতঃ রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখি প্রজাদিগের দুঃখের দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন? করিতেও লজ্জা বোধ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, অদ্য কয়েক সপ্তাহ কেবল প্রজাদিগের প্রতিকূল পক্ষই অবলম্বনের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, সম্প্রতি ১০ই শ্রাবণের অমৃতবাজারে প্রকাশিত কয়েক পঁক্তিপাঠ করিয়া আমরা একেবারে অবাক হইয়াছি। একস্থানে লিখিত হইয়াছে, "প্রকৃতই যদি রাজসাহীর কমিসনর জমীদারদিগকে কম হারে খাজানা লইয়া প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আজ্ঞা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার অর্থ কি?" ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আজ্ঞা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে কিছুই অনুভব করিতে পারি না। আমরা বলি, মহামান্য কমিশনর সাহেব, যদি এই প্রকার আজ্ঞা প্রচার করিয়া থাকেন এবং নিজে মধ্যস্থ হইয়া জমীদার ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে কেম্বল বাহাদুরের প্রচারিত ঘোষণা এবং তাঁহার আজ্ঞা অবশ্যই সুফল প্রসবিনী হইবে সন্দেহ নাই। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে এতদ্বারা নিন্দা বা প্রশংসা করি না, সর্ব্বোন্তঃকরণে বলি, তিনি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকৃত দেশ হিতৈষীতা প্রদর্শন করুন। জমীদার ও প্রজার মধ্যে যাহাতে চিরশান্তি স্থাপিত হয়, ও যাহাতে উভয়পক্ষই রক্ষা পায়, প্রধান২ পত্র সম্পাদকদিগের তদ্রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় প্রজাগণ নিতান্ত মূর্খ, দুর্ব্বল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ শূন্য। কিসে আপনাদিগের ভালমন্দ হয় কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা অহ রহ যেরূপ প্রবল জমীদারদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, যদি পত্রিকা সম্পাদক ও গবর্ণমেন্ট, তাহাদের প্রতিভূ না হন, তবে তাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়া যে বিপথগামী হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?[২৭]

এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ।

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ঘটিত সমাচার সংগ্রহ করিয়া রাজসাহী বিভাগের কমিশনর সাহেব গবর্ণমেন্টে যে বিজ্ঞাপনী প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পাবনা জেলার অন্তর্গত ইসফসাহী পরগণাতে বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং ঐ স্থানেই উহা প্রধানরূপে প্রবল হইয়াছিল। পরগণা অতি বৃহৎ। উহাতে ২৭২টী ভিন্ন ভিন্ন মহলে ৬৯৫টা গ্রাম আছে। কলিকাতার ঠাকুরেরা, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, শলপের সান্ন্যালেরা, পোর্জ্জনার ভাদুড়ীর এবং স্থলেব পাকড়াশীরা উক্ত পরগণার প্রধান জমিদার। কতিপয় বৎসর যাবৎ জমিদারগণ প্রাণপণে খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রজারাও দৃঢ়তাসহকারে বেশি না দিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিবাদের এই সূত্র। ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের জমিদারিতেই এই বিবাদের প্রথম অভ্যুত্থান হয়। ইঁহারা ১৮৭২ অব্দে এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে অনেক প্রজার নিকট হইতে নানা প্রকার জমা বন্দোবস্তে কবুলিয়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলো গ্রামের প্রজারা বর্দ্ধিত হারের কিছুতেই সম্মত হয় নাই। ঐ সকল গ্রামের দুইটি গ্রামের প্রজাদিগের নামে সাজাদপুরের মুনসেফি আদালতে বাকি খাজানার নালিশ উপস্থিত হয়। তাহারা বর্দ্ধিত হারে কর দিতে স্বীকার না করায় জমিদারেরা তাহাদের নিকট হইতে খাজানা লয়েন নাই। তাহাদের যাহা ন্যায্য দেয় বলিয়া বোধ ছিল, তাহা তাহারা আদালতে জমা দেয়। মুনসেফ জমীদারদিগের সপক্ষে ডিক্রী দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭২ ডিসম্বর মাসে রাজসাহী জর্জ তাহার অন্যথা করেন এবং প্রজারা যে টাকা জমা দিয়াছিল, তাহারই ডিক্রী দেন, ঐরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ১২৯টি। ঐ সকল মোকর্দ্দমার কোনটীতে বাস্তু বিঘা প্রতি .... আনা এবং ফসলি বিঘা প্রতি .... কোনটীতে বাস্তু বিঘা প্রতি .... ও ফসলি বিঘা প্রতি ... দাবি করা হইয়াছিল; কিন্তু উভয় স্থলেই .... করিয়া ডিক্রী হয়। জমিদারেরা পূর্ব্ব প্রদত্ত বলিয়া যে হারের দাওয়া করিয়াছিলেন, তাহার

প্রজা বিদ্রোহ বল প্রয়োগ করে নয়, মীমাংসার জন্য যে চুক্তি হওয়া দরকার, তার দিকেই বারবার গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সরব হয়েছে। প্রজাদের লুটতরাজের খবর এসেছে, বাড়িঘর পোড়ানোর খবর মুদ্রিত হয়েছে। তবু গ্রামবার্ত্তা শেষ অবধি জানিয়েছিল যে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না। তবে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রজারা দণ্ডভোগ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিনা দোষে যেন প্রজাদের নির্যাতিত না হতে হয়

নিদর্শন দেখাইতে পারেন নাই। এই প্রকার মোকদ্দমা সকলে, প্রজাদিগের মনে জমিদারের প্রতি বিষম বিরাগ উৎপন্ন হয়।

গত জুন মাসের শেষ ভাগে জমীদারদের বিপক্ষে দল বান্ধিবার নিমিত্ত চারিদিকে চর প্রেরিত হইতে লাগিল। তাহারা ভয়মৈত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাসকলকে একমতে আনিতে লাগিল। বাঙ্গালী জনতাকে যাহাই বুঝাইয়া দাও বিশ্বাস করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করে। জমীদারদের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব-শত্রুতা ছিল এবং যে সকল মন্দ চরিত্রের লোক, তাহারা ঐ দলে আপনা হইতেই মিশিয়া যাইতে লাগিল এবং লুঠপাট আরম্ভ করিল। সুতরাং ঐ দলের যাহা উদ্দেশ্য তাহা অকার্য্যে পরিণত হইল এবং চারিদিকে ঘোরতর অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হইল। লোকের অর্থদণ্ড, গৃহভঙ্গ লুণ্ঠন প্রভৃতি কিছুই অকৃত্য রহিল না। ম্যাজিস্ট্রেট টেলার সাহেব বলেন, দরখাস্তে প্রকাশ পায় ১লা জুলাই পর্য্যন্ত ২৬৯টী গ্রামের লোক এই প্রকারে সমবেত হয় এবং ক্রমাগতই লোক আসিয়া দলে জুটিতে থাকে। এবং ১৪ই জুলায়ের পত্রে তিনি ব্যক্ত করেন যে, দল এখনও উল্লা– পাড়ার দিকে প্রসৃত হইতেছ। ঐ দিন প্রায় বার খানি দরখাস্তে ঐ বিষয়ে উল্লেখ থাকে। অধিকাংশ দরখাস্তেই বলে যে, তাহারা জমিদারের কর বৃদ্ধি প্রস্তাবে বক্রতা প্রদর্শন করায়, তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন হয় নাই। টেলার সাহেব আরও বলেন যে, বিদ্রোহীরা নূতন ঘোষণাপত্রের প্রশংসা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, এতদ্বারা কর বৃদ্ধি প্রার্থনায় বাধা দিতেই তাহারা অনুমত হইয়াছে, এবং জমিদারের মোক্তারের ইহার বিষয়ে আপত্তি করিতেছে।

টেলার সাহেবের রিপোর্টেই বাহির হয়, জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রজারা আইন-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে নাই .... বিবেচনা করিয়া টেলার সাহেব গোপালনগর যাইতেছিলেন, কিন্তু শুনিলেন ২০০০ লোক মধুরা পুলিষ থানা এবং পোস্ট আফিস ঘেরাও করিয়াছে, এবং নাকালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন তিনি কতকগুলি কনস্টেবল নিযুক্ত করিয়া এবং আতাইকূলায় আগন্তুক কতিপয় প্রধান বিদ্রোহীকে তাঁহার আড্ডায় লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া জেলার পূর্ব্বাঞ্চল গমন করিলেন। মধুরায় আসিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে। তথা হইতে নাকালিয়ায় আসিলেন এবং বিদ্রোহের তদন্ত করিতে লাগিলেন, ৬০/৭০ জন লোককে বিদ্রোহীতা অপরাধে ধৃত করিয়া পাঠাইলেন, ৪০ জন লোককে বাঁধিলেন এবং সমস্ত নিকটবর্ত্তী গ্রামে অতিরিক্ত কনেষ্টবল নিযুক্ত করিয়া সাগরকান্দিতে উপস্থিত হইলেন। তথায়ও ভয়ানক উপদ্রব ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক ঐ সকল কার্য্যে অভিপ্রেত ফল দর্শিয়াছিল। তাহার পর গত দুই পক্ষ আর কোন উপদ্রবের কথা শুনা যায় নাই। টেলার সাহেব, অতিরিক্ত পুলিষ দিয়া অবশিষ্ট তদন্তের ভার ডিস্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিন্টেডেন্টের উপর অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় হেড কোয়ার্টারে প্রত্যাবৃত্ত হন। মোলান সাহেবও উপস্থিত ব্যাপারে অতিশয় দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একটি ব্যতীত বিদ্রোহ ঘটনার প্রত্যেক স্থানেই গমন করেন, এবং শাখতোলায় যেপ্রথম উপদ্রব হয়, তাহাতে লিপ্ত কতিপয় অপরাধীকে দণ্ড দেন। দুইজন বিদ্রোহীকে অর্থদণ্ডসহ তিনি তিন বৎসর....[২৮]

নোলেন সাহেব ও প্রজাবিদ্রোহিতা।

অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্র পাঠে অবগতি হইতেছে, অনেকে পাবনা প্রদেশীয় প্রজাবিদ্রোহীতার কারণ সিরাজগঞ্জের আসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেঃ পি, নোলেন সাহেব ও তৎপ্রদেশীয় জনৈক ধনী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র রায়কে নিশ্চয় করিতে যত্ন করিতেছেন। আমরা নোলেন সাহেবের চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি, তিনি একজন নিরপেক্ষ বিচারপতি। জমীদারপীড়িত প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়া, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার দয়া হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু তিনি যে গর্হিত কার্য্য করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে নাই ঈশান বাবু ও বিদ্বান ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি কোন প্রজাকে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা সম্ভব পর নহে। তবে দশ চক্রেভগবান ভূত হইবে ইহা আশ্চর্য নহে। বাস্তবিক বিনা বাতাসে গাং নড়েনা। প্রজাগণ অবশ্যই অত্যাচারিত হইয়াছে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। লুঠের কারণ অন্য২ বদমাইস লোক হইতে পারে তাহাদিগকে শাসন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রজাগণ যে নোলেন সাহেবের অনুগত, সে তাহাদের স্বাভাবিকতা সরলতা ও ইংলিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ততার চিহ্ন। দুঃখ কাতর মুখ দেখিয়া যে স্নেহ করে, কুকুরের মত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা, গ্রাম ও পল্লীবাসি লোকের স্বভাব তন্নিমিত্ত নোলেন সাহেব দোষী হইতে পারেন না।[২৯]

১৮৭৩-এ পাবনার প্রজাবিদ্রোহের আঁচ বঙ্গদেশের অন্যান্য জায়গায় প্রজাদের মধ্যেও লেগেছিল, এমন আভাসও পাওয়া যায়। গ্রামবার্ত্তার উপরোল্লিখিত খবরাখবর থেকেই তা স্পষ্ট। বিভিন্ন অঞ্চলের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যে প্রজাবিদ্রোহ পাবনায় হয়েছিল, তার কারণ, গতিপ্রকৃতি ও পরিণতি গ্রামবার্ত্তার প্রতিবেদন, প্রেরিত চিঠি, সংবাদ থেকে পাওয়া যায়। কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা বা এডুকেশন গেজেটের মনোভাবও কোন দিকে ছিল, গ্রামবার্ত্তা সে খবরও মুদ্রিত করেছে বিশ্লেষণ করে।

ঈশান রায় কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন, কেন ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদারিতেই এই বিবাদের অভ্যুত্থান হয়, গ্রামবার্ত্তার লেখনী থেকেই বিস্তারিত জানা গেছে। কতগুলো মোকদ্দমা সেই সময়ে হয়েছিল, সরকারের মতামত কোনদিকে গিয়েছিল বা প্রজাবন্ধু লোলেন সাহেবের ভূমিকাও সুস্পষ্ট করেছিল গ্রামবার্ত্তা। শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে তৎকালীন গভর্নর ক্যাম্বেল সাহেবের কঠোর সমালোচনা করেছিল গ্রামবার্ত্তা। কিন্তু পাবনার প্রজাবিদ্রোহে ক্যাম্বেল সাহেবের সঠিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেও গ্রামবার্ত্তা প্রস্তুত ছিল। ১৮৭৩ সালের জুলাইয়ের সাপ্তাহিক একটি সংখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে গ্রামবার্ত্তা ক্যাম্বেল বাহাদুরের প্রশংসা করে সরাসরি লিখেছিল যে, 'বিচার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কোনো প্রজাকে নির্যাতন সহ্য করতে না হয় সে বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।'

প্রজা বিদ্রোহ বল প্রয়োগ করে নয়, মীমাংসার জন্য যে চুক্তি হওয়া দরকার, তার দিকেই বারবার গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সরব হয়েছে। প্রজাদের লুটতরাজের খবর এসেছে, বাড়িঘর পোড়ানোর খবর মুদ্রিত হয়েছে। তবু গ্রামবার্ত্তা শেষ অবধি জানিয়েছিল যে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না। তবে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রজারা দণ্ডভোগ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিনা দোষে যেন প্রজাদের নির্যাতিত না হতে হয়। শান্তিপ্রিয় বাংলার প্রজাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মানসিকতা নেই। যতদূর সম্ভব প্রজারা শান্তি বজায় রাখতেই আগ্রহী। এমন তীক্ষ্ণ ও তীব্র প্রতিক্রিয়া জমিদারদের পক্ষে যায়নি। গ্রামবার্ত্তার ওপর জমিদারদের তাই সুনজর ছিল না। বরং বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে পত্রিকাকে। আর সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার সেই আপসহীন মানসিকতা বজায় রেখেই গ্রামবার্ত্তাকে প্রজার নিরপেক্ষ ও নির্ভীক মুখপত্র করে তুলেছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. Pabna District Gazetters, P-25 http:bd1.handle.net/10689/10184
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭২ জুন ৩য় সপ্তাহ, জমীদার, পৃ. ৩
৮. ঐ
৯. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ,
১০. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, মে, পৃ. ৩
১১. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, মে, পৃ. ৩
১২. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুন, ৪র্থ সপ্তাহ, পৃ. ১
১৩. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুন, পৃ. ২-৩
১৪. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, আষাঢ়, ২য় সপ্তাহ, পৃ. ১-২
১৫. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, আষাঢ়, ২য় সপ্তাহ, পৃ. ৪
১৬. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, আষাঢ়, পৃ. ৪
১৭. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, শ্রাবণ, পৃ. ২
১৮. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, ৮ ভাদ্র, পৃ. ২
১৯. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ২৩ আগস্ট, পৃ. ৩
২০. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ৬ সেপ্টেম্বর, পৃ. ৩
২১. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ভাদ্র, পৃ. ৪
২২. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ১২ আশ্বিন, পৃ. ২
২৩. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ২৫ অক্টোবর, পৃ. ১
২৪. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৮০, ১৫ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২
২৫. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, ডিসেম্বর, পৃ. ৩
২৬. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুলাই, পৃ. ৩
২৮. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুলাই, পৃ. ৩
২৯. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুলাই, পৃ. ৩
৩০. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩, জুন, পৃ. ৩

লেখকঃ সাহিত্যিক ও গবেষক, ইন্ডিয়া

গণমাধ্যম সংবাদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'গণমাধ্যম চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদসহ অতিথিরা

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া সুন্দর দেশ বা সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। সুন্দর দেশ গঠনে গণমাধ্যমের বিকাশ ও মুক্ত গণমাধ্যম অপরিহার্য। তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতের পাশাপাশি দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অপপ্রয়োগ নিয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিকের দায়িত্ব সাংবাদিক পালন করবেন। এক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ কারও কাম্য নয়। তবে কোথাও কোথাও এ আইনের অপপ্রয়োগ যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না।

২ মে জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস-গণমাধ্যম চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম।

ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় সভায় 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি' বিষয়ক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন গাজী টিভির নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। তিনি বলেন, গণমাধ্যম একটি বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি জানান, এখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। সংবাদ যদি পরিবেশিত হয়, সেটি সত্য নাকি মিথ্যা, তা তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গণমাধ্যমকর্মীরা আজ ঝুঁকির মধ্যে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। যাদের বিরুদ্ধেই সাংবাদিক লিখেছেন, তারাই তাদের আঘাত করছে, হত্যা করছে। হত্যার হুমকি দিচ্ছে। আমরা যেমন সরকার, মালিক পক্ষের নিয়ন্ত্রণ চাই না, তেমনি মাফিয়া চক্রের নিয়ন্ত্রিত হতেও চাই না।

সভাপতির বক্তব্যে সাইফুল আলম বলেন, গণমাধ্যম গণমানুষের মুখপাত্র। গণমানুষের ভাবনার কথা, তাদের চিন্তার কথা আমাদের বলতে হবে। গণমানুষের কথা লিখতে গিয়ে গণমাধ্যম কতটা সফল হচ্ছে, সাংবাদিকরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারছেন, কিংবা পারছেন কি না, তা জানতে হবে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে গণতন্ত্রের ঘাটতি আছে বলেই স্বাধীনতা সূচকে গণমাধ্যম চার ধাপ পিছিয়েছে। সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে।

সভায় আরও বক্তব্য দেন ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি মো. ওমর ফারুক, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক খন্দকার মুনীরুজ্জামান, আবদুল কাইয়ুম, কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

সূত্র: ৩ মে ২০১৯, ইত্তেফাক

পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন মিয়ানমারে বন্দি দুই সাংবাদিক

মিয়ানমারের উগ্রপন্থি বৌদ্ধ এবং দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ১০ রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশ করে ১৫ এপ্রিল সাংবাদিকতায় সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার পুলিৎজার জিতে নিয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সের দুই সাংবাদিক। রোহিঙ্গা হত্যার এ প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়েই আটক হয়েছিলেন তাঁরা। মিয়ানমারের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ভঙ্গের দায়ে বর্তমানে তাঁরা সাত বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত ওই দুই সাংবাদিক হলেন ওয়া লোন এবং কিয়াও সোয়ে ও।

গত বছরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ইন দিন গ্রামে সংঘটিত গণহত্যার চিত্র তুলে এনেছিলেন এ দুই সাংবাদিক। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রথমবার মিয়ানমার সেনাবাহিনী ১০ রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া এ বছর আরও একটি পুলিৎজার জিতে নিয়েছে রয়টার্স।

আরও যারা পুলিৎজার জিতেছে: বন্দুকধারীর গুলিতে পাঁচ সহকর্মী নিহতের সংবাদ প্রকাশ করে এ বছর পুলিৎজার জিতেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় দৈনিক ক্যাপিটাল গেজেটও। গত বছর মেরিল্যান্ডের ক্যাপিটাল গেজেট কার্যালয়ে আচমকা প্রবেশ করা বন্দুকধারীর গুলিতে সাংবাদিক জন ম্যাকনামারা, ওয়েন্ডি উইন্টারস, রেবেকা স্মিথ, গেরাল্ড ফিশম্যান ও রব হিয়াসেন নিহত হন। বার্তাকক্ষে গুলি-হত্যাকাণ্ডের মুখেও পরদিন ওই খবরসহ পত্রিকা প্রকাশের সাহস দেখানোর কারণেই পত্রিকাটিকে বিশেষ স্বীকৃতি ও এক লাখ ডলার পুরস্কার দিয়েছে পুলিৎজার কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: ১৭ এপ্রিল ২০১৯, সমকাল

বাচসাস'র ৫০ বছর পূর্তি ও পুরস্কার বিতরণ

দেশের সবচেয়ে প্রাচীন সাংবাদিক সংগঠন বাচসাস ৫০ বছর পূর্ণ করল। এ উপলক্ষ্যে ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনের প্রধান মিলনায়তনে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করে সংগঠনটি। আসরে চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীদের হাতে গত পাঁচ বছরের (২০১৪-২০১৮ সাল) পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন চিত্রনায়ক আলমগীর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এই আসরে ইমেরিটাস পুরস্কার পান সৈয়দ হাসান ইমাম, সাবিনা ইয়াসমিন ও ফরিদুর রেজা সাগর।

সূত্র: ৭ এপ্রিল ২০১৯, ইত্তেফাক

বজলুর রহমান স্মৃতি পদক দিচ্ছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

সাংবাদিক ফখরে আলম পেলেন বজলুর রহমান স্মৃতিপদক

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০১৮ পেয়েছেন কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি ফখরে আলম। ১১ এপ্রিল রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে তাঁর হাতে এ পদক ও এক লাখ টাকার সম্মাননা চেক তুলে দেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ১৪টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সেরা প্রতিবেদক হিসেবে ফখরে আলমকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জুরি বোর্ডের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বক্তব্য দেন জুরি বোর্ডের সদস্য রোবায়েত ফেরদৌস ও খন্দকার মুনীরুজ্জামান।

সূত্রঃ ১২ এপ্রিল ২০১৯, কালের কণ্ঠ

ক্র্যাবের বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন পাঁচ সাংবাদিক

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বর্ষসেরা রিপোর্টের পুরস্কার পেলেন সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ। 'নেশার জগতে পথশিশু' শিরোনামে ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বকুল আহমেদ ছাড়া আরও চারজন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। ১২ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ক্র্যাবের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির 'অভিষেক-২০১৯' অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিবছর বর্ষসেরা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার দেয় ক্র্যাব। এবার দেওয়া হয় ২০১৮ সালের বর্ষসেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার। এছাড়া অনুসন্ধানী ক্যাটাগরিতে বণিক বার্তার আয়নাল হোসেন, যমুনা টেলিভিশনের আবদুল্লাহ তুহিন, মানবাধিকার ক্যাটাগরিতে সাজ্জাদ পারভেজ ও মাদকবিষয়ক ক্যাটাগরিতে নয়া দিগন্তের আমিনুল ইসলাম সেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার পেয়েছেন।

সূত্রঃ ১৩ এপ্রিল ২০১৯, সমকাল

চার সাংবাদিক পেলেন সাইবার অপরাধ পুরস্কার

'সাইবার অপরাধ ও সহিংস উগ্রবাদবিষয়ক সাংবাদিকতা ফেলোশিপ-২০১৯' পুরস্কার পেলেন চার সাংবাদিক। সাইবার অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য তাঁদের ফেলোশিপ সনদ, সম্মাননা স্মারক এবং সম্মানি হিসেবে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

১৯ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন।

'সাইবার অপরাধ বাড়ছে: প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যক্রম নেই' প্রতিবেদনের জন্য দৈনিক সমকালের সাজিদা ইসলাম পারুল, 'সামাজিক মাধ্যম: আপনি নিজে গুজব ছড়াচ্ছেন না তো?' প্রতিবেদনের জন্য বিবিসি বাংলার ফয়সাল মো. তিতুমীর, 'প্রতি সেকেন্ডে সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছে হাজারো মানুষ' প্রতিবেদনের জন্য নিউজ২৪-এর সিউল আহমেদ এবং 'আইনের আশ্রয় নিতে অনীহার কারণে বাড়ছে সাইবার ক্রাইম' প্রতিবেদনের জন্য এনটিভির আরাফাত আলী সিদ্দিকী এ পুরস্কার পেয়েছেন।

সূত্রঃ ২০ এপ্রিল ২০১৯, সমকাল

নারী উন্নয়ন শক্তি পুরস্কার পেলেন সাত সাংবাদিক

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধবিষয়ক সংবাদের জন্য সংবাদপত্র ও টেলিভিশন প্রতিবেদকদের পুরস্কৃত করেছে এ নিয়ে কাজ করা সংগঠন নারী উন্নয়ন শক্তি। ২১ মে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সাত সাংবাদিকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক ড. আফরোজা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএনবির সম্পাদক মাহফুজুর রহমান ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল হসপিটালের ডিরেক্টর (অপারেশন অ্যান্ড মার্কেটিং) ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক।

দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ যাচাই-বাছাই শেষে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন দৈনিক যুগান্তরের রীতা ভৌমিক, দৈনিক ইত্তেফাকের নাছিমা খাতুন, দৈনিক অর্থনীতির কাগজের এহছানুল হক খান ও দৈনিক জনকণ্ঠের ওয়াজেদ হীরা। টেলিভিশন থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাভিশনের শারমিন ইব্রাহিম, নিউজ টোয়েন্টিফোরের শেখ হুমায়ুন কবীর সূর্য ও মোহনা টিভির নাজনীন আক্তার।

সূত্রঃ ২২ মে ২০১৯, সমকাল

গার্ডিয়ান-ওয়াশিংটন পোস্ট ব্লক করল চীন

তিয়েনআনমেনের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে এ পদক্ষেপ

গার্ডিয়ান ও ওয়াশিংটন পোস্ট ব্লক করল চীন। এতদিন ইন্টারনেটে এসব পত্রিকা সেদেশের নাগরিকরা পড়তে পারলেও এখন থেকে তারা আর সেগুলো পড়তে পারবে না। এতে করে অনলাইনে ওই দুটি পত্রিকা পড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

'সাইবার অপরাধ ও সহিংস উগ্রবাদ বিষয়ক সাংবাদিকতা ফেলোশিপ-২০১৯' পুরস্কারপ্রাপ্ত চার সাংবাদিক

দেশটিতে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং উইকিপিডিয়া, নিউইয়র্ক টাইমস, ব্লুমবার্গ, কুয়ার্টজ, রয়টার্স, ওয়াল স্ট্রিটসহ বেশকিছু ইংরেজি নিউজ সাইট আগে থেকেই বন্ধ ছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো ওয়াশিংটন পোস্ট ও গার্ডিয়ান পত্রিকা। সাম্প্রতিক সময়ে অন্য জনপ্রিয় নিউজ সাইটগুলো বন্ধ থাকায় চীনের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের কাছে অন্যতম ছিল ওয়াশিংটন পোস্ট ও গার্ডিয়ান। ৪ জুন তিয়েনআনমেন স্কয়ারের ঘটনার ৩০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চীনা সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইচ্যাটে ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সব ছবি ও শব্দ ব্লক করছে।

সূত্র: ১১ জুন ২০১৯, ইত্তেফাক

আফগানিস্তানে নারী সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

আফগানিস্তানে এক নারী সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১১ মে দেশটির রাজধানী কাবুলে নিজ বাড়ির পাশে তাঁকে গুলি করা হয়। দুই বন্দুকধারীর উপর্যুপরি গুলিতে নিহত হন নারী সাংবাদিক মিনা মঙ্গল। তিনি দেশটির একজন জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক এবং পার্লামেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন।

আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নারী মুখপাত্র নাসরত রাহিমি জানান, প্রাথমিকভাবে জানা যায়, মোটরসাইকেলে চেপে দুই বন্দুকধারী হামলা চালিয়েছে।

এক দশকেরও বেশি সময় সাংবাদিকতার কাজ করেছেন মিনা। তাছাড়া আরিয়ানা টিভি, সামশাদ টিভিসহ একাধিক টিভি চ্যানেলের উপস্থাপক ছিলেন তিনি। সম্প্রতি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন মিনা।

সূত্র: ১৩ মে ২০১৯, কালের কণ্ঠ

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আবির সাধারণ সম্পাদক নিবিড়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) ২০১৯ সেশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে সদস্যদের ভোটে এক বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডেইলি নিউ নেশনের রায়হানুল ইসলাম আবির এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মাহদী আল মুহতাসিম নিবিড়। ৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) সংগঠনের কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রনি নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। ফল ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশনার রিয়াদুল করিম, সমিতির বিদায়ী কমিটির সভাপতি এ আর এম আসিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান নয়ন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নয় সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের আবু রাকিব, যুগ্ম সম্পাদক ইউএনবির মো. ইমরান হোসেন, অর্থ সম্পাদক মানবজমিনের মুনির হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক সারাবাংলা ডট নেটের কবিরুল ইসলাম, সিনিয়র কার্যনির্বাহী সদস্য পদে বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সাজ্জাদুল ইসলাম কবির এবং বাকি দুটি কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক নয়া দিগন্তের মো. ইসমাঈল হোসেন ও বাংলাদেশ অবজারভারের আবদুর রাজ্জাক সোহেল।

সূত্র: ৭ এপ্রিল ২০১৯, ইত্তেফাক

জামালপুরে সাংবাদিক ফাগুনের লাশ উদ্ধার

জামালপুর সদর উপজেলার রানাগাছা মধ্যপাড়া রেললাইনের পাশ থেকে অনলাইন নিউজ পোর্টাল প্রিয় ডটকমের সহকারী সম্পাদক ইহসান ইবনে রেজা ওরফে ফাগুনের (২১) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। জামালপুর রেলওয়ে পুলিশ ২১ মে রাতে তার লাশ উদ্ধার করে। ফাগুন শেরপুর জেলার এনটিভির সিনিয়র সাংবাদিক কাকন রেজার ছেলে। শেরপুর শহরের চকবাজার এলাকায় তাদের বাড়ি।

কাকন রেজা জানান, ২১ মে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মোবাইল ফোনে ছেলে ফাগুনের সঙ্গে তার শেষ কথা হয়। সে তখন তাকে জানায়, ঢাকা থেকে বাসে সে শেরপুরের বাড়িতে আসছে। এরপর রাতে আর বাড়ি ফেরেনি ফাগুন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান মেলেনি। পিবিআইর দেওয়া তথ্যমতে ২২ মে সন্ধ্যায় জামালপুর মর্গে গিয়ে কাকন রেজা ছেলের লাশ শনাক্ত করেন।

সূত্র: ২৩ মে ২০১৯, সমকাল

প্রযুক্তি ক্ষমতাবানদের দুর্গে আঘাতের আহ্বান টাইমস সম্পাদকের

সম্পাদক সমাজের বার্ষিক স্যাচওয়েল বক্তৃতায় টাইমস সম্পাদক জন উইথরো ডিজিটাল জায়ান্ট গুগল ও ফেসবুক বর্জনের ডাক দিয়েছেন। তার ধারণা, ভবিষ্যতে বিবিসি'কে সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস দিতে বাধ্য করা হবে। ১০ জুন সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল লন্ডনের স্টেশনার হলের বক্তৃতায় উইথরো এসব কথা বলেন।

তার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল, নয়া ডিজিটাল যুগে কীভাবে গুণগত সাংবাদিকতা টিকে থাকবে। উইথরো বলেন, 'ফেসবুক ও গুগল ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের রাজস্ব নিচ্ছে। তাদের প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করছে এমন অনুলিপিগুলোর ন্যায্যমূল্য দিতে তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। শুধু বাণিজ্যিক সফলতার জন্য অনিয়মতান্ত্রিক, অনিরীক্ষিত এবং সম্পাদনা ছাড়াই তথ্য আমাদের সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে উইথরো রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যম বিশ্ব সম্পর্কে বলেন, 'ভবিষ্যতে ইন্টারনেট জায়ান্টগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাদেরকে প্রকাশক হিসেবে গণ্য করে প্রিন্ট ও অনলাইন একই আইনের দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। আমি আশা করি, তাহলেই প্রযুক্তি ক্ষমতাবানদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।'

যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম পরিবেশনকারী সংস্থা ন্যাশনাল সার্ভিংয়ের সম্পাদক উইথরো আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যদি ট্রাম্প সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয় তবে প্রযুক্তি মোগলদের নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃত সম্ভাবনা আছে। গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমের প্রতি হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে এবং সেজন্য আমাদের এখন কী করতে হবে? আমাদের সংবাদ কাভারেজের ক্ষেত্রে অনেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে নেতিবাচক স্লোগান থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে। পুরোনো প্রবাদ অনুযায়ী সংবাদ হওয়া উচিত– এমন যে কেউ কিছু কোথাও দমন করতে চায়। আমরা নোংরা এবং অপরাধ ও অপরাধীদের উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে সহজেই সংবাদ-গল্প খুঁজে বের করি।

অবশ্যই এটা আমাদের করা উচিত। গঠনমূলক সংবাদের উদ্দেশ্যে যখন পাঠকের ক্ষমতায়ন, তখন আমাদের কী করনীয় সে বিষয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। বিবিসি'কে চূড়ান্তভাবে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ফি থেকে স্বেচ্ছাসেবী সাবস্ক্রিপশনে সরানো যাবে। তার মতে, সব মিলিয়ে আমাদের সামনে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কোনো বিকল্প নেই।

স্বল্পমেয়াদি পূর্বাভাসের কোড ভেঙে ফেলতে হবে। যেমন– বরিস জনসন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন, আমরা ব্রেক্সিট অর্জন করব বা আগামী বছর ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হবেন। আপনার ভালো না-ও লাগতে পারে কিন্তু এ ধরনের পূর্বাভাস বন্ধ করতে হবে এবং এর ফল পেশাগত কল্যাণ বয়ে আনবে।

যাই হোক না কেন, এটা আকর্ষণীয় হতে যাচ্ছে। সাংবাদিকতার বিষয়ে সবচেয়ে উদ্দীপক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো– দুইটি দিন কখনো একরকম নয়।

অনুবাদ: শুভ কর্মকার

সূত্র: ১১ জুন ২০১৯; *https://www.inpublishing.co.uk*

সংশোধনী

নিরীক্ষা'র ২২২তম সংখ্যায় গণমাধ্যম সংবাদে দৈনিক সমকাল সূত্রে প্রকাশিত 'সাংবাদিকদের দুর্দিনের বন্ধু ছিলেন শাহ আলমগীর' শীর্ষক খবরে এক জায়গায় ভুলবশত ১৯৮৫ সালে পিআইবি গঠিত হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৬ সালে পিআইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

শোক সংবাদ

মাহফুজ উল্লাহ

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট মাহফুজ উল্লাহ (৬৯) আর নেই। তিনি ২৭ এপ্রিল ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মাহফুজ উল্লাহ দীর্ঘদিন হৃদরোগ, কিডনি ও ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন।

২ এপ্রিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ১০ এপ্রিল ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭ এপ্রিল তিনি মারা যান। তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

সূত্র: সমকাল; ২৮ এপ্রিল ২০১৯

গিরীশ কারনাড

ভারতীয় অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যব্যক্তিত্ব গিরীশ কারনাড ১০ জুন মারা গেছেন। ১৯৭০ সালে কন্নড় ছবি 'সংস্কার' দিয়ে তাঁর অভিনয়জীবনের শুরু। পরে কন্নড়, হিন্দি, তামিল ও তেলেগু মিলিয়ে শ'খানেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে আছে 'ইকবাল', 'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'-এর মতো ছবিও। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হন আশির দশকের টিভি ধারাবাহিক 'মালগুডি ডেজ'-এর জন্য। তিনি চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বেশ কয়েকবার জাতীয় পুরস্কার ও ফিল্মফেয়ার লাভ করেন। ভারতের নাট্যচর্চা আন্দোলনের পথিকৃৎ তিনি। চার দশকেরও বেশি সময় নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু প্রশংসিত নাটক লিখেছেন গিরীশ। পেয়েছেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠসহ ভারতের নামি সব পুরস্কার।

সূত্র: কালের কণ্ঠ; ১১ জুন ২০১৯

জাকারিয়া মুক্তা

সময় টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জাকারিয়া মুক্তা (৫০) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ৮ জুন তিনি রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

হাসপাতাল থেকে জাকারিয়া মুক্তার লাশ রাতেই সময় টেলিভিশনের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

নীলফামারীতে জন্ম নেওয়া এই সাংবাদিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সর্বশেষ সময় টেলিভিশনে বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সূত্র: সমকাল; ৯ জুন ২০১৯

টেলি সামাদ

সেলুলয়েড পর্দায় তাঁর উপস্থিতি যে কোনো দর্শকের মন ভালো করে দিত। কমেডিনির্ভর রেকর্ডসংখ্যক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি একাধিক সিরিয়াস চরিত্রেও যিনি পর্দা কাঁপিয়েছেন, সেই শক্তিমান কৌতুক অভিনেতা টেলি সামাদ (৭৪) অনেকটা নীরবেই চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। ৬ এপ্রিল রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি হৃদরোগসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলার নয়াগাঁও পৈতৃক বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। টেলি সামাদ ১৯৪৫ সালের ৮ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ নয়াগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুস সামাদ। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা টেলি সামাদ পড়াশোনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে। সংগীতেও রয়েছে এই গুণী অভিনেতার পারদর্শিতা। 'মনা পাগলা' ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন তিনি। ৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে গান করেছেন তিনি। ১৯৭৩ সালে 'কার বউ' দিয়ে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। চার দশকে ৬০০ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০১৫ সালে সর্বশেষ তিনি অভিনয় করেন 'জিরো ডিগ্রি' চলচ্চিত্রে।

সূত্র: ইত্তেফাক; ৭ এপ্রিল ২০১৯

টনি হরোভিৎস

পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক টনি হরোভিৎস ২৭ মে মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ওপর লেখা তাঁর 'কনফেডারেটস ইন দি অ্যাটিক' বইটি ব্যাপক আলোচিত। ১৯৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের চেতনায় যুক্তরাষ্ট্রে একদল নারী-পুরুষের নতুন করে লড়াই শুরুর কাহিনি 'কনফেডারেটস ইন দি অ্যাটিক'। বইটি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসভিত্তিক নন-ফিকশনের লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জনের আগে হরোভিৎস সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্টার থাকাকালে তিনি ১৯৯৫ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পান। যুক্তরাষ্ট্রে আয়বৈষম্য এবং নিম্ন মজুরির শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য তিনি ওই পুরস্কার পান।

সূত্র: কালের কণ্ঠ; ১৪ জুন ২০১৯

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী

সমকালের দক্ষিণ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী (৬০) মারা গেছেন। ২৮ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে তিনি মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁর গ্রামের বাড়ি সাতকানিয়া উপজেলার কালিয়াইশ ইউনিয়নের পূর্ব কাঠগড় গ্রামে। উত্তর কালিয়াইশ গ্রামে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক শহীদ সমকালের শুরু থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সংবাদ, নয়াবাংলা ও আজাদীর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজে জড়িত ছিলেন শহীদ।

সূত্র: সমকাল; ২৯ মার্চ ২০১৯

আতাউর রহমান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাবেক জ্যেষ্ঠ আলোকচিত্রী আতাউর রহমান (৬১) ২ জুন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ডেইলি অবজারভারের ফটো সাংবাদিক জীবন আমীরের বাবা। জানাজা শেষে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার উত্তর ডেলপাড়ার কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সূত্র: প্রথম আলো; ৩ জুন ২০১৯

মো. হানিফ

যুগান্তরের নোয়াখালী স্টাফ রিপোর্টার মো. হানিফ (৬২) ১২ এপ্রিল মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। নোয়াখালী সদর উপজেলার করমুল্লাহপুর গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সূত্র: সমকাল; ১৩ এপ্রিল ২০১৯

মজিবুল হক ভূঁইয়া

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক বিশেষ সংবাদদাতা মুজিবুল হক ভূঁইয়া (৬২) মারা গেছেন। ৮ মে রাজধানীর মিরপুরে নিজ বাসস্থানে তিনি মারা যান (ইনালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস, কিডনি, উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। ওইদিন বাদ আছর জানাজা শেষে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার গতিয়া পাঠানগর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সূত্র: সমকাল; ৯ মে ২০১৯

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তাঁর বামে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও এটুআই পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী এবং ডানে পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান ও ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। পেছনে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০১৮ প্রদান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, এটি এখন বাস্তবতা। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে বাংলাদেশ এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে। তিনি পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০১৮ প্রদানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং এটুআই'র যৌথ আয়োজনে ২২ মে পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে সাতটি ক্যাটাগরিতে সাত সাংবাদিককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং সম্মানিত অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক এবং এটুআইয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী।

পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন জুরি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

পুরস্কার বিজয়ীরা হচ্ছেন জাতীয় সংবাদপত্র (বাংলা) ক্যাটাগরিতে দৈনিক শেয়ার বিজ'র প্রতিবেদক মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, জাতীয় সংবাদপত্র (ইংরেজি) ক্যাটাগরিতে ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিবেদক ইব্রাহিম হোসাইন, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিবেদক বুদ্ধদেব কুণ্ডু, আঞ্চলিক সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে দৈনিক গ্রামের কাগজের প্রতিবেদক উজ্জ্বল বিশ্বাস, বেতার ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বেতারের প্রতিবেদক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অনলাইন সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে রাইজিংবিডি ডটকমের প্রতিবেদক রফিকুল ইসলাম মন্টু এবং ফটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে ঢাকা ট্রিবিউনের ফটো সাংবাদিক সৈয়দ জাকির হোসেন। পুরস্কার বিজয়ীদের প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা এখন শুধু শহরের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের কাছেও পৌঁছে গেছে। মন্ত্রী প্রান্তিক পর্যায়ের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের গল্পগুলো আরও নিপুণভাবে গণমাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা আরও সহজ ও দ্রুত করতে এ বছরের মধ্যে আমরা প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড কানেকশন পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলগুলোয়ও তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া পৌঁছে দিয়েছি। তিনি জানান, প্রচলিত ডাকঘরের ধারণা পাল্টে আমরা এটিকে ডিজিটাল ডাকঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার কথাগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে জনগণের মধ্যে একটা আস্থার জায়গা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এটুআইয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত এবং স্বল্পমূল্যে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটুআই কাজ করে চলেছে। এর ধারাবাহিকতায় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়সহ সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ার কার্যক্রম চলছে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ পিআইবি'র মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি জাফর ওয়াজেদ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসেবে ২১ এপ্রিল যোগদান করেছেন।

যোগদানের সময় পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিপুলসংখ্যক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পিআইবিকে আগামী দিনে একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রয়াত মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরকে স্মরণ করে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার পাশাপাশি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে পিআইবিকে আরও বিকশিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত সংসদ সদস্য ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শফিকুর রহমান সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক চেয়ারে নিয়োগ দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের সভাপতি মোল্লা জালাল ও ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, পিআইবির পরিচালক প্রশাসন মো. ইলিয়াস ভূইয়া, পরিচালক গবেষণা মো. আখতার হোসেন, রিসার্চ অফিসার শেখ মজলিশ ফুয়াদ, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য শেখ মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মীর মো. নজরুল ইসলাম নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

সাবেক ছাত্রনেতা জাফর ওয়াজেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতিও ছিলেন। দাউদকান্দিতে জন্ম নেওয়া জাফর ওয়াজেদ সর্বশেষ দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় দৈনিক সংবাদ'র জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, বাংলাবাজার পত্রিকা ও দৈনিক মুক্তকণ্ঠ'র প্রধান প্রতিবেদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনলাইনে আবেদনকৃত সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে সনদ দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

অনলাইনে আবেদনকৃতদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে অনলাইনে আবেদনকৃত সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৪-৬ মে) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ৬ মে সোমবার শেষ হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রশিক্ষণে ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে প্রথমবার ডেটা সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ডেটা সাংবাদিকতাবিষয়ক তিন দিনব্যাপী (২৬-২৮ জুন) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম কর্মশালা এটি। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ডেটা সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও খবরে ইনফোগ্রাফিক্সের ব্যবহার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় এতে।

গত ২৮ জুন পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। এতে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

সমাপন অনুষ্ঠানে ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সাংবাদিকতার যে নতুন পরিসর তৈরি হয়েছে, সেখানে ডেটা সাংবাদিকতার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমবারের মতো বিষয়টি নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করায় পিআইবিকে ধন্যবাদ জানাই। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তারা সাংবাদিকতার নতুন এ ধরন নিয়ে সামনে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন বলে আশা করছি।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক বলেন, পিআইবি ডেটা সাংবাদিকতা নিয়ে প্রথমবার এ আয়োজন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যমকর্মীদের সাংবাদিকতার নানা বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ভবিষ্যতে ডেটা সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতার আরও নিত্যনতুন ও সময়োপযোগী ধারা নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং সাংবাদিকদের মানোন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

রাজশাহীতে শিশুদের জন্য কর্মশালা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত শিশুদের জন্য দুই দিনব্যাপী (৯-১০ এপ্রিল) প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১০ এপ্রিল শেষ হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল শিশুদের অধিকার, গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং শিশুদের সাংবাদিকতা পেশায় আগ্রহী করে তোলা। শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের (৫ম পর্যায়) আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক মীর মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুকে যোগ্য ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। শিশু যেন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে– এ লক্ষ্যে আমাদের এ প্রয়াস।' কর্মশালা সমাপনে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী জেলার উপ-আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা আফরাজুর রহমান এবং সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ। কর্মশালার শেষদিনে প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ডিআরইউ সদস্যদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২০-২২ জুন) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ২২ জুন পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম বলেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে। সাংবাদিককে নিজেদের বিকশিত করার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, অর্থনৈতিকভাবে দেশের গণমাধ্যমগুলো এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে সমাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ডিআরইউ'র সাবেক সভাপতি ও বৈশাখী টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ডিআরইউ'র ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের সাথে প্রধান অতিথি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম এবং পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

বাজেটবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দ

পিআইবি'তে বাজেটবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) যৌথ উদ্যোগে পিআইবিতে তিন দিনব্যাপী (২৯-৩১ মে) বাজেটবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইআরএফ'র সভাপতি সাইফ আহমেদ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ইআরএফ'র ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৮-৩০ এপ্রিল) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ৩০ এপ্রিল শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি হুমায়ুন কবির খোকন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

টুঙ্গিপাড়ায় সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১১-১৩ মে) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৩ মে শেষ হয়েছে। ১১ মে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. খোন্দকার নাসির উদ্দিন।

পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সোলায়মান বিশ্বাস, পিআইবি'র পরিচালক (প্রশাসন-অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে পিআইবি'র মহাপরিচালক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রশিক্ষণে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মাদারীপুরে সিআরসি, সিডও ও মীনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মাদারীপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য সিআরসি, সিডও ও মীনাবিষয়ক দুই দিনব্যাপী (১৬-১৭ এপ্রিল) প্রশিক্ষণ ১৭ এপ্রিল শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারীপুর জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম। মাদারীপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা শাহিন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম প্রসাদ পাঠক। সমাপন দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুস্তাফিজ। প্রশিক্ষণে মাদারীপুর জেলার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

গোপালগঞ্জে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

গোপালগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ১৪ মে শেষ হয়েছে। সার্কিট হাউসের হলরুমে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার সাইদুর রহমান খান প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুস্তাফিজ, গোপালগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসার মুঈনুল ইসলাম প্রমুখ। সভাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাবুব জামিল। এর আগে ১২ মে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

পিআইবিতে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

অনলাইনে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য তিন দিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ১৩ মে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান। আবাসিক এ প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন জেলার ৩০ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

রুরাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশন-এর সদস্যদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

রুরাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশনের সদস্যদের জন্য আয়োজিত তিন দিনের আবাসিক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৭ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালাল। সভাপতিত্ব করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ২৮ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী (১৪-১৬ জুন) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পিআইবি'র পরিচালক (প্রশাসন-অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল করিম খোকন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ময়মনসিংহের ৪০জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সিআরসি, সিডও ও মীনাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনীতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিআরসি, সিডও ও মীনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সাংবাদিকদের জন্য সিআরসি, সিডও ও মীনাবিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৪ মে শেষ হয়েছে। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে জেলার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জে সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত নারায়ণগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ মে) সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

ঢাকাস্থ শরীয়তপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

ঢাকাস্থ শরীয়তপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং বিষয়ে তিন দিনব্যাপী (২০-২২ মে) প্রশিক্ষণ ২২ মে শেষ হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিজেএফ সদস্যদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত পটুয়াখালী জার্নালিস্টস ফোরাম (পিজেএফ)-র সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ২৮ মে শেষ হয়। পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দৈনিক বাংলাদেশের খবর-এর সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য শেখ মামুনূর রশীদ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে পিজেএফ'র ৩৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি'তে সাংবাদিকদের জন্য ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অবহিতকরণ সভা

১৯ জুন জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন (প্রথম রাউন্ড) উপলক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) ঢাকা জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় কর্তৃক গণমাধ্যমকর্মীদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিশুকে ক্যাপসুল খাওয়ানোর উদ্যোগ সফল হয়েছে। মায়েরা এখন ক্যাপসুল খাওয়ানোর ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন।

ডিআরইউ সদস্যদের জন্য টেলিভিশন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ জুন) টেলিভিশন সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ২০ জুন পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বার্তা২৪.কমের এডিটর ইন চিফ আলমগীর হোসেন বলেন, রিপোর্টারদের অনেক বেশি প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকেও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষণের আয়োজন খুব কম হয়। এ অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এখন সাংবাদিকদের পিছিয়ে থাকলে হবে না। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংবাদিকদের আরও বেশি দক্ষ ও যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য শেখ মামুনূর রশীদ। প্রশিক্ষণে ডিআরইউ'র ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমান সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাস করেঃ গণপূর্তমন্ত্রী

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বর্তমান সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাস করে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন করেছেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সব অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। আমি এবং আমার আপনজন কেউ অন্যায় বা অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হলে আমাদের বিরুদ্ধেও সংবাদ প্রকাশ করুন। ২৬ জুন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে পিরোজপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পিআইবিতে শিশু ও নারীবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে শিশু ও নারীবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালা ৩০ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের (পঞ্চম পর্যায়) আওতায় আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আজহারুল হক। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. তৌহিদুল ইসলাম।